

হরর কাহিনি

ভূত

অনীশ দাস অপু

হরর কাহিনি

ভূত

অনীশ দাস অপু

'ভূত' নিছক ভূত-প্রেতের কাহিনি নয়, এতে রয়েছে ভ্যাম্পায়ার এবং ওয়্যারউলফের রক্ত হিম করা কয়েকটি গল্প। পাবেন রুদ্ধশ্বাস এক হরর-সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস।
এ বইয়ের পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে ভয়, উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ। অনীশ দাস অপুর আতঙ্কের ভুবনে আপনাকে স্বাগতম, পাঠক!



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হরর কাহিনি

ভূত

অনীশ দাস অপু





সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-0242-3



লেখকের আরও ক'টি বই

অনীশ দাস অপু

আবার অশুভ সংকেত+নেকড়ে মানবী	
ওখানে কে?	৩৬/-
আরেক ড্রাকুলা	৩৮/-
অশুভ ১৩+অশরীরী আতঙ্ক	৫০/-
অশুভ ছায়া	৪৭/-

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

ধূসর আতঙ্ক	৩৩/-
মৃত্যু-পুতুল	৪০/-
রক্ততৃষ্ণা	৫২/-
ভুতুড়ে দুর্গ	৪৭/-
ভৌতিক হাত	৫৬/-

তাহের শামসুদ্দীন/অনীশ দাস অপু

প্রেতশক্তি+পিশাচ দেবতা	৪০/-

ভূমিকা

আমার সম্পাদিত সর্বশেষ হরর কাহিনি সম্ভবত *'ভৌতিক হাত'*। এরপরে সেবা'র জন্য তেমন কিছু লেখা হয়ে ওঠেনি মূলত বাংলাবাজারে লেখালেখির ব্যস্ততার কারণে। ইতিমধ্যে আমার বহু ভক্ত ফোনে অনুযোগ করেছেন আমি কেন সেবা'র জন্য কোনও হরর কাহিনি লিখছি না। পিশাচ কাহিনি *'ওয়্যারউলফ'* কবে বেরুবে? *'বিভীষিকা'* সিরিজেরই বা কী খবর? ইত্যাদি নানান প্রশ্ন তাঁদের। ওদিকে টিংকু ভাইও ক্রমাগত তাগাদা দিয়ে চলছিলেন সেবা'য় হরর কাহিনি জমা দেয়ার জন্য। ভক্ত পাঠকদের চাপে এবং টিংকু ভাইয়ের অনুরোধে 'ভূত'-ভূমিষ্ঠ হলো। এ বই সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। কারণ আমার লেখার সঙ্গে পরিচিতজনেরা জানেন আমার হরর কাহিনি মানেই ভয়-আতঙ্ক-উত্তেজনার জগতে প্রবেশ। প্রতিটি গল্পই বাছাই করা হয়েছে সযত্নে। এ বইয়ে গল্পের সঙ্গে পুরো একটি উপন্যাসও পাচ্ছেন পাঠক। আশা করি 'ভয়াল ভয়ঙ্কর' নামের হরর-সায়েন্স ফিকশনটি তাঁরা উপভোগ করবেন। আমার তো মনে হয় 'ভূত'-এর সবচেয়ে গা ছমছমে কাহিনি হলো এটি।

...এবারে ভক্তদের প্রশ্নের জবাব। *'ওয়্যারউলফ'* লেখা শেষ। রুদ্ধশ্বাস এ হরর উপন্যাস তাঁরা আগামী মাসেই হাতে পেয়ে যাবেন। আর *'বিভীষিকা'* সিরিজ শীঘ্রি আসছে বাজারে।

...আমার ভক্ত-পাঠকদের একটা সুখবর দিই। তাঁরা এখন থেকে নিয়মিত আমার লেখা হরর এবং পিশাচ উপন্যাস পাবেন। আগামীতে

যে সব বই তাঁরা পাবেন তার আগামী কয়েকটি নাম জানিয়ে দিচ্ছি–কিংবদন্তীর *প্রেত, ভয়াল রাত, রাক্ষস, ভূতের বাড়ি, মগজখেকো, অশুভ কুয়াশা* ইত্যাদি। পাশাপাশি বিশ্বখ্যাত লেখকদের অনুবাদ বইও পাবেন। এসব লেখকের মধ্যে রয়েছেন ব্রাম স্টোকার, ডেনিস হুইটলি প্রমুখ। ব্রাম স্টোকার 'ড্রাকুলা' ছাড়াও আরও কয়েকটি হরর উপন্যাস রচনা করেছিলেন। সেগুলো এবারে সেবা থেকে অনুবাদ হয়ে বেরুবে। আর ডেনিস হুইটলির দারুণ রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার ও হরর কাহিনিগুলোও আমি আপনাদের জন্য অনুবাদ করতে যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস সবগুলো বইই আপনাদের ভাল লাগবে। ভাল থাকুন। সুস্থ থাকুন।

অনীশ দাস অপু

ভূত

ওর চতুর্দশ জন্মদিনে ভূতের কবলে পড়ল অরণী আহমেদ।

ঘরোয়া পার্টি–অরণী, বাবা, মা আর দশ বছরের ভাই অরণ্য। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে পার্টিতে যোগ দেয়া হলো না বাবার। পরিবহন ডিপোর এক ড্রাইভার অসুস্থ হয়ে পড়ায় মোশতাক আহমেদকে কুমড়া এবং শসাভর্তি ট্রাক নিয়ে ছুটতে হলো গ্লাসগো।

কাজেই বাড়ির তিন সদস্য মিলে পার্টি দিল। ওরা তিনজন কিচেনে বসেছে। কেকের ওপর মোমবাতি সাজানো। এক ফুঁয়ে নিভে যাবার অপেক্ষা। আর তখন অশরীরী আতংকের আগমন ঘটল ওদের ঘরে।

'জলদি! জলদি মোমবাতি নেভাও, আপু!' চেঁচাল অরণ্য, যথারীতি উত্তেজনায় অস্থির।

'উইশ করিস কিন্তু, মামণি,' বললেন মিসেস আহমেদ। চোখ বুজল অরণী, ক্লাসের সবচেয়ে সুদর্শন ছেলে রবার্ট যেন ওর প্রেমে পড়ে যায়, মনে মনে উইশ করল ও। তারপর ফুঁ দিল মোমবাতিতে। ঘরে তৈরি কেকের ওপর সাজানো চোদ্দটি মোমের শিখা কাঁপতে কাঁপতে নিভে গেল।

'হুররে, তোমার উইশ পূরণ হবে, আপু। মা, এবার কেক কাটো। খিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে।' বলল অরণ্য। সে খেতে খুব ভালবাসে।

'সারাক্ষণ খাই খাই করিস, হাতি হয়ে যাবি তো!' হাসি মুখে বললেন ওদের মা, লম্বা ছুরিটি তুলে নিলেন হাতে।

'ও তো এখনই বাচ্চা হাতি, মা,' মশকরা করল অরণী।

'আমি বাচ্চা হাতি না! আমি বাচ্চা হাতি না!' নাকি সুরে কান্নার

ভান করল অরণ্য।

'আবার শুরু করেছিস দুটোতে। তোদের নিয়ে আর পারি...' কথা শেষ করতে পারলেন না মিসেস আহমেদ, বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। মোমগুলো আবার জ্বলতে শুরু করেছে।

'তোমার উইশ পূরণ হবে না, আপু!' টাকরায় জিভ বাধিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করল অরণ্য। 'মোমবাতি নেভেনি!'

'কিন্তু আমি তো সবগুলো বাতি নেভালাম। তোমরা দেখেছ!' অবাক অরণী।

'দেখলাম তো,' হতবুদ্ধি অরণীর মা। 'মোমবাতিগুলোতে বোধহয় কোনও সমস্যা আছে। তাই নেভেনি,' তাঁর গলার স্বরে দ্বিধা। 'আবার নেভাও, মা।'

আবার বুক ভরে বাতাস নিল অরণী, মুখ দিয়ে বের করে দিল—হুউউশ! বাতাসের ঝাপটায় সবগুলো মোম নিভে গেল। অরণ্য এক কদম সামনে বাড়ল। মোমবাতির কালো একটা সলতে ধরে পরীক্ষা করল।

'এবার সত্যি নিভেছে মোমবাতি। মা, কেক কাটো।' হঠাৎ আর্তনাদ করে সলতে থেকে হাত সরিয়ে নিল ও। আবার দপদপ করে জ্বলতে শুরু করেছে শিখা।

সবার মুখ হাঁ হয়ে গেল দৃশ্যটা দেখে। আর তখন কেক বসানো প্লেটটি কাঁপতে লাগল; প্রথমে মৃদু, তারপর বেড়ে গেল কাঁপুনির মাত্রা। এত জোরে কাঁপতে লাগল যে টেবিল থেকে ছিটকে পড়ে গেল মেঝেয়। ভেঙে চৌচির।

সবার আগে সংবিৎ ফিরে পেল অরণ্য। 'তুমি ইচ্ছে করে কাজটা করেছ, আপু,' অভিমানে ঠোঁট ফোলাল। 'যাতে কেকটা খেতে না পারি।'

ঠোঁট কামড়াল অরণী। 'কি-কিন্তু আমি কিছু করিনি। মা, তুমি দেখেছ।'

'হুঁ, দেখেছি। কিন্তু বুঝলাম না প্লেটটা কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল কীভাবে।' মেয়ের চোখে ভয় ফুটে উঠতে দেখলেন মিসেস আহমেদ। কাঁধ ঝাঁকিয়ে জোর করে নিজের ভয়টা দূর করার চেষ্টা করলেন।

'ঘটনা যেভাবেই ঘটুক আমার বারোটা বাজল আর কী। ড্রইংরুমে যাও, অরণী। উপহারগুলো দেখো গে। আমি আবর্জনা পরিষ্কার করে আসছি।'

একটু আগের ঘটনা বিস্মৃত হলো অরণী বাবা-মা'র উপহার পেয়ে। রঙ ঝলমলে র‍্যাপিং পেপার দিয়ে মোড়ানো বাক্স খুলতেই বেরিয়ে এল দামী একটি ভ্যানিটি কেস। অপূর্ব সুন্দর বাক্সটির মধ্যে রয়েছে আয়না, চিরুনি, ব্রাশ, ম্যানিকিওর সেট, সেইসঙ্গে পারফিউম এবং মেকআপের অনেকগুলো আইটেম। খুশিতে ঝলমল করছে অরণী।

অরণ্য যে ওকে বই উপহার দেবে তা তো জানা কথা। র‍্যাপিং পেপার ছিঁড়ছে অরণী, পেছনে এসে দাঁড়াল ছোট ভাইটি। 'ফুটবল অ্যানুয়াল!' হতাশ হলো অরণী।

'দারুণ জিনিস, না?' খুশি খুশি গলায় জানতে চাইল অরণ্য।

'ফুটবল অ্যানুয়াল দিয়ে আমি কী করব?'

'তোমার পছন্দ না হলে আমাকে দিয়ে দিও। আমার কাজে লাগবে,' বলল অরণ্য।

'জানতাম তুই এরকম ফালতু কোনও জিনিসই আমাকে উপহার দিবি,' অরণী বইটি ছুঁড়ে দিল ভাইকে। 'নে, তোর বই তুইই পড়।'

'কিছু কিছু মানুষ এমন অকৃতজ্ঞ হয়! আগামী জন্মদিনে আমার কাছ থেকে আর কিছু আশা কোরো না।' ঝুঁকে মেঝে থেকে বইটি তুলে নিল অরণ্য, পা বাড়াল সিঁড়িতে। 'মা ডাকলে বোলো আমি আমার ঘরে আছি। ফুটবল অ্যানুয়াল পড়ছি।'

সন্ধ্যাটা নতুন মেকআপ মুখে ঘষামাজা করেই কাটিয়ে দিল অরণী। মেয়ের উজ্জ্বল চেহারা দেখে মিসেস আহমেদও খুশি। যাক, জন্মদিনের কেক নিয়ে সৃষ্টি ছাড়া ঘটনাটা যে মেয়ে ভুলে যেতে পেরেছে তা-ই যথেষ্ট।

মোশতাক আহমেদের বাড়ি ফিরতে মাঝরাত পেরিয়ে গেল। গ্লাসগো ট্রিপ তাঁকে ক্লান্ত এবং বিরক্ত করে তুলেছে।

'ওরা কুমড়া আর শসা দিয়ে গ্লাসগোতে কী করবে সেটাই জানতে

চাই আমি,' ঘোঁতঘোঁত করলেন তিনি।

'স্কটিশদেরকেও তো খেতে হবে,' স্বামীকে এক কাপ চা এনে দিলেন সুলতানা আহমেদ। মোশতাক বাইরে থেকে খেয়ে এসেছেন। আস্তে আস্তে মেজাজ ঠাণ্ডা হলো তাঁর।

'পার্টি কেমন হলো, সুলতানা?' জিজ্ঞেস করলেন মোশতাক আহমেদ।

সুলতানা জন্মদিনের কেক নিয়ে ঘটে যাওয়া অদ্ভুত ঘটনাটি জানালেন স্বামীকে। শুনে ভুরু কুঁচকে গেল মোশতাক সাহেবের। 'তুমি ঠিক জানো ওদের কেউ ফাজলামো করেনি? অরণ্যটার মাথায় তো সব সময় দুষ্টু বুদ্ধি গিজগিজ করছে।'

'না। ও যেন কোনও রকম দুষ্টুমি করতে না পারে সেজন্য ওর ওপর নজর ছিল আমার। তা ছাড়া ঘটনা ঘটার সময় দু'ভাইবোনই টেবিলের কাছ থেকে দূরে ছিল।'

মোশতাক সাহেব একটু ভেবে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন। 'হয়তো রাস্তা দিয়ে লরী-টরি যাচ্ছিল। দানব গাড়িগুলো যখন রাস্তা দাপিয়ে ছোটে আশপাশের বাড়িঘরগুলো কেমন থরথর করে কাঁপে, জানোই তো।'

মাথা নাড়লেন তাঁর স্ত্রী। 'টেবিলের অন্য কিছু নড়ছিল না। আর নড়লেই বা মোমবাতি নিভে যাওয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না কারণটা কী–,' বললেন মোশতাক আহমেদ। কথা শেষ করতে পারলেন না দোতলা থেকে ভেসে আসা তীক্ষ্ণ চিৎকারে।

'অরণী!'

নিজের বেডরুমে শান্তিতে ঘুমাচ্ছিল অরণী আহমেদ। স্বপ্ন দেখছিল। ভয়ংকর স্বপ্ন। সে ডিস্কোতে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে নাচছে। হঠাৎ হলরুমে বইতে শুরু করল গা জমাট করা শীতল হাওয়া। সবাই ছুটে পালাল। ঘরে একা হয়ে গেল অরণী। অন্ধকার ছায়া থেকে বেরিয়ে এল ঠাণ্ডা, বড়বড় নখঅলা একটা হাত, বাড়িয়ে দিল অরণীকে লক্ষ্য করে। চেপে ধরল ওর মুখ। স্বপ্নের মধ্যে চিৎকার দেয়ার চেষ্টা করল অরণী। পারল না।

সারা গায়ে শীতল ঘাম নিয়ে জেগে গেল অরণী—বুঝতে পারল এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু সত্যি কি ও স্বপ্ন দেখছিল? তা হলে ওর মুখে ঠাণ্ডা, খসখসে কিছু একটা হাত বুলাচ্ছে কেন? অরণীর সামনে, ভোজবাজির মত ওটা কী উদয় হয়েছে? ওটা তো ভৌতিক একজোড়া হাত! এগিয়ে আসছে ওর দিকেই।

মুখ হাঁ করল অরণী, গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল।

অরণীর বাবা-মা সিঁড়ি বেয়ে ছুটে আসছেন ওপরে, মেয়ের ঘরে হুড়মুড় করে কিছু একটা পতনের শব্দ পেলেন। ধাক্কা মেরে দরজা খুললেন মোশতাক আহমেদ। আঁতকে উঠলেন।

দেয়ালের তাকে রাখা ঘর সাজানোর শৌখিন জিনিসগুলোর যেন পাখা গজিয়েছে। উড়ে এসে একটার পর একটা পড়ছে মাটিতে। পর্দাগুলো ঝড়ের বেগে উড়ছে অথচ জানালা বন্ধ। ওঁরা বিস্ফারিত চোখে দেখলেন অরণীর বিছানার পাশে বাতিটি হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল শূন্যে, তারপর সবেগে ছুটে গেল মেঝে লক্ষ্য করে যেন অদৃশ্য কোন শক্তি ছুঁড়ে মেরেছে ওটাকে।

এসবের মাঝখানে, বিছানায় বসে তারস্বরে চিৎকার করছে অরণী, চেহারায় নির্জলা আতংক।

এক লাফে ঘরে ঢুকে পড়লেন মোশতাক আহমেদ, ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন হিস্টিরিয়া রোগীর মত কাঁপতে থাকা মেয়েকে। ওদের পেছনে, মিসেস আহমেদ আর্তচিৎকার করে উঠলেন অরণীর ড্রেসিং টেবিল থেকে নতুন ভ্যানিটি কেসটি শূন্যে উড়াল দিয়েছে দেখে, পরক্ষণে ডাইভ দিল মেঝেতে, সেখান থেকে লাফাতে লাফাতে চলল ওয়ার্ডরোব অভিমুখে। তারপর জ্যান্ত মানুষের মত পাঁই করে ঘুরল, একটা বৃত্ত রচনা করে দেয়ালগুলো পাক খেতে লাগল, সেইসঙ্গে ঝাঁকির চোটে ওটার খোলা মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে ভেতরের সাজ-সরঞ্জাম।

‘ওকে বাইরে নিয়ে চলো জলদি!’

মোশতাক আহমেদ মেয়েকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলেন, ছুটলেন দরজায়, পেছন পেছন তাঁর স্ত্রী। ওদের পেছনে আপনাআপনি দড়াম শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

মোশতাক অরণীকে নিয়ে নেমে এলেন নীচে। বসলেন চেয়ারে। মেয়েকে কোলে বসিয়ে দোল দিতে লাগলেন বাচ্চাদের মত। সুলতানা অরণীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, শান্ত করার চেষ্টা করছেন ওকে। ওপরতলা থেকে কিছু একটা ভেঙে পড়ার আরেকটা বিকট শব্দ ভেসে এল। 'ওহ্, খোদা!' হঠাৎ গুঙিয়ে উঠলেন মিসেস আহমেদ। 'অরণ্য!'

একেক লাফে দুটো করে সিঁড়ির ধাপ্ পেরুলেন তিনি, সাঁ করে খুলে ফেললেন ছেলের ঘরের দরজা। অরণ্য প্রশান্তি নিয়ে ঘুমাচ্ছে, পাশের ঘরে যে নারকীয় কাণ্ড ঘটে চলেছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন।

ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে তুলে নিতে কসরত করতে হলো সুলতানা আহমেদকে, চলে এলেন বসার ঘরে। সেটীতে শুইয়ে দিয়ে গা ঢেকে দিলেন কম্বলে।

অরণীর চিৎকার থেমেছে তবে এখনও ফোঁপাচ্ছে। ধীরে ধীরে মেয়েকে শান্ত করলেন বাবা-মা।

'ও–ওটা কী ছিল, মা?' অবশেষে মুখে রা ফুটল অরণীর।

মি. এবং মিসেস আহমেদ পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। 'জানিনারে, মা,' জবাব দিলেন মিসেস আহমেদ।

ওপর তলায় আরও আধঘণ্টা চলল তাণ্ডব। তারপর থেমে গেল।

'রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেব, মোশতাক,' বললেন মিসেস আহমেদ।

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন মি. আহমেদ। সিঁড়ির নীচে, কাবার্ড খুলে বের করলেন ক্যাম্প বেড। অরণী খাটিয়ায় টানটান হলো। মা ওর গায়ে লেপ দিলেন। ভৌতিক কাণ্ডকারখানায় বিধ্বস্ত এবং বিপর্যস্ত অরণী বিছানায় শোয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে তলিয়ে গেল ঘুমে।

ভোরবেলা আহমেদ দম্পতি দোতলায় উঠে এলেন অরণীর ঘরের দশা দেখতে।

যেন বোমা মারা হয়েছে ঘরে। লণ্ডভণ্ড অবস্থা। সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আবর্জনা, পর্দাগুলো ছেঁড়া, বেডক্লথ টুকরো টুকরো, চীনা মাটি এবং কাঁচের তৈজসপত্র একটাও আস্ত নেই। অরণীর নতুন ভ্যানিটি কেস কয়েক খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে মেঝেতে।

‘এসব কার কাজ অনুমান করতে পারো, সুলতানা?’ জিজ্ঞেস করলেন মোশতাক আহমেদ।

‘ভূতে ছাড়া এমন কাজ কে করবে?’ জবাব দিলেন সুলতানা আহমেদ।

‘হয়তো বা।’ আস্তে করে মাথা ঝাঁকালেন মোশতাক।

ভূত, জিনপরী নিয়ে অনেক গল্প শুনেছেন তিনি। দেশের বাড়িতে তাঁর সুন্দরী ছোট খালাকে একবার জিনে ধরেছিল। জিনের আছর হলে খালা উন্মাদ হয়ে যেতেন। হাতের কাছে যা পেতেন সব ছুঁড়ে ফেলতেন, ভেঙে টুকরো করতেন। শেষে ওঝা এনে জিনের আছর থেকে খালাকে রক্ষা করা হয়। কিন্তু গতকালকের তাণ্ডবলীলা ঘটাল কোন্ জিনে? বিদেশেও জিন আছে নাকি! কাগজে পড়েছেন কোনও কোনও প্রাচীন বাড়িতে ঘাঁটি করে দুষ্ট ভূতের দল। তারা বাড়ির জিনিসপত্র ভেঙেচুরে, ছুঁড়ে ফেলে অতিষ্ঠ করে তোলে বাসিন্দাদের। এ বাড়িতে কি কোনও ভূত আছে? ‘তো কী করব আমরা এখন?’ প্রশ্ন করলেন মিসেস মোশতাক।

কাঁধ ঝাঁকালেন তাঁর স্বামী। ‘জানি না কী করব। তবে এখন তো সব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।’

‘আশা করি আর কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটবে না,’ ঝুঁকে কার্পেটের ওপর থেকে ভাঙা কাঁচের টুকরো তুলে নিলেন মিসেস মোশতাক। ‘তুমি ঘর থেকে বেরোও। আমি ঘর ঝাঁট দেব।’

অরণী ঘুম থেকে জেগে দেখল কোথাও অস্বাভাবিকতার চিহ্নমাত্র নেই। কাল রাতের ঘটনাটা ওর মনে কোনও রেখাপাত করছে না দেখে নিজেই অবাক হলো। তবে মজা থেকে বঞ্চিত হয়ে হতাশ অরণ্য।

ঘটনাবিহীন কয়েকটি দিন কেটে গেল। অরণীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল যাক বাবা, অতিপ্রাকৃত শক্তির কবল থেকে মুক্তি মিলল!

সে রাতে স্রেফ সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য মোশতাক এবং সুলতানা সন্তানদের বিছানা পাতলেন নিজেদের ঘরে।

‘যদি কিছু ঘটেও,’ ছেলেমেয়েকে বললেন মোশতাক, ‘এখানে তোদের কোনও ভয় নেই।’

সে রাতে কিছুই ঘটল না।

পরদিন সবাই রিল্যাক্স বোধ করল। মোশতাক আহমেদ পরিবার নিয়ে চড়ে বসলেন গাড়িতে, চলে এলেন সাগরসৈকতে। নভেম্বর চলছে। সাগর থেকে উঠে আসছে শীতল হাওয়া। ক্যাফে থেকে কেক আর আইসক্রিম খাওয়ার পরে ঠাণ্ডা বাতাসটুকু ওরা সবাই বেশ উপভোগ করছিল।

ওদেরকে ক্যাফেতে বসিয়ে রেখে দশ মিনিটের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেলেন মোশতাক আহমেদ। ফিরে এলেন ছোট একটি বাক্স নিয়ে। 'অরণী, নাও। আশা করি এটা তোমার ভ্যানিটি কেসের দুঃখ অনেকটাই ভুলিয়ে দেবে।'

বাক্সের মধ্যে হার্ট আকারের ছোট একটি লকেট। অরণী খুশি মনে গলায় পরল লকেট। চোখে চিকচিক করছে অশ্রু। 'পৃথিবীতে তোমাদের মত ভাল বাবা-মা আর একটিও নেই।' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল ও।

ফেরার পথে একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি থামালেন মোশতাক। রাতের খাবারটা কিনে নিলেন। বাড়ি এসে ঝটপট খাবার টেবিল সাজিয়ে ফেলল অরণী এবং তার মা।

বড় বোনের প্লেটের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটল অরণ্য। 'আপু, তুমি কি সবগুলো ফিশবল একাই খাবে?'

'না, তোকেও ভাগ দেবে,' বলে মেয়ের দিকে তাকালেন সুলতানা আহমেদ। অরণীর চোখে ভয়, তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালেন তিনি।

ইলেকট্রিক বুকারের ওপর চিনির কাঁচের বড় বোয়েমটা ভাসছে, দুলছে সামনে-পিছে। হঠাৎ শূন্য থেকে খসে পড়ল ওটা। ঝনঝন শব্দে ভাঙল, মেঝে সয়লাব হয়ে গেল চিনিতে।

'ও, খোদা...না!' গুঙিয়ে উঠলেন অরণীর মা।

ওদের বিস্ফারিত চোখের সামনে হুক থেকে নিজেকে মুক্ত করল একটা কিচেন নাইফ, সাঁই শব্দে বাতাস কাটল, গেঁথে গেল টেবিলের ওপর।

নরক ভেঙে পড়ল ঘরে। মসলার কয়েকটা জার দেয়ালের তাক থেকে নেমে এল লাফ মেরে, ঝাঁপ দিল মেঝেতে, রান্নাঘরের টুলটা

হঠাৎ উল্টে গেল, খোলা দরজা দিয়ে লাফাতে লাফাতে রওনা হয়ে গেল বসার ঘরে, রেডিওর সুইচ আপনা থেকে চালু হয়ে তারস্বরে বাজতে লাগল পপ সঙ্গীত।

মোশতাক আহমেদ ঝট করে মাথা নামিয়ে নিলেন, তাঁর কানের পাশ দিয়ে বাউলি কেটে চলে গেল একটা খাবার প্লেট।

'থামো!' গর্জে উঠলেন তিনি। 'তুমি যেই হও–বা যা-ই হও–এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও। আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দাও।'

তাঁর কথার জবাব দিতেই বোধহয় তাক থেকে লাফিয়ে নেমে এল একটা টিপট, বাড়ি খেল কাঁধে। অরণী দু'হাতে মুখ ঢেকে গোঙাতে শুরু করেছে। অরণ্য মুখ হাঁ করে দেখেছে রান্নাঘরের তৈজসপত্রগুলোর তাণ্ডব নৃত্য।

তারপর হঠাৎ করে যেভাবে শুরু হয়েছিল, থেমেও গেল আকস্মিক।

মোশতাক আহমেদ পরিবারের ভীত-সন্ত্রস্ত সদস্যদের নিয়ে চলে এলেন বসার ঘরে।

'শোনো,' গলার স্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করলেন তিনি। 'ব্যাপারটা ভীতিকর মানি, কিন্তু আমাদেরকে আতংকিত হলে চলবে না। আমার এবং তোমার মা'র ধারণা কোনও জিনের আছর হয়েছে আমাদের বাড়িতে।'

'জিন কী, বাবা?' জিজ্ঞেস করল অরণ্য। ওর জন্ম ইংল্যাণ্ডে। জীবনেও বাংলাদেশে যায়নি। বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। বই পড়ে, টিভি দেখে হ্যালেউইনের দিন-ক্ষণ তার মুখস্থ তবে জিন-ফকির-দরবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে তার জ্ঞানের পরিধি শূন্যের কোঠায়। মোশতাক দম্পতি তাঁদের ছেলেমেয়েদের সবসময় এসব কুসংস্কার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন। এ জন্যেই হয়তো অরণ্য 'জিন' কী জিনিস জানে না।

'জিন হলো এক ধরনের ভূত। এরা মানুষের ওপর ভর করে, ভয় দেখায়। তবে মারাত্মক কোনও ক্ষতি করে না।'

'ভূত!' উত্তেজিত হয়ে উঠল অরণ্য। 'বাহ্, তা হলে তো স্কুলের বন্ধুদের ঘটনাটা বলতে হয়!'

'কিন্তু কেন, বাবা?' কথা বলার সময় গলার স্বর কেঁপে গেল অরণীর। 'ওটা কেন আমাদের ওপর সওয়ার হলো?'

শূন্য দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন বাবা। 'আমি জানি না, মা। তবে শীঘ্রি জানব।'

মোশতাক আহমেদ ফোন করলেন স্থানীয় থানায়। এক পুলিশ ইন্সপেক্টর চলে এল সন্ধ্যাবেলায়। সে সব কথা শুনে সহানুভূতি জানাল তবে কোনও সাহায্য করতে পারল না।

'শুনেছি,' সে মোশতাক দম্পতিকে বলল, 'জিন বা ভূত নাকি কিশোরীদের ওপরই বেশি ভর করে। কৈশোর এবং তারুণ্যের সন্ধিক্ষণের বয়সী মেয়েরাই থাকে এদের টার্গেট। তবে এটা কেন ঘটে জানি না আমি।'

'কেউ কেউ বলে এসব ভূত নাকি কিশোরী মেয়েদের মনের সৃষ্টি। মানসিক বিপর্যয় থেকে তারা ভাবে তাদের ভূতে ধরেছে। আবার কারও কারও ধারণা এরকম ভূত সত্যি আছে।

'কিন্তু আপনি আমাদের এ ব্যাপারে কী সাহায্য করতে পারবেন সেটা বলেন।'

ঠোঁট কামড়াল ইন্সপেক্টর। 'তেমন কোন সাহায্য করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। ভূতকে তো আর ধরা ছোঁয়া যায় না যে গ্রেফতার করা যাবে।'

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসল ইন্সপেক্টর। 'তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারি, ভূতের অত্যাচার বেশিদিন সহ্য করতে হবে না আপনাদের। আমার এক সাইকিক বন্ধুর কাছে শুনেছি জিন বা ভূত দীর্ঘ সময় কারও ওপর ভর করে থাকে না। হঠাৎ করে আসে তারা, হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে যায়। তবে সে সময় আসার আগ পর্যন্ত ভূতের উপদ্রব খানিকটা সহ্য করতেই হবে।'

ইন্সপেক্টর বলে গেল সে পরদিন একজন কাউন্সিল ইনভেস্টিগেটর পাঠিয়ে দেবে।

'শুনলেই তো কাল সকালে আমাদের বাড়িতে কাউন্সিলম্যান

আসছেন,' ছেলেমেয়েকে সাহস দিতে বললেন সুলতানা। 'কাজেই এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাও।'

কিন্তু নিশ্চিন্তে ঘুমানো দূরে থাক, দু'চোখের পাতাই এক করতে পারল না কেউ। ভৌতিক হামলা শুরু হয়ে গেল রাত দশটার পরে। বাথরুম থেকে দুড়ুম দাড়ুম শব্দ আসতে লাগল। ঝনঝন ঠনঠন আওয়াজে কান ঝালাপালা। মোশতাক আহমেদ একবার উঁকি দিয়ে এলেন বাথরুমে। বলাবাহুল্য দেখতে পেলেন না কাউকে।

তারপর জায়গা বদল করল শব্দ। এবারে ঝনঝন শব্দ নয়, মনে হলো বাথরুমের ছাদে কেউ থপ থপ করে হাঁটছে।

আবার বিছানা ছাড়লেন মোশতাক। 'হচ্ছেটা কী দেখে আসি তো,' বলে কদম বাড়াতে গেছেন, পেছন থেকে খপ করে তাঁর জামার আস্তিন খামচে ধরলেন সুলতানা। 'না, যেয়ো না। যা খুশি ঘটুক। তোমাকে কোথাও যেতে হবে না।'

মোশতাক জোরাজুরি না করে ফিরে এলেন বিছানায়।

ভৌতিক উপদ্রব সবচেয়ে আতংকিত করে রাখল অরণীকে। সে বাবা-মার সঙ্গে আজ শুয়েছে তবে গোটা রাত কাগজের মত সাদা হয়ে থাকল তার মুখ। বাথরুমে হাঁটাহাঁটির শব্দে, প্রতিবার পা ফেলার আওয়াজে চমকে চমকে উঠল সে।

তবে ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা অরণ্যকে তেমন প্রভাবিত করতে পারেনি। সে যেন ব্যাপারটাতে মজাই পাচ্ছে। যতবার বাথরুমের ছাদে কদম ফেলার শব্দ হলো, ততবার সে জুতোর হিল দিয়ে শোয়ার ঘরের মেঝেতে খট্ খট্ আওয়াজ করল। এক মুহূর্তের জন্য বিরতি দিল ভৌতিক পা। তারপর ভেসে এল—থপ! থপ! থপ! উত্তেজিত ভঙ্গিতে বাবা-মার দিকে ফিরল অরণ্য, 'আরি! ওটা জবাব দিচ্ছে!'

বিছানায় ঝট করে উঠে বসল অরণী। 'চুপ কর!' খেঁকিয়ে উঠল সে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে। 'একদম কথা বলবি না।' চোখ ফেটে জল এল অরণীর। অরণ্য কিছু না বলে চুপচাপ শুয়ে পড়ল খাটে।

পরদিন সকাল ন'টায় কাউন্সিল থেকে হাজির হলো এক স্বতঃস্ফূর্ত

তরুণ। সে সব শুনে বলল, 'আমি সার্ভেয়াদেরকে খবর দিচ্ছি। তারা এসে আণ্ডারগ্রাউণ্ড পাইপ লাইন পরীক্ষা করবে। পরীক্ষা করে দেখবে বিদ্যুতের তার কিংবা পাইপ লাইনে কোনও সমস্যা হয়েছে কিনা। এসব জায়গায় সমস্যার কারণে লোকে উল্টোপাল্টা সব শব্দ শুনতে পায়। ভাবে ভূতে করছে। হাঃ হাঃ হাঃ।'

'পরীক্ষা করে দেখতে কদ্দিন লাগবে?' জিজ্ঞেস করলেন সুলতানা আহমেদ.।

'অল্প ক'দিন। বড় জোর হপ্তাখানেক।'

এক হপ্তা নয়, চারদিনের মধ্যেই বাড়ির সমস্ত গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি লাইন পরীক্ষা করা হয়ে গেল। কোথাও কোনও ত্রুটি বা খুঁত পাওয়া গেল না। এই চারদিন ভৌতিক উপদ্রব বন্ধ থাকল। কিন্তু কাউন্সিলর তার লোকজন নিয়ে চলে যাওয়ার পরেই শুরু হয়ে গেল ভূতের হামলা।

ভূতটা সবচেয়ে জ্বালাতন করছে অরণী আহমেদকে। ভূতের যন্ত্রণায় একদম ভেঙে পড়ল মেয়েটা। ওজন কমে গেল দশ পাউণ্ড, চোখের নীচে কালি। দু'বার ডাক্তার ডাকতে হলো। তিনি সিডেটিভ দিলেন অরণীকে। কিন্তু ওষুধে উল্টো ফল হলো। আরও ক্লান্তি এসে ভর করল অরণীকে, জীবনীশক্তি যেন দ্রুত শুষে নিয়ে ওকে ছিবড়ে বানানোর ষড়যন্ত্র করছে অশরীরী আতংক।

'এখন কী করবেন?' তরুণ কাউন্সিল ইনভেস্টিগেটরকে আবার বাড়ি আসতে দেখে প্রশ্ন করলেন মোশতাক দম্পতি।

'গোটা ব্যাপারটা তদন্ত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে,' জানাল সে। 'আপনারা অনুমতি দিলে ক'টা দিন আপনাদের বাড়িতে থেকে কাজটা করতে চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন মোশতাক দম্পতি। ওরা যে কোনও মূল্যে এই যন্ত্রণার কবল থেকে মুক্তি চাইছেন। ক'দিন ধরে মোশতাক কাজেও যেতে পারছেন না শুধু এই একটি মাত্র কারণে। কাজেই পরিস্থিতি যত দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে উঠবে ততই মঙ্গল।

কাউন্সিল ইনভেস্টিগেটর তিন দিন তিন রাত কাটাল অরণীদের

বাড়িতে, ঘুমাল অরণীর শূন্য ঘরে। কিন্তু এ ক'দিন বাড়িতে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল না। ভূতটা বোধহয় তরুণ তদন্তকারীর ভয়ে পালিয়েছে।

যাওয়ার দিন তরুণ বলল, 'আপনাদের এখানে আসলে ভূত-টুত কিছু নেই। আপনারা খামোকাই ভয় পাচ্ছেন।'

'না!' চেঁচিয়ে উঠলেন মোশতাক আহমেদ। 'আপনার কি ধারণা গোটা ব্যাপারটা আমরাই তৈরি করেছি?'

'লোককে এরকম আগেও করতে দেখেছি তো! তারা ভূতের গপ্পো ফাঁদে। কাউন্সিলকে খবর দেয়। কাউন্সিল এসে তাদের বাড়িঘর খুঁটিয়ে দেখে যায়। পাইপ লাইন বা অন্য কিছুতে কোনও ত্রুটি ধরা পড়লে সারিয়ে দিয়ে যায়। বিনা পয়সার এই সেবাটুকু পেতে অনেকেই এরকম নাটক সাজায়।'

'নাটক সাজায়?' দাঁত কিড়মিড় করলেন মোশতাক আহমেদ। 'তোমার সাহস তো কম নয়, ছোকরা, তুমি আমাদের জীবন-মরণ সমস্যাকে বলছ সাজানো নাটক! তুমি কি বলতে চাইছ আমাদের মেয়েটা যে ভূতের ভয়ে দিন দিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে সেটা ওর অভিনয়?'

মোশতাক সাহেবের অগ্নিমূর্তি দেখে দরজার দিকে পিছু হঠতে হঠতে তরুণ ইনভেস্টিগেটর বলল, 'আমার সঙ্গে মেজাজ দেখিয়ে কোনও লাভ নেই, মি. আহমেদ। নিজেই তো দেখলেন গত তিনদিনে ভূতের টিকিটির খোঁজও আমরা পাইনি। কোনও অভিযোগ থাকলে কাউন্সিলকে জানান। তবে তাতে খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না।'

প্রায় পালিয়ে বাঁচল যেন ছোকরা ইনভেস্টিগেটর।

সে রাতে ভূতের প্রত্যাবর্তন ঘটল। যেন এ ক'টা দিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল সে। আর যেন রাগে ফুঁসছিল বহিরাগত তদন্তকারীর আগমনে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে দ্বিগুণ হলো তার হামলা। বাড়ির একটা ঘরও রক্ষা পেল না তার উন্মত্ততার কবল থেকে। ঘরের জিনিসপত্রগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল শূন্যে, যখন তখন খুলে গেল ঘরের দরজা-জানালা, বাড়ি কাঁপিয়ে পরক্ষণে বন্ধ হলো সশব্দে, অরণী তোষকে শুয়ে কাঁপছে, অদৃশ্য এক জোড়া হাত ওকে ধাক্কা মেরে

ফেলে দিল তোষকের ওপর থেকে।

তবে ভৌতিক আক্রমণ ভয়াবহ আকার ধারণ করল ক'টা দিন পরে। গত রাতে ভূতের অত্যাচারে একফোঁটা ঘুমাতে পারেনি অরণী এবং অরণ্য। দুই ভাই-বোন আজ রাতে বাবা-মার বেডরুমের বিছানায় শোয়ার খানিক পরেই ঘুমিয়ে গেল। নীচতলায় বসে মোশতাক দম্পতি আলোচনা করছিলেন কীভাবে ভূতের উপদ্রব থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা নিয়ে।

'একটা কাজ করি,' মোশতাক বললেন স্ত্রীকে, 'ভূতের ওঝাটোঝা পাই কি না দেখি। ভূত তাড়াতে ওঝার বিকল্প নেই।'

এ শহরে ভূতের ওঝা কোথায় পাবেন মোশতাক, জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন সুলতানা। কথাটা বলার সুযোগ পেলেন না দোতলা থেকে ভেসে আসা রক্ত হিম করা চিৎকারে বাধা পেয়ে। পড়িমরি ছুটলেন দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে দোতলার বেডরুমে। কলজে এসে ঠেকেছে মুখে।

বেডরুমের ভেতরে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখে স্বামী-স্ত্রীর গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। অরণ্য ঘরের এক কোনায় গুটিশুটি মেরে বসে আছে, ভয়ে রক্তশূন্য মুখ। অরণী প্রকাণ্ড বিছানাটির মাঝখানে। অদৃশ্য, প্রচণ্ড শক্তিশালী একজোড়া হাত ওকে নিয়ে শূন্যে লোফালুফি করছে। অরণীর হালকা-পাতলা শরীরটা শূন্যে উঠে যাচ্ছে, পরক্ষণে দড়াম করে আছড়ে পড়ছে খাটে। চেঁচাচ্ছে অরণী, 'আমাকে ছেড়ে দাও! প্লীজ, আমাকে ছেড়ে দাও!'

মোশতাক এবং সুলতানা ডাইভ দিয়ে পড়লেন বিছানায়। জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে। শূন্যে উঠে গেছে অরণী, ভাসমান শরীরটাকে টেনে নীচে নামাতে চাইছেন ওর বাবা-মা, তখন আরেকটি অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটল। বিছানার নীচ থেকে যেন কেউ প্রবল শক্তিতে ধাক্কা দিল মোশতাক দম্পতিকে। তাঁরা ছিটকে উঠে গেলেন শূন্যে।

আর তখন ভয়ানক এক ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল খাট, ছিটকে গিয়ে পড়ল দেয়ালে। একই সঙ্গে অরণী এবং তার বাবা-মা দড়াম করে আছড়ে পড়লেন মেঝেতে।

'তোমরা কেউ ব্যথা পাওনি তো?' হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে বসেছেন

মোশতাক। তাঁর কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তুলল ঘরে। সবকিছু আকস্মিক নীরব হয়ে গেছে। মিসেস আহমেদ কনুই ডলছেন হাত দিয়ে। লেগেছে। অরণীর কপাল দিয়ে দরদর ধারায় রক্ত ঝরছে। অনেকখানি কেটে গেছে।

ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে ওঁরা নেমে এলেন নীচে, কিচেনে। অরণীর কপাল ধুইয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। অরণী ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। প্রচণ্ড শকে হারিয়ে ফেলেছে মুখের রা।

'এ বাড়িতে আর এক মুহূর্তও নয়, মোশতাক,' মেয়ের গায়ে লেপ জড়িয়ে দিয়ে বললেন মিসেস আহমেদ। 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

'বললেই তো আর বাড়ি ছেড়ে দেয়া যায় না,' বললেন মোশতাক। 'জীবনের শেষ কপর্দকটুকু ব্যয় করেছি এ বাড়ি কেনার জন্য।'

'কিন্তু এ বাড়িতে থাকলে আমরা কেউ বাঁচব না। হারামজাদা ভূতটা আমাদের ঠিক জানে মেরে ফেলবে।'

'আর একটা সুযোগ দাও আমাকে,' অনুনয় করলেন মোশতাক। 'ভূতের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছি শুনলে তো লোকেও হাসবে!'

ফোন তুলে নিলেন তিনি। 'একজন মানুষকে চিনি আমি। উনি হয়তো আমাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন...

পরদিন এক বেঁটেখাটো, গাট্টাগোট্টা মহিলা এলেন অরণীদের বাড়িতে। বয়সে প্রৌঢ়া। পরনে কালো কোট, মাথায় ফুল আঁকা হ্যাট। নিজের পরিচয় দিলেন মিসেস হোর্সলি বলে। জানালেন ক্লিভল্যাণ্ড শহর থেকে এসেছেন। মিসেস হোর্সলি একজন মিডিয়াম। ভূতের ওঝা হিসেবে শহরে বেশ সুনাম আছে তাঁর। এই মহিলাকেই গতকাল ফোন করেছিলেন মোশতাক আহমেদ। ভূত তাড়ানোর ফী হিসেবে মোটা অংকের টাকা দিতে হয়েছে মহিলাকে।

মনোযোগ দিয়ে ভূতের গল্প শুনে গেলেন মিসেস হোর্সলি। 'ভূত সাধারণত মানুষের তেমন ক্ষতি করে না,' অবশেষে মন্তব্য করলেন

তিনি। 'তারা মানুষকে ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত দেয়। তবে দু'একটা ভূত দুর্দান্ত প্রকৃতির হয়। আপনাদের মেয়ের ওপরে যে ভূতটা ভর করেছে ওটাকে বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না,' অরণীর কপালের কাটা দাগের দিকে ইশারা করলেন তিনি। 'মনে হচ্ছে এ ভূতটা দুর্দান্ত প্রকৃতির। তবে আমি যখন এসে পড়েছি কোনও চিন্তা নেই। যতবড় বদমাশ ভূতই হোক আমি তাকে এ বাড়ি ছাড়া করবই। আমি এখন ধ্যানে বসব। আপনারা সবাই চুপ করে বসে থাকুন। কেউ কোনও কথা বলবেন না।'

কেউ কোনও কথা বলল না। মিসেস হোর্সলি পদ্মাসনে বসে চোখ বুজলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর নিঃশ্বাস ঘন হয়ে এল, দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল বুক। তিনি তীক্ষ্ণ, কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তুমি এখানে আছ?'

যেন জবাব দিতে হিমশীতল দমকা একটা হাওয়া ঢুকল ঘরে। মিডিয়াম শিরদাঁড়া টানটান করে আছেন, চোখ শক্তভাবে বোজা, তাঁর মুখ বেঁকে গেছে অদ্ভুত ভঙ্গিতে।

অরণীর নাক কুঁচকে গেল, তীব্র বোটকা একটা গন্ধ ধাক্কা দিয়েছে তাকে। লাশপচা গন্ধ আসছে মহিলার গা থেকে। তাঁর ঠোঁট ফাঁক হয়ে বেরিয়ে পড়েছে দাঁত, গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে।

অরণী বুঝতে পারল ভূতটা ভর করেছে ভূতের ওঝার ওপরে। ভয়ে ওর মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। তবে দু'চোখ সেঁটে থাকল প্রৌঢ়ার ওপরে।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন সুলতানা আহমেদ।

জবাবে খলখল করে হেসে উঠলেন প্রৌঢ়া। এমন বীভৎস এবং বিকট হাসি, সবার শরীরের রোম দাঁড়িয়ে গেল।

'তুমি আমাদের কাছে কী চাও?'

মিসেস হোর্সলির মাথাটা ঘুরে গেল সুলতানা আহমেদের দিকে, খুলে গেছে চোখ, তবে মণি নয়, ওল্টানো চোখের শুধু সাদা অংশটা দেখা যাচ্ছে। ভীতিকর। দানবীয় একটা কণ্ঠ বেরিয়ে এল গলার ভেতর থেকে:

'আমি তোমাদের...বন্ধু হতে চাই!'

'আমরা কেন?' আর্তনাদ করে উঠলেন মিসেস আহমেদ।

'আমাদেরকে বাছাই করলে কেন?'

'আমি তোমার মেয়ের সঙ্গে খেলা করতে চাই!' হিসহিস করে উঠল অশ্লীল কণ্ঠটা। 'কাল–' সবার আত্মা কাঁপিয়ে দিয়ে হেসে উঠল ওটা পৈশাচিক গলায়–'কাল আমি অরণীর সঙ্গে এমন খেলা খেলব যে আর কোনদিন ও কারও সঙ্গে খেলার সুযোগ পাবে না।'

তারপর চুপ হয়ে গেলেন মিসেস হোর্সলি। চলে গেছে পিশাচ।

মিসেস হোর্সলির শরীর হঠাৎ দারুণ একটা ঝাঁকি খেল, যেন বৈদ্যুতিক শক্ খেয়েছেন।

'কী হলো, মিসেস হোর্সলি?'

কাঁপতে কাঁপতে সিধে হলেন প্রৌঢ়া, সুলতানা আহমেদের বাড়িয়ে দেয়া হাত ঠেলে সরিয়ে দিলেন। তাঁর চোখে-মুখে আতংকের চিহ্ন। দ্রুত কোটটা হাতে নিয়ে, মাথায় হ্যাট চাপিয়ে ছুটলেন দরজায়।

'আরে, কোথায় যাচ্ছেন?' চেঁচালেন সুলতানা। 'আপনি এভাবে আমাদেরকে ফেলে রেখে যেতে পারেন না।'

'আমি এখানে আর এক সেকেণ্ডও থাকব না।' দোরগোড়ায় এসে ঘুরলেন মিডিয়াম। ভীত চোখে তাকালেন ওদের দিকে। 'আপনাদের জন্য আমি কিছু করতে পারব না। এ ভূত তাড়ানোর ক্ষমতা আমার নেই। এ ভয়ানক শক্তিশালী। বাঁচতে চাইলে এক্ষুনি এ বাড়ি ছাড়ুন!'

মিসেস হোর্সলি দরজা খুলে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন। সুলতানা ফিরলেন স্বামীর দিকে। 'এখন?'

'আমরা এ বাড়িতে আর থাকছি না,' বললেন মোশতাক। 'জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।'

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওরা বেরিয়ে পড়ল বাড়ি ছেড়ে। উঠল মোশতাক সাহেবের বন্ধুর বাড়িতে, পাশের শহরে। মোশতাক সাহেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু শাহাদত আলম পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। বিয়ে থা করেননি। বিশাল একটি বাড়িতে বাস করেন। 'তোমাদের যতদিন ইচ্ছা থাকো এখানে,' সব শুনে বললেন শাহাদত, 'তবে আরও আগেই তোমাদের ওই বাড়ি ছেড়ে দেয়া উচিত ছিল।'

শাহাদত আলমের বাড়িতে ওরা হপ্তাখানেক থাকল। তারপর শাহাদত সাহেবের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও একটা বাড়ি ভাড়া করে উঠে গেলেন মোশতাক। দালালের সঙ্গে কথা হয়েছে। সে শীঘ্রি মোশতাক সাহেবের আগের বাড়িটি বিক্রির ব্যবস্থা করবে বলেছে।

নতুন বাসায় ভালই দিন কাটছে অরণীর। ভূতের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে সবাই স্বস্তিতে আছে। অরণী এবং অরণ্য নতুন স্কুলে ভর্তি হলো। নতুন বন্ধু পেয়ে ভৌতিক সেই স্মৃতি এখন বিস্মৃত অরণীর স্মৃতি থেকে। দশ নভেম্বর পনেরোতে পা দিল ও। বাবা-মা জন্মদিন উপলক্ষে ওকে দামী দামী উপহার দিলেন। উপহার পেয়ে আনন্দে আত্মহারা অরণী। তবে এখনও কেক কাটা হয়নি। অরণী অপেক্ষা করছে বান্ধবী সারার জন্য। স্কুলে সারা ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অরণ্য ঘ্যানঘ্যান করছে কখন কেক কাটা হবে সেজন্য। ওর নাকি সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে।

'আরেকটু অপেক্ষা কর, সোনা ভাইয়া,' ছোট ভাইয়ের গালে চুমু খেল অরণী। 'সারা ফোন করেছে। চলে আসবে এখুনি।'

'ওদের হাসিখুশি মুখ দেখতে কী যে ভাল্লাগছে আমার,' মোশতাক আহমেদ বলেন স্ত্রীকে। 'অথচ চিন্তা করো গত বছর এ সময় আমার মেয়েটা কী বিপর্যয়ের মাঝখান দিয়েই না যাচ্ছিল!'

'শ্ শ্,' স্বামীর ঠোঁটে আঙুল চেপে ধরলেন সুলতানা। 'ওসব অলক্ষুণে কথা মনেও এনোনা। যা গেছে গেছে। আমি ওই স্মৃতি আর মনে করতে চাই না।'

বেজে উঠল ডোরবেল। 'ওই তো সারা এসে পড়েছে!' লাফিয়ে উঠল অরণী।

ছুটে গেল ও দরজায়। টান মেরে খুলে ফেলল কবাট। কপালে ভাঁজ ফেলে পিছিয়ে এল এক কদম। কেউ নেই।

ঠিক তখন ঠাণ্ডা, দমকা একটা হাওয়া ঢুকল ঘরে। ঠাস করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। অরণীর মুখ ছাই হয়ে গেল। বিশ্রী একটা গন্ধ পাচ্ছে ও। লাশপচা বিকট দুর্গন্ধ ভারী করে তুলল বাতাস। তারপর ভীষণ গলায়, খলখল একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল ঘরে।

পশ্চিমের জানালা

টেবিলের কাছে এসে হঠাৎ থেমে গেল মেরী ফুপুর পায়ের আওয়াজ। ঘাড় ঘোরাল ক্লডেটা কী হয়েছে দেখার জন্য। ফুপু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ জোড়া ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোতে স্থির। যে দরজা দিয়ে তিনি ঘরে ঢুকেছেন তার বিপরীতে জানালাটা। মেরী ফুপু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ধরে রেখেছেন ছড়ি।

ক্লডেটা চট করে একবার তার স্বামীর দিকে তাকাল। টেবিলে বসা আর্নেস্টের চোখও মেরী ফুপুর দিকে। তার চেহারা ভাবলেশশূন্য। ফুপুর দিকে আবার নজর দিল ক্লডেটা। বৃদ্ধা এবার তার দিকে নীরবে কটমট করে তাকিয়ে আছেন। অস্বস্তি বোধ করল ক্লডেটা।

'পশ্চিমের জানালার পর্দা তুলেছে কে?'

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল ক্লডেটার। 'আমি, ফুপু। দুঃখিত। মনে ছিল না যে আপনি ও জানালার পর্দা তুলতে মানা করেছিলেন।'

মেরী ফুপুর গলা দিয়ে বিরক্তিসূচক 'ঘোঁত' জাতীয় একটা শব্দ বেরিয়ে এল, আবার দৃষ্টি ফেরালেন ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোতে। আবছা একটা ইঙ্গিত করলেন তিনি হাত তুলে, হলঘরের অন্ধকার থেকে ছুটে এল লিসা, সে এতক্ষণ তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে লক্ষ করছিল ক্লডেটা এবং আর্নেস্টকে। চাকরানি মেয়েটা বিনাবাক্যব্যয়ে চলে এল পশ্চিম জানালার সামনে, নামিয়ে দিল পর্দা।

ধীর পায়ে টেবিলে এলেন মেরী ফুপু, মাথার ধারের চেয়ারটা দখল করলেন। চেয়ারের পাশে রাখলেন ছড়ি। ঘাড়ে ঝোলালেন চশমার চেইন। লম্বা হাতলঅলা চশমাটা তাঁর কোলে ঝুলতে লাগল। ক্লডেটার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তাকালেন ভাইপোর দিকে।

টেবিলের অন্য প্রান্তের খালি চেয়ারটিতে এবার তাঁর চোখ ঘুরে এল, এমন ভঙ্গিতে কথা বলে উঠলেন যেন তাঁর পাশে বসা মানুষ দু'জন সম্পর্কে সচেতন নন।

'তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে পশ্চিমের জানালার পর্দা তোলা যাবে না। তোমরা নিশ্চয় লক্ষ করেছ রাতের বেলা এ বাড়ির কেউ এক-মুহূর্তের জন্যও ও পর্দা তোলে না। তোমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছি আমি পুবমুখো ঘরে। আমাদের বৈঠকখানাটাও পুবমুখো।'

'তোমার নিষেধাজ্ঞা নিশ্চয় মনে ছিল না ক্লডেটার,' বলল আর্নেস্ট, 'থাকলে কাজটা ও করত না।'

'জ্বী, ফুপু। আমি আপনার নিষেধ ভুলে গিয়েছিলাম।' সায় দিল ক্লডেটা।

মুখ তুলে তাকালেন বৃদ্ধা, নির্বিকার সুরে বলে যেতে লাগলেন, 'কেন কাজটা করতে নিষেধ করেছিলাম সে কারণ বলা উচিত হবে না ভেবেই কিছু জানাইনি। আমি এখনও কোনও ব্যাখ্যা দেব না। তবে ওই পর্দা তোমরা কখনোই তুলবে না। তুললে মস্ত বিপদ হবে। আর্নেস্ট কারণটা জানে। কিন্তু, ক্লডেটা, তুমি কারণটা জানো না।'

ক্লডেটা আড়চোখে একবার তাকাল স্বামীর দিকে। ব্যাপারটা মেরী ফুপুর নজর এড়াল না। বললেন, 'তোমরা হয়তো ভাবছ আমার মাথায় গোলমাল আছে কিংবা আমি পাগলামি করছি। তবে তোমরা যা কিছু ভাবতে পারো। আমার তাতে কিছু যায় আসে না।'

হঠাৎ এক যুবক ঘরে ঢুকল। টেবিলের ও মাথার খালি চেয়ারটিতে বসে পড়ল ধপ করে। ঘরের তিনজনের দিকে তাকিয়ে হালকা মাথা ঝাঁকাল। 'আবার তুমি দেরি করে ফেলেছ, হেনরী,' বললেন বৃদ্ধা।

বিড়বিড় করে কী যেন বলল হেনরী, ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের প্লেটে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ হয়ে গেলেন ফুপু, তিনিও খাওয়া শুরু করলেন। ক্লডেটা এবং আর্নেস্ট যোগ দিল ওদের সঙ্গে। বুড়ো চাকরটা, মেরী ফুপুর সার্বক্ষণিক সঙ্গী, এতক্ষণ বৃদ্ধার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার চলে গেল হেনরীর দিকে অপাঙ্গে ভর্ৎসনার দৃষ্টি

বুলিয়ে।

খেতে খেতে মুখ তুলে তাকাল ক্লডেটা, সাহস করে বলল, 'মেরী ফুপু, এখানে নিশ্চয় সবসময় আপনার একা একা লাগে না।'

'না, তা লাগে না। কারণ টেলিফোন আছে, গাড়ি আছে। তবে কুড়ি বছর আগের অবস্থা ছিল ভিন্ন।' কী যেন মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি। আর্নেস্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের দাদা তখন বেঁচে ছিলেন। ওই সময় প্রায়ই তুষার ঝড় হত। উনি আটকা পড়ে যেতেন বাড়িতে। কাউকে খবরটা জানানোর উপায় ছিল না।'

'শিকাগোতে যখন কেউ বলে "উত্তরে যাব" কিংবা "উইসনকন উডসে" যাব, মনে হয় অনেক দূরে যাবার কথা বলছে,' মন্তব্য করল ক্লডেটা।

'দূর তো বটেই,' বলে উঠল হেনরী। 'ফুপু, এখানে যদি আটকা পড়ে যাই, বাড়ি ফেরার কোনও বন্দোবস্ত নিশ্চয় তুমি করে রেখেছ। বাইরে তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। রেডিওর খবরে বলেছে ঝড় হবে।'

অসন্তোষসূচক একটা শব্দ করলেন মেরী ফুপু। 'হা, হেনরী—তুই বড্ড বেশি দুশ্চিন্তা করিস। তোদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে তোরা যেন আমার বাড়িতে বেড়াতে এসে পাপ করে ফেলেছিস, তুষার ঝড়ের চিন্তায় যদি এখনই আত্মা উড়ে যায় তো বল, স্যামকে বলি তোকে ওয়াসাউতে গাড়ি করে নামিয়ে দিয়ে আসবে। কাল পৌঁছে যাবি শিকাগো।'

'আরে না না। আমি সেরকম কিছু বলেছি নাকি?'

নীরবতা নেমে এল ঘরে। বৃদ্ধা মৃদু গলায় ডাকলেন, 'লিসা।' চাকরানি ঘরে ঢুকল। ফুপুকে চেয়ার ছেড়ে সিধে হতে সাহায্য করল। ক্লডেটা তার স্বামীকে বলেছে ফুপু আসলে নিজেই চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারেন। কিন্তু ওঠেন না। দেখাতে চান তিনি অসুস্থ।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে সবাইকে শুভ রাত্রি জানালেন মেরী ফুপু। তাঁর এক হাতে ছড়ি, অন্য হাতে চশমা। তাঁকে ভয়ংকর একটা শক্তির মত লাগল। তিনি হলঘরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভেসে এল ক্রমে অপসৃয়মাণ পদশব্দ। চাকরদের জুতোর শব্দও শোনা

গেল। এরা সারাক্ষণ ফুপুর ছায়া হয়ে লেগে রয়েছে বৃদ্ধার সঙ্গে। এ বাড়িতে অধিবাসী ওই তিনজনই–ফুপু এবং তাঁর দুই বিশ্বস্ত ভৃত্য। কালেভদ্রে দু' একদিনের জন্য ফুপুর সঙ্গে দেখা করতে আসে আর্নেস্ট। আর্নেস্টকে খুব পছন্দ করেন ফুপু। হেনরীও আসে তাঁর ফুপুর একাকীত্ব কিছু সময়ের জন্য দূর করে দিতে। হেনরীর বাবাকে পছন্দ করতেন না ফুপু। কোনদিন তার সঙ্গে কথা বলেননি। মনিবনীর ছায়া লিসা কিংবা স্যাম, কারও সঙ্গেই অপ্রয়োজনে কথা বলেন না মেরী।

ক্লডেটা নার্ভাস চোখে স্বামীর দিকে তাকাল। তবে ওদের মনের কথাটা ফাঁস করে দিল হেনরী। 'ফুপুর আসলে মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিয়েছে,' উদাস গলায় ঘোষণা করল সে। 'গোলমাল আছে মাথায়।' আপত্তি করে কিছু বলতে যাচ্ছিল ক্লডেটা, বাধা পেল হেনরীকে চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতে দেখে। ঢুকল বৈঠকখানায়। ও ঘরে রেডিও বাজছে।

অলস ভঙ্গিতে হাতের চামচ নাড়তে নাড়তে ক্লডেটা বলল, 'ফুপু পাগল নন, আর্নেস্ট। খানিকটা খেয়ালী প্রকৃতির মানুষ।'

হাসল আর্নেস্ট। 'না। আমি তোমার সঙ্গে একমত নই। পশ্চিমের জানালা কেন উনি পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখেন তার কারণ আমি জানি। আমার দাদা ওখানে মারা যান–এক রাতে। বরফের মধ্যে আটকে যান তিনি, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসতে পারেননি। জমে বরফ হয়ে গিয়েছিলেন। জানি না ঠিক কীভাবে ঘটেছিল ঘটনা–আমি তখন শহরে ছিলাম না। ফুপু ঘটনাটা মনে করতে চান না।'

'কিন্তু উনি কীসব বিপদ আপদের কথা বললেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল আর্নেস্ট। 'বিপদের চিন্তাটা সম্ভবত তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত–এমনিই ভয়ে কাতর হয়ে আছেন। আমাদেরকেও ভয় দেখাতে চাইছেন।' একমুহূর্ত চুপ করে থাকল ও, তারপর যোগ করল, 'ফুপুকে বোধহয় তোমার একটু অদ্ভুত মনে হচ্ছে–তবে উনি ওরকমই। অনেকদিন ধরে তো দেখে আসছি ওঁকে। ক'টা দিন যাক। আবার যখন আসবে এখানে, ফুপুর পাগলামোতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।'

কী যেন বলার জন্য স্বামীর দিকে তাকাল ক্লডেটা।

নিশ্চুপ রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'এ বাড়িটি আমার পছন্দ

হয়নি, আর্নেস্ট। কেমন ভুতুড়ে।'

'আরে ধ্যাত, ভুতুড়ে হতে যাবে কেন।' চেয়ার ছেড়ে খাড়া হতে যাচ্ছে আর্নেস্ট, খপ করে ওর জামার আস্তিন খামচে ধরল ক্লডেটা।

'শোনো, আর্নেস্ট। মেরী ফুপু যে আমাকে পশ্চিমের জানালার পর্দা তুলতে মানা করেছেন সে কথা আমার স্পষ্ট মনে ছিল। আমি পর্দা তুলতেও চাইনি—কিন্তু ভেতর থেকে কেউ যেন বারবার হুকুম করছিল—*পর্দা তোলো! পর্দা তোলো!* কেউ একজন কাজটা করতে আমাকে বাধ্য করেছে।' গলা কেঁপে গেল ক্লডেটার।

'কেন, ক্লডেটা,' সামান্য সতর্ক শোনাল আর্নেস্টের কণ্ঠ, 'এ কথা তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন?' শ্রাগ করল ক্লডেটা। 'মেরী ফুপু হয়তো ভাবতেন আমি বানিয়ে বলছি।'

'এটা সিরিয়াস কোনও ব্যাপার নয়। বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে রাতের ঘুম হারাম করার কোনও দরকার নেই। ভুলে যাও সব। অন্য কিছু নিয়ে ভাবো। চলো, রেডিওতে গান শুনি।'

চেয়ার ছাড়ল দু'জনে, একসঙ্গে পা বাড়াল বৈঠকখানায়। দোরগোড়ায় দেখা হয়ে গেল হেনরীর সঙ্গে। একপাশে সরে দাঁড়াল সে পথ করে দেয়ার জন্য। 'জানতাম এখানে আটকা পড়ে যাব,' বলল সে।

'ঝড় আসছে। তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।' ওদেরকে পাশ কাটাল হেনরী, ঢুকল জনশূন্য ডাইনিং রুমে। খুব বেশি লম্বা টেবিলটির দিকে এক ঠায় তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ঘুরল। চলে এল ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর সামনে। টেনে সরাল পর্দা। উঁকি দিল অন্ধকারে। ওকে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বৈঠকখানার ঘর থেকে চেঁচাল আর্নেস্ট।

'ফুপু না জানালার পর্দা সরাতে মানা করেছেন, হেনরী?'

আধপাক ঘুরল হেনরী। জবাব দিল, 'ফুপুর কুসংস্কার থাকতে পারে। আমার নেই।'

ক্লডেটা হেনরীর কাঁধের ওপর দিয়ে, ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বাইরের অন্ধকারে, হঠাৎ বলে উঠল,

•

'ওখানে কে?'

হেনরী ঝট করে জানালার কাচে নজর ফেরাল। 'কই, কেউ নেই তো! ওটা তুষার। ঝড়ো বাতাস জমাট বাঁধা তুষার ঠেলে নিয়ে আসছে।' সে ঠেলে দিল পর্দা। সরে এল জানালার সামনে দিয়ে। অনিশ্চয়তার গলায় ক্লডেটা বলল, 'কিন্তু আমি যেন দেখলাম কে একজন সরে গেল জানালার সামনে দিয়ে।'

'দূর থেকে দেখলে ওরকম অনেক কিছুই মনে হতে পারে,' মন্তব্য করল হেনরী। চলে এসেছে বৈঠকখানায়। 'মেরী ফুপুর পাগলামো তোমাকেও পেয়ে বসেছে দেখছি।'

আর্নেস্ট চোখ পাকাল ক্লডেটার দিকে তাকিয়ে। ক্লডেটা স্বামীর ইশারা বুঝতে পেরে চুপ হয়ে গেল। হেনরী রেডিওর সামনে বসে ধীরে ধীরে ঘোরাতে লাগল ডায়াল। আর্নেস্ট একটা বই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কয়েক পাতা পড়েই মজা পেয়ে গেল। বুঁদ হয়ে গেল পড়ায়। কিন্তু ক্লডেটা পাথর হয়ে তাকিয়ে থাকল ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর দিকে। অনেকক্ষণ পরে সে উঠে পড়ল, বেরিয়ে এল ঘর থেকে, লম্বা হলঘর ধরে এগিয়ে চলল বাড়ির পূর্ব উইং-এর দিকে।

মেরী ফুপুর ঘরের দরজায় মৃদু টোকা দিল।

'ভেতরে এসো,' আহ্বান করলেন বৃদ্ধা।

দরজা খুলল ক্লডেটা, পা রাখল ঘরে। ড্রেসিং রোব পরে সোফায় বসে আছেন মেরী ফুপু। সঙ্গী ছড়ি এবং চশমা। তাঁকে আশ্চর্য শান্ত লাগছে।

'আমার কাণ্ড কারখানা দেখে নিশ্চয় ভাবছ মহিলার মাথায় ছিট আছে, তাই না?' হাসলেন বৃদ্ধা। 'পশ্চিমের ওই জানালা নিয়ে আমার মনে অবশ্য খানিকটা ভীতি আছে।'

'আমি ওই জানালা নিয়েই আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, ফুপু।' বলল ক্লডেটা। থেমে গেল ও। বৃদ্ধার মুখ ভঙ্গি একদম পাল্টে গেছে। ক্রোধ কিংবা বিতৃষ্ণা নয়—ভয় ফুটেছে তাঁর চেহারায়।

'কী?' সংক্ষেপে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'একটু আগে—জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই একজনকে দেখতে

পেয়েছি আমি।'

'অবশ্যই তুমি কাউকে দেখতে পাওনি, ক্লডেটা। এ তোমার কল্পনা। বরফ পড়ছে। জমাট বাঁধা বরফকে মানুষ ভেবেছ।'

'আমার কল্পনা? হতেও পারে। তবে আমার কিন্তু সত্যি মনে হচ্ছিল কে যেন হেঁটে আসছে।'

'দৃষ্টিবিভ্রমে আমিও ওরকম অনেক কিছু দেখেছি, মাই ডিয়ার। মাঝে মাঝে সকাল বেলায় বেরিয়েছি বরফে পায়ের ছাপ খুঁজতে। কিন্তু কোনও পায়ের ছাপ দেখতে পাইনি। তুষার ঝড় শুরু হয়েছে, আমাদের গাড়ি আছে, ফোন আছে। অথচ সভ্যতা থেকে এখন আমরা একরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছি। কাছের গ্রামটাও এখান থেকে কমপক্ষে তিন মাইল দূরে—পাহাড়ের কোলে। মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল এক জঙ্গল। ওই গ্রাম ছাড়া কাছেপিঠে আর কোনও হাইওয়েও নেই। এমন ঝড়ের রাতে পাগলও রাস্তায় বেরুবে না।'

'কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি লোকটাকে পরিষ্কার দেখেছি।'

'সকাল বেলায় কি ব্যাপারটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাইছ?' তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন ফুপু।

'জ্বী না।'

'তার মানে তুমি আসলে কিছু দেখনি?'

অর্ধেক প্রশ্ন, অর্ধেক হুকুমের মত শোনাল কথাটা। ক্লডেটা বলল, 'মেরী ফুপু, আপনি কিন্তু ব্যাপারটাকে এখন একটা ইস্যু করতে চাইছেন।'

'তোমার মন কী বলে—তুমি দেখেছ নাকি দেখনি?'

'আমি দেখিনি, ফুপু।'

'বেশ। এ প্রসঙ্গ থাক। এবার অন্য কোনও বিষয় নিয়ে কথা বলি।'

'জ্বী, আচ্ছা—আমি দুঃখিত, ফুপু। জানতাম না আর্নেস্টের দাদা ওখানে মারা গেছেন।'

'সে তোমাকে একথা বলেছে?'

'জ্বী। বলেছে সূর্যাস্তের পরে পাহাড়ের ঢালটা আপনি দেখতে চান না কারণ দাদুর স্মৃতি নাকি আপনার মনে পড়ে যায়।'

নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ক্লডেটার দিকে তাকালেন বৃদ্ধা।

'ও হয়তো নিজেও জানে না ঢিলটা প্রায় কানের পাশ দিয়ে গেছে।'

'মানে?'

'মানেটা তোমার না জানলেও চলবে, মাই ডিয়ার।' আবার হাসলেন তিনি। কাঠিন্যটা মুছে যাচ্ছে চেহারা থেকে। 'তুমি এখন যাও, ক্লডেটা, আমি ক্লান্ত।'

বাধ্যগত মেয়ের মত সিধে হলো ক্লডেটা, পা বাড়াল দরজায়। বৃদ্ধার কণ্ঠ শুনে থমকে দাঁড়াল। 'আবহাওয়ার অবস্থা কীরকম?'

'বরফ পড়ছে—ভীষণ। হেনরী বলেছে—ঝড়ো বাতাসও বইছে।'

বৃত্তান্ত শুনে থমথমে হয়ে উঠল বৃদ্ধার চেহারা। 'খবরটা ভাল না। মোটেই ভাল খবর না। ধরো, আজ রাতে কেউ যদি ওই ঢালটার দিকে তাকায়?' আপন মনে কথা বলছেন ফুপু, ক্লডেটার উপস্থিতি সম্পর্কে যেন একদমই সচেতন নন। দ্রুত একবার ওকে দেখে নিলেন। বললেন, 'অবশ্য তুমি তো কিছুই জানো না, ক্লডেটা। শুভ রাত্রি।'

বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ক্লডেটা। তুমি তো কিছুই জানো না, ক্লডেটা কথার মানে কী? বৃদ্ধা দু'এক মুহূর্তের জন্য যেন ক্লডেটার উপস্থিতি ভুলে গিয়েছিলেন। আপন মনে কী যেন ভাবছিলেন। কী ভাবছিলেন?

দরজার সামনে থেকে সরে এল ক্লডেটা, পূর্ব উইং-এ মোড় নিয়েছে, আর্নেস্টের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

'ওহ্, তুমি,' বলল সে। 'আর এদিকে আমি তোমাকে খুঁজে মরছি।'

'আমি মেরী ফুপুর সঙ্গে গল্প করছিলাম।'

'হেনরী আবার পশ্চিমের জানালার পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরেছে। বলল কাকে যেন দেখেছে।'

ভুরু কুঁচকে গেল ক্লডেটার। 'তাই নাকি?'

গম্ভীর চেহারা আর্নেস্টের। মাথা দোলাল। 'ভয়ানক তুষার পড়ছে। তোমার মত পাগলামি ওকেও গ্রাস করেছে দেখছি।'

ঘুরল ক্লডেটা, হলঘর ধরে এগোল। 'মেরী ফুপুকে কথাটা বলে আসি।'

বাধা দিতে গিয়েও ব্যর্থ হলো আর্নেস্ট। ক্লডেটা বৃদ্ধার ঘরের দরজায় টোকা দিতে শুরু করেছে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। ওকে থামানোর সুযোগ পেল না আর্নেস্ট।

'মেরী ফুপু,' বলল ক্লডেটা, 'আপনাকে আবার বিরক্ত করার ইচ্ছা ছিল না। হেনরী ডাইনিংরুমের ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো দিয়ে কাকে যেন দেখেছে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

মহিলার প্রতিক্রিয়া হলো দেখার মত। 'ও ওদেরকে দেখেছে!' আঁতকে উঠলেন তিনি। ঝট করে খাড়া হলেন, সবেগে ছুটে এলেন ক্লডেটার দিকে। 'কতক্ষণ আগে?' ক্লডেটার হাত খামচে ধরলেন সজোরে। 'জলদি বলো, কতক্ষণ আগে সে ওদেরকে দেখেছে?'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা হজম করতে একটু সময় লাগল ক্লডেটার, অবশেষে কথা বলল ও, ফুপু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। 'কিছুক্ষণ আগে, মেরী ফুপু, সাপারের পরে।'

ক্লডেটাকে ছেড়ে দিলেন বৃদ্ধা। 'ওহ্,' কাতরে উঠলেন তিনি। ঘুরলেন। স্খলিত পদক্ষেপে ফিরে গেলেন নিজের আসনে, ঘরের কিনারে রাখা ছড়িখানা তুলে নিলেন হাতে। 'তার মানে বাইরে সত্যি কেউ আছে?' চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্নটা করল ক্লডেটা। বৃদ্ধা বসে পড়েছেন চেয়ারে।

অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকলেন তিনি। তারপর মাথা ঝাঁকালেন, প্রায় অস্পষ্ট একটা শব্দ বের হয়ে এল দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। 'হুঁ।'

'তা হলে ওদেরকে ভেতরে নিয়ে আসি, মেরী ফুপু?'

বৃদ্ধা ক্লডেটার দিকে তাকালেন, কথা বলার সময় গলার স্বর থাকল নিচু ও দৃঢ়, দৃষ্টি নিবদ্ধ ঘরের দেয়াল ছাড়িয়ে। 'ওদেরকে আমরা ভেতরে নিয়ে আসতে পারব না, ক্লডেটা। কারণ ওরা জীবিত নয়।'

হেনরীর কথাটা মনে পড়ে গেল ক্লডেটার। 'ফুপুর মাথায় গোলমাল আছে।' ওর চিন্তাটা যেন পড়তে পারলেন বৃদ্ধা। বললেন, 'তুমি হয়তো ভাবছ, আমি একটা পাগল। কিন্তু আমি পাগল নই, মাই ডিয়ার। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল যা দেখছি তা সুস্থ মানুষে দেখে না। কিন্তু আমি সুস্থ মস্তিষ্ক নিয়েই দৃশ্যটা দেখেছি। প্রথমে শুধু একজন ছিল—মেয়েটা।

পরে তার সঙ্গে যোগ দেন বাবা। অনেক দিন আগে, তখন আমার বয়স খুব কম, বাবা এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসেন যে জন্য সারাজীবন তাঁকে মনস্তাপ করতে হয়েছে। বাবা ছিলেন বদমেজাজী স্বভাবের মানুষ। হুটহাট রেগে যেতেন। রেগে গেলে মাথার ঠিক থাকত না। এক রাতে তিনি আমার এক ভাইকে–হেনরীর বাবাকে–তাঁর এক চাকরানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেন। মেয়েটা ছিল খুবই সুন্দরী, কিশোরী। বাবা ভেবেছিলেন সব দোষ ওই মেয়েটার। যদিও আসলে সে এসবের জন্য দায়ী ছিল না। কিন্তু বাবা যখন তাঁর ভুল বুঝতে পারেন ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। বাবা মেয়েটাকে তক্ষুণি ঘর থেকে বের করে দেন। তখনও শীতের আগমন ঘটেনি, তবে বেশ ঠাণ্ডা পড়ছিল। মেয়েটার বাড়ি ছিল পাঁচ মাইল দূরে। আমরা বাবাকে মিনতি করেছিলাম তিনি যেন মেয়েটিকে তাড়িয়ে না দেন–যদিও ওই সময় বুঝতে পারছিলাম না মেয়েটির অপরাধ কী–কিন্তু বাবা আমাদের কথায় কর্ণপাত করেননি। মেয়েটিকে চলে যেতে হয়। মেয়েটা ঘর থেকে বেরুবার খানিক পরেই বইতে থাকে প্রবল বাতাস, দেখতে দেখতে শুরু হয়ে যায় ভয়ানক তুষার ঝড়। বাবা তখন আফসোস করছিলেন কেন মেয়েটিকে এমন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে বের করে দিলেন। তিনি কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দেন মেয়েটির খোঁজে। কিন্তু তারা ওই রাতে মেয়েটিকে আর খুঁজে পায়নি। পরদিন মেয়েটির সন্ধান মেলে। পশ্চিমে, উঁচু পাহাড়টার ঢালে পড়ে ছিল সে। বরফে জমাট বাঁধা শরীর। মৃত।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বৃদ্ধা। এক মুহূর্ত নীরব রইলেন। তারপর আবার বলে চললেন, 'কয়েক বছর পরে ফিরে আসে মেয়েটি। সে রাতেও ঝড় হচ্ছিল। তুষারঝড়। মেয়েটি তখন ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হয়েছে। আমরা সবাই তাকে দেখেছি। টেবিলে বসে রাতের খানা খাচ্ছিলাম। বাবা-ই প্রথম তাকে দেখতে পান। আমার ভাইয়েরা ততক্ষণে খেয়েদেয়ে ওপরের ঘরে ঘুমাতে চলে গেছে। টেবিলে ছিলাম আমরা তিনজন। বাবা আর আমরা দুই বোন। আমরা অবশ্য মেয়েটিকে চিনতে পারিনি। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর ওপাশে, বরফের মধ্যে আবছা একটা কাঠামো শুধু দেখেছি আমরা। তবে বাবা ওকে দেখেই

চিনে ফেলেন। তিনি দরজা খুলে ছুটে যান মেয়েটির দিকে। আমাদেরকে বলেছিলেন ভাইদেরকে ডেকে তুলতে। ওরা যেন বাবার সঙ্গে যায়। বাবাকে আমরা আর জীবিত পাইনি। পরদিন সকালে ওই পাহাড়টার ঢালে সেই একই জায়গায়, যেখানে মেয়েটির লাশের খোঁজ মিলেছিল, সেখানে বাবাকে চিৎ হয়ে পড়ে থাকতে দেখি। ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে মরে গেছেন।

'এরপর, কয়েক বছর বাদে–মেয়েটি ফিরে আসে এক তুষার ঝরা রাতে। সঙ্গে ছিলেন বাবা। উনিও তখন ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হয়েছেন। শীতের পুরোটা সময় পাহাড়ে দেখা গেছে তাদেরকে। সব সময়ই প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছেন কাউকে না কাউকে তাদের দলে ভেড়ানোর জন্য। হাতছানি দিয়ে ডাকতেন। তারপর থেকে আমি শীতের রাতগুলোতে পশ্চিমের জানালা পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখি সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। ওরা শীতের সময় পশ্চিমের ঢাল ছেড়ে কোথাও যায় না। এখন তুমি গল্পটা জানলে, ক্লডেটা।'

ক্লডেটা কী যেন বলতে যাচ্ছিল, বাধা পেল পায়ের শব্দে। কেউ ছুটে আসছে এদিকে। খোলা দরজায় উদয় হলো আর্নেস্ট।

'তোমরা চলে এসো,' খুশি খুশি গলায় বলল সে। 'পশ্চিমের ঢালে দু'জন মানুষ আছে–একটি মেয়ে আর এক বুড়ো–হেনরী ওদেরকে নিয়ে আসতে গেছে!'

হাসি হাসি মুখ করে চলে গেল সে। ক্লডেটা লাফ মেরে খাড়া হলো, কিন্তু মেরী ফুপুর পায়ে যেন পাখা গজিয়েছে, তিনি ঝড়ের বেগে ওকে পাশ কাটালেন, হলঘরে ছুটতে ছুটতে, উঁচু গলায় ডাকলেন লিসাকে। সে নাইট ক্যাপ আর গাউন পরা অবস্থায় নিজের ঘর থেকে তখুনি হাজির হয়ে গেল। 'স্যামকে খবর দাও, লিসা,' বললেন বৃদ্ধা, 'আমি ডাইনিংরুমে গেলাম। ওকে ওখানে পাঠিয়ে দাও।'

একছুটে ডাইনিংরুমে ঢুকে পড়লেন তিনি। ক্লডেটা তাঁর পেছন পেছন এল। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো খোলা, আর্নেস্ট বরফে ঢাকা টেরেসের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চাচাত ভাইয়ের নাম ধরে ডাকছে। বৃদ্ধা সোজা তাঁর ভাইপো'র দিকে এগোলেন। বরফে হোঁচট খাচ্ছেন।

পর্যায়ক্রমে তাঁর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঝড়ো হাওয়া। জঙ্গলাকীর্ণ পশ্চিম পাহাড়ের ঢাল কুয়াশা আর বরফে প্রায় চেনাই যাচ্ছে না; সবচেয়ে কাছের গাছপালাগুলোর অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

'ওরা কোথায় গেল?' জিজ্ঞেস করল আর্নেস্ট, ফিরল বৃদ্ধার দিকে। ভেবেছে ক্লডেটা। কিন্তু বৃদ্ধাকে দেখে চমকে গেল। 'আরি, এখানে তুমি কী করো, ফুপু? ঠাণ্ডায় তো জমে যাবে।'

'আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না, আর্নেস্ট,' বললেন মেরী ফুপু। 'আমার কিছু হবে না। আমি স্যামকে বলেছি আসতে। ওকে সঙ্গে নিয়ে হেনরীকে খুঁজতে যেয়ো। যদিও আমার মন বলছে ওকে আর খুঁজে পাবে না।'

'ও বেশি দূরে যেতে পারেনি; এই মাত্র তো বেরুল।'

'তুমি ওকে দেখার আগেই ও চলে গেছে; এতক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে।'

গায়ে গ্রেটকোট চড়িয়ে ডাইনিংরুম থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এল স্যাম। তার বয়স প্রায় ফুপুর সমান। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল বৃদ্ধার দিকে, 'ওরা কি আবার এসেছে?'

মাথা দোলালেন মেরী ফুপু। 'হেনরীকে খুঁজে বের করো। তোমার সঙ্গে আর্নেস্ট যাবে। তবে খবরদার কেউ কারও কাছ ছাড়া হবে না। আর বাড়ি থেকে বেশি দূরেও যাবে না।'

আর্নেস্টের ওভারকোট নিয়ে চলে এল ক্লডেটা। দুই নারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ওরা যাচ্ছে। একসময় বরফের দেয়াল ওদেরকে আড়াল করে ফেলল। ক্লডেটা এবং মেরী ফুপু ধীর পায়ে ফিরে এল বাড়িতে।

জানালার দিকে মুখ ফেরানো একটি চেয়ারে নেতিয়ে পড়লেন ফুপু। ম্লান, বিবর্ণ চেহারা। অনেকক্ষণ চুপচাপ রইলেন তিনি। তারপর, ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরলেন ক্লডেটার দিকে। বললেন, 'এবারে ওরা তিনজন হলো।'

ঠিক তখন, হঠাৎ জানালায় উদয় হলো আর্নেস্ট এবং স্যাম, টানতে টানতে নিয়ে আসছে হেনরীকে। মেরী ফুপু ঝড়ের বেগে ছুটে গেলেন জানালায়, একটানে খুলে ফেললেন। সারা গায়ে বরফ মেখে ওরা

তিনজন ঢুকল ঘরে।

'ওকে পেয়েছি বটে তবে ওর অবস্থা মোটেই ভাল না,' বলল আর্নেস্ট। 'ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গেছে।'

ফুপু লিসাকে গরম পানি আনতে পাঠিয়ে দিলেন। আর্নেস্ট নিজেদের ঘরে ঢুকল গরম কাপ আনার জন্য। ক্লডেটা স্বামীর সঙ্গে এল। স্বামীকে ফুপুর গল্পটা শোনাল।

হেসে উঠল আর্নেস্ট। 'আর তুমিও ফুপুর গল্পটা বিশ্বাস করে বসে আছ, তাই না? স্যাম এবং লিসা এ গল্প বিশ্বাস করে আমি জানি। কারণ স্যাম গল্পটা বহু আগে আমাকে বলেছে। আসলে দাদার মৃত্যু শোক ওরা কেউই সামলে উঠতে পারেনি।'

'কিন্তু মেয়েটার কাহিনি, তারপর—'

'ওটার অংশবিশেষ বোধহয় সত্যি। নোংরা একটা গল্প। তবে বানানো নয়।'

'কিন্তু আমি আর হেনরী যে মানুষগুলোকে দেখলাম!' দুর্বল গলায় প্রতিবাদ করতে চাইল ক্লডেটা।

আর্নেস্ট জায়গা ছেড়ে নড়ল না। 'ও আচ্ছা,' বলল সে। 'আমিও ওদেরকে দেখেছি। তা হলে ওরা সত্যি ওখানে আছে। ওদের খুঁজে বের করা দরকার।' ওভারকোটটা আবার তুলে নিল আর্নেস্ট, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ গলায় ওকে যেতে মানা করল ক্লডেটা। ডাইনিং-রুমের দরজায় ফুপুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আর্নেস্টের। তিনি ক্লডেটার কাকুতি-মিনতি শুনতে পেলেন।

'না, আর্নেস্ট—তোমার আবার বাইরে যাওয়া চলবে না,' বললেন ফুপু। 'ওখানে কেউ নেই।'

বৃদ্ধাকে ঠেলে সরিয়ে ঘরে ঢুকল আর্নেস্ট। হাঁক ছাড়ল স্যামের উদ্দেশে। 'তুমি আসছ তো, স্যাম? বাইরে এখনও দু'জন মানুষ আছে—ওদের কথা তো ভুলেই গেছিলাম।'

স্যাম অদ্ভুত চোখে তাকাল আর্নেস্টের দিকে। 'মানে?' কর্কশ শোনাল কণ্ঠ। চোখ ফেরাল বৃদ্ধার দিকে। তিনি ডানে-বামে মাথা নাড়লেন।

'মেয়েটা আর একটা বুড়ো লোক, স্যাম। ওদেরকেও ঘরে নিয়ে আসা দরকার।'

'ওরা!' বলল স্যাম। 'ওরা তো মারা গেছে!'

'তুমি না গেলে না যাবে। আমি একাই যাব।' বলল আর্নেস্ট।

হঠাৎ লাফ মেরে সিধে হলো হেনরী। তাকে কেমন বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। কয়েক কদম সামনে বাড়ল, ঘরের বাসিন্দাদের উপর একে একে চোখ বুলাল, কিন্তু কাউকেই যেন দেখছে না। ফাঁকা, শূন্য দৃষ্টি। হঠাৎ কথা বলতে লাগল ও, রিনরিনে, অস্বাভাবিক শিশু-কণ্ঠ।

'বরফ,' বিড়বিড় করছে হেনরী, 'বরফ সুন্দর সুন্দর হাত, ছোট ছোট, ভারী সুন্দর হাত–বরফ, কী চমৎকার বরফ, পেঁজা তুলোর মত তুষার উড়ছে, উড়ে পড়ছে মেয়েটির গায়ে...'

ধীর গতিতে ঘুরল হেনরী, তাকাল পশ্চিমের জানালায়। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল অন্যান্যরা। জানালার ওপাশে সাদা একটা দেয়াল। বরফের দেয়াল। হেনরী ওদিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকল। হঠাৎ দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল সাদা একটা ছায়ামূর্তি–একটি মেয়ে। কিশোরী। গায়ের আলখাল্লাটা বরফে সাদা হয়ে গেছে। তাকিয়ে আছে সে। আঁধারে জ্বলজ্বল করছে চোখ জোড়া, ভীতিকর একটা দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে গেলেন মেরী ফুপু ভাইপোকে ধরার জন্য। কিন্তু তার আগেই জানালায় দৌড়ে গেছে হেনরী। এক ঝটকায় খুলে ফেলল জানালা। আর্ত-চিৎকার দিল ক্লডেটা। ওর আর্তনাদ অগ্রাহ্য করল হেনরী, অদৃশ্য হয়ে গেল বরফের সাদা দেয়ালটার মাঝে। দেয়ালটা যেন ওকে গিলে খেল।

এবারে আর্নেস্ট ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পেছন থেকে ওকে জাপ্টে ধরে ফেললেন বৃদ্ধা। বিড়বিড় করে বললেন, 'তুমি যাবে না! হেনরী সব সাহায্যের ঊর্ধ্বে চলে গেছে!'

ক্লডেটা এসে সাহায্য করল ফুপুকে। শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরে থাকল স্বামীকে। স্যাম দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তাকিয়ে আছে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর দিকে। বাতাসের ধাক্কায় বন্ধ হয়ে গেছে জানালা। বাইরে ঝিরঝির তুষার

পড়ছেই। ওরা সবাই মিলে ধরে থাকল আর্নেস্টকে। ধস্তাধস্তি করেও নিজেকে মুক্ত করতে পারল না সে।

'আগামীকাল,' ঘরঘরে গলায় ফিসফিস করলেন বৃদ্ধা, 'আমরা ওদের কবরে যাব। কলজে বরাবর ঢুকিয়ে দেব কাঠের গোঁজ। যদিও কাজটা আরও আগেই করা উচিত ছিল।'

পরদিন সকালে হেনরীর দলাপাকানো, বিকৃত শরীরটা পাওয়া গেল প্রাচীন ওক গাছের গুঁড়ির ধারে। অপর দু'জনের লাশও বছর কয়েক আগে এখানেই পাওয়া গিয়েছিল। কেউ বা কিছু একটা ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসেছে। বরফের গায়ে লম্বা, অমসৃণ প্রায় অস্পষ্ট একটা রেখা। কোনও পায়ের ছাপ নেই, শুধু জায়গায় জায়গায় গর্ত। যেন বাতাসের ধাক্কায় বরফ সরে গিয়ে ফাঁপা গর্তের সৃষ্টি করেছে।

তবে হেনরীর গায়ে বরফ-ভ্যাম্পায়ারের চিহ্ন রয়েছে—ত্বকে ফুটে আছে কিশোরী মেয়ের আঙুলের ছাপ।

আমার রক্ত পান করো!

ডিলান বারিকদার একটি রচনা লিখেছে। রচনার সারমর্ম জানার পরে তার পাড়ার লোকজনের বদ্ধমূল ধারণা হলো ছেলেটা পাগল হয়ে গেছে। ডিলানকে পাড়ার লোকে বহুদিন ধরে সন্দেহের চোখে দেখছে। সে লোকের দিকে ফাঁকা, শূন্য, স্থির দৃষ্টিতে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে, মানুষের গা শিরশির করে ওঠে। খ্যাংড়াকাঠি শরীরের ডিলানের কণ্ঠ খসখসে, চাপা এবং ভৌতিক। অস্বাভাবিক এই কণ্ঠ শুনলে মানুষের গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়। তার গায়ের রঙ ফ্যাকাসে, মরা মানুষের মত, ঘিনঘিনে। চামড়া যেন ঝুলে রয়েছে কাঠামোর সঙ্গে। তাকে দেখলে বাচ্চারা ভয় পায়।

আর ডিলান ভয় পায় সূর্যের আলো।

এবং সে যেসব বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে তা পাড়ার লোকের কাছে স্রেফ উদ্ভট মনে হয়।

ডিলান ভ্যাম্পায়ার হতে চায়।

পাড়ার লোকে বলে ডিলানের জন্ম নাকি এক প্রবল ঝড়-বৃষ্টির রাতে। এমনই ঝড় হয়েছিল সে রাতে, বড় বড় গাছপালা শিকড়সুদ্ধ উপড়ে পড়ে গিয়েছিল রাস্তায়। লোকে বলে জন্মের সময় ডিলানের মুখে ছিল তিনটে দাঁত। সে নাকি মা-র দুধ পান করতে গিয়ে স্তন কামড়ে রক্ত বের করে ফেলেছিল!

লোকে বলে রাত নামলে ডিলান দোলনায় শুয়ে মুরগীর মত কক্ কক্ কখনও বা ক্রুদ্ধ কুকুরের মত ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করত। সে দু'মাস বয়সেই হাঁটতে শিখে যায়, আকাশে চাঁদ উঠলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত চাঁদের দিকে।

এরকম নানান কথা লোকে বলে ডিলান সম্পর্কে।

ডিলানকে নিয়ে বাবা-মা'র দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। একমাত্র সন্তান বলে ডিলানের অস্বাভাবিক আচরণগুলো তাঁদের চোখে বেশি বেশি লাগত।

ডিলান পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকত বলে বাবা-মা ভাবতেন তাঁদের ছেলে বুঝি অন্ধ। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানালেন ডিলানের চোখে কোনও সমস্যা নেই। সে যে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, এরমধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। ডিলানের মাথাটা বেশ বড়সড়। ডাক্তার মন্তব্য করলেন হয় ডিলান খুব প্রতিভাবান হবে নতুবা নির্বোধ। ডিলান বড় হয়ে নির্বোধ হিসেবে প্রমাণ করল নিজেকে।

পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত ডিলানের মুখে সামান্যতম রা-ও ফোটেনি। এক রাতে, খাবার টেবিলে বসে প্রথম যে শব্দটি সে উচ্চারণ করল তা হলো, 'মরণ!'

ছেলের মুখে বোল ফুটেছে, বাবা-মা খুশি তো হলেনই তবে যে শব্দটি ডিলান উচ্চারণ করেছে তা শুনে তাঁরা হতভম্বও হয়ে পড়লেন। শেষে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এলেন ছোট মানুষ যা-ই বলুক, নিশ্চয়ই বুঝে বলেনি।

কিন্তু ডিলান যা বলেছে সচেতনভাবে, বুঝেই বলেছে।

সে রাত থেকে ডিলান বড় বড় শব্দ উচ্চারণ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। লোকের কথা সব হজম করে নিতে লাগল ডিলান। নিজেও কিছু শব্দ তৈরি করল লোকের দৃষ্টিতে যা উদ্ভট এবং অর্থহীন। তারা বলল ডিলান আসলে সব বোঝে কিন্তু নিজেকে সেভাবে প্রকাশ করতে পারে না।

ছেলেরা যখন ফুটবল, ক্রিকেট, গোল্লাছুট খেলে ডিলান ওই সময় বারান্দায় বসে শূন্য চোখে খেলার মাঠে তাকিয়ে থাকে আর মনে মনে নানান শব্দ তৈরি করে চলে।

নয় বছর বয়সে ডিলান দু'টি অস্বাভাবিক কাণ্ড করে বসল যার জন্য তাকে নিয়ে তার বাবা-মা আরও চিন্তায় পড়ে গেলেন। ডিলান একদিন তাদের চতুর্দশী কাজের মেয়ের সুডৌল বুকজোড়া এমন জোরে টিপে

ধরল, মেয়েটি চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করল। ডিলানের কবল থেকে নিজেকে কোনমতে মুক্ত করে সে বাড়ি ছেড়ে পালাল। আরেকদিন দেখা গেল বিছানায় বসে ডিলান একটা বেড়ালের বাচ্চার গলা কাটছে ছুরি দিয়ে।

তারপর কেটে গেছে অনেকগুলো দিন। লোকে এ ঘটনা দুটো ভুলেও গেল।

তবে ডিলানকে তার শৈশব কাটাতে হলো অপছন্দের লোকজনের মাঝে।

স্কুলে ভর্তি হয়েছে ডিলান তবে বইপত্র সে ছুঁয়েও দেখে না। প্রতি ক্লাসে দুই/তিন বছর করে থাকতে হলো তাকে। ডিলান কিছু বিষয়ে রেজাল্ট ভাল করল, বাকিগুলোর ফলাফল কহতব্য নয়। সে এসব বিষয়ে লিখতে এবং পড়তে পারে ভাল।

কিন্তু অন্য বিষয়গুলোতে ডাব্বা মারে।

ডিলান তার ত্রয়োদশ জন্মদিনে স্টার সিনেপ্লেক্স-এ গেল ব্রাম স্টোকারের 'ড্রাকুলা' দেখতে।

সিনেমা দেখে বাসায় ফিরল ডিলান। সোজা ঢুকল বাথরুমে। ঝাড়া দুই ঘন্টা বাথরুম থেকে বেরুল না সে।

ওর বাবা-মা দরজায় কত ধাক্কা দিলেন, বকা দিলেন, মার দেয়ার ভয় দেখালেন কিন্তু ডিলান দরজা খুলল না।

অবশেষে বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এল ডিলান। গেল সোজা খাবার টেবিলে। তার বুড়ো আঙুলে ব্যাণ্ডেজ। চেহারায় পরিতৃপ্তির ছাপ।

পরদিন সকালে স্থানীয় লাইব্রেরিতে গেল ডিলান। শুক্রবার। লাইব্রেরি বন্ধ। কিন্তু ডিলান সারাদিন লাইব্রেরির সিঁড়িতে বসে রইল। সন্ধ্যার পরে বাসায় ফিরল।

পরদিন সে স্কুল ফাঁকি দিয়ে আবার চলে গেল লাইব্রেরিতে।

খোঁজাখুঁজি করতে একটা তাকে 'ড্রাকুলা' বইটি পেয়ে গেল ডিলান। কিন্তু লাইব্রেরির সদস্য নয় বলে বইটি ধার নিতে পারল না। লাইব্রেরির সদস্য হতে হলে বাবা অথবা মা যে কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

অত ঝামেলায় যাওয়ার সময় নেই ডিলানের। সে শার্টের নীচে, প্যান্টের ফাঁকে গুঁজে নিল 'ড্রাকুলা'। বেরিয়ে এল লাইব্রেরি থেকে। আর ওদিকে পা বাড়াল না।

লাইব্রেরি থেকে সামান্য দূরে পার্ক। পার্কের খালি একটি বেঞ্চিতে বসে বই পড়তে শুরু করল ডিলান। পড়তে পড়তে ঘনাল সাঁঝের আঁধার। এখন বাড়ি ফেরা দরকার। তবে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তার বাতির নীচে একটু পরপর দাঁড়াল ডিলান। 'ড্রাকুলা' পড়ছে। পড়ে আশ মেটে না।

রাত করে বাড়ি ফিরলেও বকা খেতে হলো না ডিলানকে। বাবা-মা আদরের পুত্রধনকে খুব কমই বকা-ঝকা করেন। ছেলে বিগড়ে যাওয়ার ভয়েই হয়তো। ডিলান খেয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে এল বইটি শেষ করার জন্য। বইটি কোথায় পেয়েছে জিজ্ঞেস করলেন মা। এক ক্লাসমেটের কাছ থেকে ধার করে এনেছে, সংক্ষিপ্ত জবাব ডিলানের।

ড্রাকুলার নেশায় বুঁদ হয়ে গেল ডিলান। বারবার পড়ছে। রাত-দিন নাক ডুবিয়ে রাখছে বইতে। স্কুল কামাই দিতে লাগল।

গভীর এক রাতে, ক্লান্ত ডিলান ঘুমিয়ে পড়েছে, ওর মা 'ড্রাকুলা' আলগোছে ওর হাত থেকে নিয়ে চলে এলেন ড্রইংরুমে। স্বামীকে দেখালেন কী বই পড়ছে তাঁদের ছেলে।

বইটি উল্টেপাল্টে দেখলেন ডেভিড বারিকদার। বইয়ের কয়েক জায়গায় কাঁপা হাতে পেন্সিল দিয়ে আণ্ডারলাইন করে রেখেছে ডিলান।

যেমন: তাজা রক্তে লাল টকটকে ওষ্ঠদ্বয়, গড়িয়ে পড়ছে মেয়েটির চিবুক বেয়ে, আলখাল্লা রঞ্জিত করে তুলছে। আবার কোথাও আণ্ডার লাইন করা: 'যখন গলগল ধারায় ফিনকি ফোঁটা রক্ত বেরুতে লাগল, সে তার হাতে তুলে নিল আমার হাত জোড়া, শক্ত করে চেপে ধরে রাখল, অপর হাতে আমার ঘাড় চেপে ধরে মুখটা টেনে নামিয়ে আনল ক্ষতস্থানে...'

ডিলানের মা আণ্ডারলাইন করা লেখাগুলো পড়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। 'এসব কী ছাইপাঁশ পড়ছে ও!' আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। পরক্ষণে ড্রাকুলার জায়গা হলো স্টোররুমের আস্তাকুঁড়ে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ডিলান যখন দেখল বইটি নিখোঁজ, ঘর ফাটিয়ে ফেলল চিৎকারের চোটে। মা'র হাত মুচড়ে ধরল সে। ব্যথায় নীল হয়ে মিসেস বারিকদার স্বীকার করতে বাধ্য হলেন তিনি ড্রাকুলাকে কোথায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

ডিলান এক ছুটে ঢুকল স্টোররুমে। ময়লা-আবর্জনা ঘেঁটে, শরীরে কালিঝুলি মাখিয়ে উদ্ধার করল সাধের ড্রাকুলা।

কোন মতে নাশতা গিলে, জামায় ডিমের কুসুমের দাগ নিয়ে ডিলান ছুটল পার্কে, বই পড়ার প্রিয় জায়গায়। ড্রাকুলার রাজ্যে আবার প্রবেশ ঘটল তার। টানা একটা মাস লোভীর মত 'ড্রাকুলা'কে গিলল ডিলান। পড়তে পড়তে প্রতিটি শব্দ, দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলনসহ মুখস্থ হয়ে গেল। তারপর একদিন বইটা ফেলে দিল ডিলান। তবে ড্রাকুলা স্থায়ী আস্তানা গেড়ে বসল তার মাথায়। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে ড্রাকুলা ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না সে।

স্কুল থেকে অনুযোগ এল ডিলান ক্লাসে সাংঘাতিক অনিয়মিত। মা খুব চেঁচামেচি করলেন। ডিলান ঠিক করল কয়েকদিন সে ক্লাস করবে।

একটা রচনা লেখার ইচ্ছে আছে ডিলানের। রচনাটি লেখার জন্যই সে স্কুলে গেল।

একদিন ক্লাসে বসে রচনাটি লেখার সুযোগ হয়ে গেল ডিলানের। ম্যাডাম ওদেরকে 'জীবনের লক্ষ্য' নিয়ে রচনা লিখতে দিলেন। সবার আগে লেখা শেষ করল ডিলান। হাত তুলে জানাল তার রচনা লেখা শেষ। ম্যাডাম অনুমতি দিলে সে লেখাটি পড়ে শোনাতে চায়।

ক্লাস টিচার তানিয়া ম্যাডাম তাঁর ক্লাসের সবচেয়ে অমনোযোগী এবং অনিয়মিত ছাত্রটির এহেন কাণ্ডে খুবই অবাক হলেন। ডিলান কোনদিন নিজে থেকে সেধে পড়া বলতে যায়নি। তানিয়া ম্যাডাম বিস্ময়টুকু গোপন করে উৎসাহ দিলেন ডিলানকে।

'ঠিক আছে, ছেলেমেয়েরা,' মৃদু হাসলেন তিনি। 'ডিলান আমাদেরকে আজ ওর রচনা পড়ে শোনাবে। তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনো।'

সিধে হলো ডিলান। উত্তেজিত। হাতে ধরা কাগজের তাড়াটা

কাঁপছে।

'আমার রচনার নাম আমার জীবনের লক্ষ্য। লেখক...'

'ক্লাসের সামনে এসে পড়ে শোনাও, ডিলান।'

ক্লাসের সামনে এসে দাঁড়াল ডিলান। তানিয়া ম্যাডাম ওকে স্নেহমিশ্রিত একটি হাসি উপহার দিলেন। আবার শুরু করল ডিলান।

'আমার রচনার নাম আমার জীবনের লক্ষ্য। লেখক ডিলান ড্রাকুলা।'

ম্যাডামের মুখ থেকে মুহূর্তে উধাও হাসি।

'যখন বড় হব তখন আমি ভ্যাম্পায়ার হতে চাই।'

তানিয়া ম্যাডামের চোখ রসগোল্লা।

'আমি অনন্তকাল বেঁচে থাকতে চাই, প্রতিশোধ নিতে চাই সবার ওপরে এবং সবগুলো মেয়েকে ভ্যাম্পায়ার বানাতে চাই। আমি মৃত্যুর গন্ধ শুঁকতে চাই।'

'ডিলান!'

'আমি চাই আমার মুখে থাকবে বিকট দুর্গন্ধ, আমার নিঃশ্বাসে ঝরে পড়বে পচা মাটি এবং কফিনের গন্ধ।'

শিউরে উঠলেন টিচার। নিজের চোখকে তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না। এ ছেলে এসব আবোল তাবোল কী বলছে? ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকালেন তিনি। তারা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে ডিলানের দিকে। ছেলেদের কেউ কেউ খিকখিক হাসছে। তবে মেয়েদের মুখে হাসি নেই।

'আমার গা থাকবে সাপের মত ঠাণ্ডা, মাংস পচা, শিরায় বইবে পচা রক্ত।'

'ব্যস...'

গলা খাঁকারি দিলেন তানিয়া ম্যাডাম।

'ব্যস, আর পড়তে হবে না, ডিলান।' বললেন তিনি।

কিন্তু ডিলান আরও জোরে পড়তে লাগল।

'আমি আমার ভয়ঙ্কর সাদা দাঁত আমার শিকারের ঘাড়ে বসাতে চাই। চাই তারা...'

'ডিলান! এক্ষুনি তোমার সীটে গিয়ে বসো!'

'আমি তাদের মাংস ফালি ফালি করে কাটব, শিরায় ঢুকিয়ে দেব দাঁত,' খ্যাপার মত পড়ে যাচ্ছে ডিলান। লাফ মেরে খাড়া হলেন মিস তানিয়া। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। এ মুহূর্তে কেউ হাসছে না।

'তারপর আমি ছেড়ে দেব কামড়, ফিনকি ফোঁটার মত গলগল করে আমার মুখে ঢুকতে থাকবে তাজা, লাল রক্ত, গলা দিয়ে নেমে যাবে পেটে এবং...'

খপ্ করে ডিলানের হাত চেপে ধরলেন তানিয়া ম্যাডাম। এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করল ও, দৌড়ে চলে গেল ক্লাসের এক কোনায়। একটা টুলের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে তারস্বরে চেঁচাল:

'রক্ত গড়িয়ে পড়বে আমার জিভ থেকে, আমার ঠোঁট থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়বে শিকারের গলায়। আমি মেয়েদের রক্ত পান করতে চাই!'

তানিয়া ছুটে গেলেন ডিলানের দিকে। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন ঘরের কোণ থেকে। ম্যাডামকে লক্ষ্য করে থাবা বাড়াল ডিলান, কিন্তু ওর দুর্বল হাত মুচড়ে ধরে থাকলেন তানিয়া। ওকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন প্রিন্সিপালের অফিসে। সমানে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল ডিলান।

'এটাই আমার জীবনের লক্ষ্য! এটাই আমার জীবনের লক্ষ্য! এটাই আমার জীবনের লক্ষ্য!'

শাস্তি হিসেবে ডিলানকে শ্রেণীকক্ষে আটকে রাখা হলো। প্রিন্সিপাল ফোন করে অফিসে ডাকিয়ে আনলেন ডিলানের বাবা-মাকে। তাঁদের গুণধর ছেলের কীর্তির কথা বললেন। উপসংহার টানলেন এই বলে, ডিলান যদি আবার ক্লাসে এরকম অস্বাভাবিক আচরণ করে তাঁরা কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবেন। কারণ ডিলান গোটা ক্লাসকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যতে সে এরকম কিছু করার চেষ্টা করলে কর্তৃপক্ষ ডিলানকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করার চিন্তা-ভাবনাও করতে পারেন।

ডেভিড বারিকদারের অনুরোধে এবং ছেলে এরকম আর কখনও

করবে না এ আশ্বাসে ডিলানকে ছেড়ে দিলেন প্রিন্সিপাল। তবে এ ঘটনা বাতাসের গতিতে চাউর হয়ে গেল ডিলানদের ফ্ল্যাটে। বেশিরভাগ বাবা-মার প্রথমে কথাটা বিশ্বাস হতে চাইল না। ভাবলেন তাঁদের ছেলে-মেয়েরা বানিয়ে বলছে। পরে ডিলানের অতীত কাণ্ডকারখানার কথা মনে পড়ে যেতে তাঁরা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন। হ্যাঁ, ডিলান যে প্রকৃতির ছেলে, তার পক্ষে এরকম পাগলামি খুবই স্বাভাবিক।

তারপর থেকে ডিলান সবার কাছে অস্পৃশ্য হয়ে উঠল। পাড়ার লোকে তার সংস্পর্শ সযত্নে এড়িয়ে চলতে লাগল। রাস্তার মোড়ে ডিলানকে দেখলেও বাবা-মা তাঁদের ছেলে-মেয়েকে নিয়ে অন্য রাস্তায় হাঁটা দেন। সবাই ডিলানকে নিয়ে ফিসফাস করে।

ডিলান সেদিন স্কুল থেকে আসার পরে বাবা-মা'র কাছে খুব বকা খেয়েছিল। এমনিতে সে বকা খেলে চেঁচিয়ে হিক্কা তুলে ফেলে। তবে সেদিন নীরবে বাবা-মা'র সমস্ত ভর্ৎসনা সহ্য করার পরে শান্ত গলায় ঘোষণা করল, সে আর কোনদিন স্কুলে যাবে না। এবং সত্যি সে আর কখনও স্কুলমুখো হলো না। বাবা-মা'র অনুরোধ, আকুতি, ধমক, চোখ রাঙানি সবকিছুই বিফলে গেল। ডিলান তার গোঁ ভাঙল না।

এভাবে কেটে গেল এক বছর।

ডিলান এখন কীসের খোঁজে যেন রাস্তাঘাট চষে বেড়ায়। নিজেও জানে না কী খুঁজছে। গলির মধ্যে ভূতের মত হাঁটে ডিলান, আবর্জনার ড্রামে উঁকি দেয়। হাঁটার সময় ডানে তাকায়, বামে দেখে, পেছন ফেরে।

কিন্তু যা খোঁজে তা পায় না ডিলান।

ডিলান এখন রাতে ঘুমায় না বললেই চলে। আর কথা বলা একদম বন্ধ করে দিয়েছে। সারাক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ফাঁকা চোখে তাকিয়ে থাকে। তার চোখে চোখ পড়লেও কাঁটা দেয় লোকের গায়ে।

তারপর একদিন...

ডিলান মিরপুর চিড়িয়াখানায় এসেছে। কাগজে পড়েছে চিড়িয়াখানায় নতুন প্রজাতির একটি ভ্যাম্পায়ার বাদুড় নিয়ে আসা হয়েছে সুদূর আমাজন অরণ্য থেকে। ডিলান সেই বাদুড় দেখতে এসেছে।

ভ্যাম্পায়ার বাদুড়টিকে দেখা মাত্র শরীরে যেন একটা ইলেকট্রিক শক খেল ডিলান।

তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, হলদে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল খুশিতে।

সেদিন থেকে ডিলানের প্রত্যহ রুটিন হলো চিড়িয়াখানায় ঢুঁ মারা। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের খাঁচার সামনে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। নির্নিমেষ নয়নে দেখে কুৎসিত প্রাণীটাকে। বাদুড়টার একটা নাম দিয়েছে সে। কাউন্ট। তার মনে হতে থাকে বাদুড়টা আসলে মানুষ। বাদুড়ের ছদ্মবেশ ধরে আছে।

ডিলান আবার লাইব্রেরিতে গেল। এবার ওয়াইল্ড লাইফের ওপর একটি বই চুরি করল।

সূচি খুঁজে ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের ওপরে লেখাটা বের করল ডিলান। পাতাগুলো ছিঁড়ে নিল বই থেকে। বইটি ফেলে দিল। তারপর লেখাটা পড়তে লাগল ও।

পড়তে পড়তে লেখাটা মুখস্থ করে ফেলল ডিলান।

জানল ভ্যাম্পায়ার বাদুড় কীভাবে রক্ত চুষে খায়, কীভাবে গরু-বাছুরের ওপর চড়াও হয়, ডানা মুড়ে নিয়ে পেছনের পায়ে ভর করে কীভাবে কালো, রোমশ মাকড়সার মত হাঁটে। জানল ভ্যাম্পায়ার ব্যাটের রক্ত ছাড়া অন্য কিছুতে রুচি নেই।

মাসের পর মাস ডিলান অসীম আগ্রহ নিয়ে দেখে গেল ভ্যাম্পায়ার বাদুড়টাকে। বাদুড়টাকে দেখলে আশ্চর্য এক সুখ অনুভব করে সে দেহ-মনে। তার বেশ কিছু স্বপ্নের একটি পূরণ হয়েছে ভ্যাম্পায়ার ব্যাট দর্শনে।

একদিন ডিলান লক্ষ করল ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের খাঁচার নীচের দিকে লোহার তারগুলো কোনও কারণে ঢিলে হয়ে আছে।

সে চারপাশে তাকাল। আশপাশে দেখা যাচ্ছে না কাউকে। আজ সকাল থেকেই টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। চিড়িয়াখানায় দর্শক সমাগম কম।

ডিলান লোহার তার ধরে টান দিল।

সামান্য বাঁকা হয়ে গেল তার।

এমন সময় একটা লোককে দেখতে পেল ডিলান। বানরের ঘরের পাশ দিয়ে আসছে। পিছিয়ে গেল ডিলান। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সদ্য তৈরি একটি গানের সুর শিস দিয়ে বাজাতে বাজাতে চলে গেল ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের খাঁচার সামনে থেকে।

পরদিন আবার চিড়িয়াখানায় গেল ডিলান। তবে ভর দুপুরে। এ সময় লোকজন খুব একটা আসে না চিড়িয়াখানায়। তক্কে তক্কে রইল ডিলান। চিড়িয়াখানার গার্ডকে কাছেপিঠে দেখতে না পেয়ে সুযোগটা কাজে লাগাল। বাদুড়ের খাঁচার লোহার তার আজ আরেকটু বাঁকা করল। ওখান থেকে চলে আসার সময় বাঁকা তার সোজা করে রাখল ডিলান যাতে কেউ বুঝতে না পারে বাদুড়ের খাঁচায় একটা ফোকর তৈরির মতলব করেছে সে।

পরদিন আবার চিড়িয়াখানায় গেল ডিলান। সুযোগ বুঝে খাঁচার লোহার তার আলগা করে ফোকরটা আরও বড় করল। ফেরার সময় তার কাউন্টের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। ফিসফিস করে বলল, চিন্তা কোরো না কাউন্ট, তোমাকে শীঘ্রি মুক্ত করে আনছি আমি। যোগ করল সে উল্টোভাবে দেয়াল বাইবার প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছে।

কাউন্টের কাছে মনের অনেক কথাই বলল ডিলান। কাউন্টকে দুশ্চিন্তা করতে মানা করল। আবারও বলল অল্প কয়েকদিনের মধ্যে মুক্ত হয়ে যাবে কাউন্ট। তারপর সে আর কাউন্ট মিলে মেয়েদের রক্ত পান করার অভিযানে নেমে পড়বে।

সেদিন সকাল থেকে ঝুপঝুপ বৃষ্টি। আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। কনকনে হাওয়া বইছে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘর ছেড়ে কেউ বেরুচ্ছে না। কিন্তু শেষ বিকেলে গায়ে জ্যাকেট চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল ডিলান। ওদের বাসা থেকে চিড়িয়াখানা বেশি দূরে নয়। পৌঁছে গেল গন্তব্যে।

ঝড়-বাদলের দিন। কাক ভেজা বৃষ্টিতে মানুষের শখ নেই চিড়িয়াখানায় আসবে। এতে সুবিধেই হলো ডিলানের। সে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে তা সফল করতে হলে মানুষজনের চোখে পড়া যাবে না। টিকেট কেটে ভেতরে ঢুকে পড়ল ডিলান। হন হন করে এগোল

ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের খাঁচার দিকে। আশপাশে কাউকে চোখে পড়ল না ওর, চলে এল খাঁচার সামনে। এতদিনের পরিশ্রমের সুফলটুকু ভোগ করল ও। খাঁচায় ঢোকার মত ফোকর তৈরি হয়ে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

খাঁচার ভেতরটা অন্ধকার।

খাঁচার ভেতরে কাঠের ছোট্ট একটা ঘর। এ ঘরেই থাকে ডিলানের কাউন্ট। ঘরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল ডিলান। কান পাতল। কাউন্টের কিচকিচে গলার আওয়াজ শুনতে চাইছে।

কাঠের ঘরের দরজাটা সাবধানে খুলে ফেলল ডিলান। তারপর হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। ফিসফিসে গলায় কথা বলছে ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের সঙ্গে।

হঠাৎ হাতে সুচের খোঁচা খেয়ে লাফিয়ে উঠল ডিলান।

চোখে মুখে খুশির আভা ফুটিয়ে হাতটা বের করে আনল ও। হাতে ভ্যাম্পায়ার ব্যাট। কুৎসিত, কদাকার প্রাণটা কিচকিচ করে উঠল। চট করে ওটাকে জ্যাকেটের ভেতরে চালান করে দিল ডিলান। তারপর দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল খাঁচা থেকে। জোর কদমে পা চালাল গেটের দিকে। অন্ধকার নেমে গেছে। কেউ লক্ষ করল না ওকে। চুরি করা ভ্যাম্পায়ার বাদুড়টাকে নিয়ে নির্বিঘ্নে চিড়িয়াখানার গেট থেকে বেরিয়ে এল ডিলান। ডানে-বামে তাকাল। জনশূন্য রাস্তা। ডিলানের বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। তার একটা কাজ আছে। কাজটা শেষ করে বাড়ি যাবে।

বড় রাস্তা ছেড়ে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল ডিলান। গলির শেষ মাথায় একটা লোহার বেড়া। বেড়ার ওপাশে ছোট একটা মাঠ। মাঠের পরেই ভাঙা একটা কুটির। ডিলান এ এলাকায় বেশ কয়েকবার চক্কর দিয়েছে। সে যে পরিকল্পনা করেছে তার বাস্তবায়নের জন্য এরকম একটা জায়গা এবং পরিবেশ দরকার ছিল। সৌভাগ্যক্রমে দুটোই পেয়ে গেছে ডিলান। ও বেড়া টপকাল। মাঠ পেরিয়ে ঢুকে পড়ল পরিত্যক্ত, ভাঙা কাঠের বাড়িটিতে।

বাড়ির ভেতরে জমাট বাঁধা আঁধার। স্যাঁতসেঁতে। সঙ্গে নিয়ে আসা

টর্চ জ্বালল ডিলান। আলোয় দেখল ধুলোয়ভরা মেঝে, কয়েকটা টিন আর কাঠের বাক্স ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ঘরের দরজায় খিল দিল ডিলান। কুটিরের একমাত্র জানালাটা বন্ধ। কাজেই বাদুড়ের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

ডিলানের বুকের ভেতরে পাগলা ঘোড়া হয়ে দাপাচ্ছে কলজে। জ্যাকেটের মধ্যে ডানা ঝাপটাচ্ছে বাদুড়। কিচকিচ শব্দ করছে। হাত ঢুকিয়ে বাদুড়টাকে জ্যাকেটের ভেতর থেকে বের করে আনল ডিলান। ছেড়ে দিল। ওটা উড়ে গিয়ে বসল জানালার গরাদে।

ডিলান জ্যাকেট খুলে ফেলল। টান মেরে ছিঁড়ে ফেলল শার্ট। ওর ঠোঁট নড়ছে। মুখে অস্বাভাবিক হাসি।

প্যান্টের পকেট থেকে চার ইঞ্চি ফলার একটা ছুরি বের করল ডিলান। মা'র রান্নাঘর থেকে চুরি করেছে।

কাঁপা হাতে ছুরিটা গলায় ঠেকাল ডিলান। পোঁচ দিল। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। মুহূর্তে লাল করে দিল গলা এবং বুক।

'কাউন্ট! কাউন্ট!' অধীর উল্লাসে চিৎকার দিল ডিলান। 'এসো! আমার রক্ত পান করো! আমার রক্ত পান করো!'

বাদুড়টাকে ধরার জন্য সামনে এগোতে গিয়ে টিনের বাক্সে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ডিলান। ভ্যাম্পায়ার বাদুড় জানালার গরাদ ছেড়ে দিল। উড়ে এল ঘরের দেয়ালে।

অসহ্য যন্ত্রণায় পানি পড়ছে ডিলানের চোখ দিয়ে।

দাঁতে দাঁত ঘষল ও। রক্ত ভিজিয়ে দিয়েছে ওর লোমশূন্য অপুষ্ট বুক। গা কাঁপছে ডিলানের। ও পাশ ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে 'আউ!' করে উঠল। টিনের বাক্সের ধারালো কোনায় কেটে গেছে পেটের কাছটা।

হাত বাড়িয়ে দিল ডিলান। দেয়ালে ঝুলছে বাদুড়। নড়াচড়ার চেষ্টা করছে না। ওটাকে দু'হাতে চেপে ধরল ডিলান। তারপর বসিয়ে দিল নিজের গলার ওপরে। ঠাণ্ডা, ভেজা মাটিতে শুয়ে পড়ল পিঠ দিয়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

হঠাৎ গোঙাতে লাগল ডিলান। হাত দিয়ে চেপে ধরল বুক। পেটটা দারুণ মুচড়ে উঠল। কালো বাদুড়টা নিঃশব্দে ওর গলার রক্ত চুষে

খাচ্ছে।

ডিলানের মনে হলো ও মারা যাচ্ছে। একে একে মনে পড়ছে ওর অতীত জীবন। বাবা-মা, স্কুল, ড্রাকুলা। স্বপ্ন...

চোখ মেলে চাইল ডিলান। ঘরটা ভীষণ দুলে উঠল চোখের সামনে।

নিঃশ্বাস নিতে পারছে না ও। দম নেয়ার জন্য মুখ হাঁ করল ডিলান। বাতাসে কীসের যেন বিকট গন্ধ। শীতল জমিনে ওর হাড্ডিসার শরীরটা একবার গড়ান খেল।

চোখের সামনে এতক্ষণ ধোঁয়া ধোঁয়া দেখছিল ডিলান।

ধোঁয়ার পর্দাটা যেন সরে গেল সামনে থেকে। এতক্ষণ কাজ করছিল না মস্তিষ্ক। হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল ব্রেন।

ওর চিন্তাভাবনাগুলো স্বচ্ছ হয়ে এল। দেখল ও একরাশ আবর্জনার মধ্যে অর্ধ-নগ্ন শরীরে শুয়ে রয়েছে। একটা মিশমিশে কালো বাদুড় ওর গলার ওপর বসে শরীরের রক্ত চুষে খাচ্ছে।

আর্তনাদ করে উঠল ডিলান। একটানে রোমশ শরীরটাকে গলার ওপর থেকে সরিয়ে আনল, ছুঁড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল ওটা, ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে, ভীষণ চেহারা নিয়ে।

ডিলান টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। পা বাড়াল দরজায়। কিন্তু আঁধারে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ও। টর্চটা মাটিতে পড়ে আছে। নিভু নিভু আলো। ব্যাটারি ফুরিয়ে এসেছে বোধহয়। গলায় হাত দিল ডিলান। রক্ত থামানোর চেষ্টা করল। কাজ হলো না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল তাজা খুন। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ভয়ানক দুর্বল হয়ে গেছে।

কোনমতে দরজা খুলল ডিলান।

অন্ধকার মাঠে পা রাখল ও, দুনিয়াটা বন্ বন্ করে ঘুরে উঠল। তাল সামলাতে না পেরে বৃষ্টি ভেজা লম্বা ঘাসের মধ্যে আছাড় খেল ডিলান।

সাহায্য চাইবার জন্য মুখ হাঁ করল ও।

কিন্তু গলা দিয়ে রা বেরুল না, শুধু ঘরঘরে একটা আওয়াজ ছাড়া।

বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পেল ডিলান।

হঠাৎ করেই থেমে গেল শব্দটা।

শক্তিশালী একজোড়া হাত ওকে মাটি থেকে সিধে হতে সাহায্য করল। ডিলান দেখল ওর সামনে ভয়ানক লম্বা, কালো একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। আঁধারে তার চোখ জোড়া জ্বলছে অঙ্গারের মত।

'আমার খোকা,' বলল লোকটা।

প্রাসাদ-আতঙ্ক

গ্রীষ্মের ছুটি ইউরোপ সফর করে কাটিয়ে দেব, সিদ্ধান্ত নিলাম। এ মহাদেশের কোন্ কোন্ দেশে ছড়িয়ে আছেন আমার পূর্বপুরুষরা, সে বংশবৃত্তান্ত খুঁজে বের করাই মূল উদ্দেশ্য। প্রথমে গেলাম আয়ারল্যাণ্ড। সেখান থেকে কিলকেনি। এ জায়গায় আমার আইরিশ পূর্বপুরুষদের নিয়ে লেখা কিংবদন্তীসম তবে প্রামাণ্য কিছু লোক-বিদ্যার সন্ধান পেয়ে গেলাম। জানলাম আমার এক পূর্ব-পুরুষ, ও ব্রেনানরা প্রাচীন অসোরি রাজ্যের ওই ডাচ-এর ভূস্বামী ছিলেন। স্টাফোর্ডের আর্ল টমাস ওয়েস্টওয়ার্থ ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় তাঁদের জমি কেড়ে নেন। জেনে খুশি লাগল লুণ্ঠনকারী আর্লকে অবশেষে টাওয়ারে জবাই করা হয়।

কিলকেনি থেকে চলে গেলাম লণ্ডনে। তারপর চেস্টারফিল্ডে, আমার মায়ের দিকের পূর্ব-পুরুষদের খোঁজে। পেয়ে গেলাম হলবর্ন, উইলকারসন, গিয়ারলেস বংশের লোকজনের সন্ধান। তবে এদের সম্পর্কে কোন রেকর্ডই সম্পূর্ণ নয়, তথ্যে রয়েছে প্রচুর ঘাটতি। শেষে আরও উত্তরে যাব ঠিক করলাম। ওদিকে চিলটন প্রাসাদে থাকেন রবার্ট চিলটন-পেন, দ্বাদশ আর্ল অভ চিলটন। চিলটন-পেনদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক অনেকটা লতায় পাতায় জড়ানোর মত। তবে প্রাসাদটি দেখার খুব লোভ হচ্ছিল।

শেষ বিকেলে পৌঁছে গেলাম প্রাসাদের কাছে ছোট্ট গ্রাম ওয়েক্সওয়ান্ডে। গাঁয়ের একমাত্র সরাইখানা ইন্ অভ দ্য রেড গুজ-এ একটি কামরা ভাড়া করলাম। ব্যাগট্যাগ খুলে, জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে নীচে নেমে এলাম ডিনার খেতে। সাধারণ খাবার–রুটি, পনির

আর এল্।

খেতে খেতে ঝপ্ করে নেমে এল আঁধার, সঙ্গে বয়ে নিয়ে এল বাতাস এবং বৃষ্টি।

সন্ধ্যাটা সরাইখানাতেই কাটিয়ে দেব ঠিক করলাম। মদের কোন অভাব নেই তা ছাড়া আমার কোথাও যাবারও তাড়া নেই।

দু'একটা প্রয়োজনীয় চিঠি লেখার কাজ শেষ করে নেমে এলাম নীচে। এক পাইন্ট এল্-এর অর্ডার দিলাম। এ ঘরে আমি আর বারটেণ্ডার ছাড়া অন্য কেউ নেই। মোটকু বারটেণ্ডারকে প্রথম থেকেই দেখছি ঘুমে ঢুলছে, আমার সঙ্গে কথা-টথা বলতেও তেমন আগ্রহী মনে হলো না। আমি বসে বসে চিলটন প্রাসাদ সম্পর্কে শোনা এবং পড়া নানান ভুতুড়ে এবং রোমহর্ষক ঘটনার কথা মনে করতে লাগলাম।

কত যে অদ্ভুত কিংবদন্তী ছড়িয়ে রয়েছে এ প্রাসাদকে ঘিরে! আসল ঘটনা হয়তো অতিরঞ্জিত হয়ে উঠেছে কালের বিবর্তনে। তবে গল্পের মূল বিষয় প্রাসাদের একটি গোপন কামরা নিয়ে। বলা হয় এ কামরায় এমন ভয়ানক এক ঘটনা ঘটেছে যা চিলটন-পেনরা বাইরের পৃথিবী থেকে আড়াল করে রাখতে বাধ্য হয়েছেন।

শুধু তিনজন মানুষের ওই ঘরে প্রবেশাধিকার রয়েছে: বর্তমান আর্ল অভ চিলটন, আর্লের পুরুষ ওয়ারিশ এবং আর্লের নিযুক্ত একজন কর্মচারী। এ লোকটি চিলটন প্রাসাদের কুঠিয়াল বা কেয়ারটেকার। দারোয়ানও বলা চলে। ওই ঘরে এক প্রজন্মে শুধু একবারই ঢোকার অনুমতি মেলে; পুরুষ উত্তরাধিকার প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার তিন দিনের মাথায় ওই গোপন কামরায় প্রবেশ করতে পারেন। তাঁর সঙ্গী হন আর্ল এবং কুঠিয়াল। তারপর বন্ধ করে দেয়া হয় ঘর, উত্তরাধিকার তাঁর নিজের ছেলেকে ভীতিকর কক্ষটিতে প্রবেশের অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত ওই ঘরের দরজা খোলা হয় না।

কিংবদন্তী অনুসারে, গোপন কামরায় প্রবেশের পরে ওয়ারিশকে আর আগের চেহারা এবং প্রকৃতিতে দেখা যায় না। তিনি হয়ে ওঠেন গম্ভীর, নিশ্চুপ, শংকিতও। চিলটনদের এক আর্ল ওই ঘরে ঢোকার

পরে পুরো উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি প্রাসাদ-শৃঙ্গ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন।

গোপন কামরায় আসলে কী ঘটেছিল তা নিয়ে নানান গল্প কথা চালু রয়েছে। কেউ বলে, গোয়ার বংশের লোক শত্রুর তাড়া খেয়ে ওই ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। চিলটন-পেন এবং গোয়ারদের মধ্যে তীব্র শত্রুতা থাকলেও গোয়াররা চিলটন প্রাসাদে আশ্রয় চাইলে আর্ল তাদেরকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেন, ঢুকিয়ে দেন গোপন কক্ষে। প্রতিশ্রুতি ছিল শত্রুপক্ষ গোয়ারদের টিকিটিরও খোঁজ পাবে না। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন আর্ল; হত্যা পরিকল্পনা সফল করতে ব্যর্থ হয়ে গোয়ারদের শত্রুরা প্রাসাদ থেকে ফিরে যায়। আর আর্ল ইচ্ছে করেই বিস্মৃত হন গোয়ারদের কথা। বন্ধ ঘরে আটকে পড়া গোয়াররা না খেতে পেয়ে মারা যায়। ত্রিশ বছর পরে আর্লের ছেলে তালা ভেঙে ঘর খোলেন। ভয়ংকর একটি দৃশ্য দেখতে পান তিনি। অনাহারে মারা যাওয়া গোয়ারদের কংকাল পড়ে আছে মেঝেতে। দেখে অনুমান করা কঠিন ছিল না যে খিদের জ্বালায় গোয়াররা এক সময় একে অন্যকে হত্যা করে নর মাংস ভক্ষণ করেছে।

আরেক কিংবদন্তী বলে, গোপন কক্ষটি মধ্যযুগের আর্লরা টর্চার চেম্বার হিসেবে ব্যবহার করতেন। ওই ঘরে নাকি টর্চার করার ভয়ংকর দর্শন যন্ত্রপাতি এখনও শোভা পাচ্ছে, প্রচণ্ড যন্ত্রণা সয়ে মরে যাওয়া মানুষের কংকালও নাকি আছে ঘরটিতে।

তৃতীয় গল্পটি চিলটন-পেনদের এক নারী পূর্ব-পুরুষকে নিয়ে। তাঁর নাম লেডি সুসান গ্ল্যানভিল। তিনি নাকি শয়তানের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলেন। তাঁকে ডাইনি হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। পুড়িয়ে মারা হত ভদ্রমহিলাকে। তবে তিনি পালিয়ে যান। লেডি গ্ল্যানভিল কীভাবে মারা গেছেন জানে না কেউ, তবে কারও কারও ধারণা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে প্রাসাদের গোপন কামরার একটি সম্পর্ক রয়েছে।

গা ছমছমে এসব কিংবদন্তীর কাহিনি নিয়ে ভাবছি, ওদিকে ঝড়ের গতি বেড়ে চলেছে। সরাইখানার কাচের জানালায় ঝমঝম শব্দে পড়ছে বৃষ্টি, দূর থেকে ভেসে আসছে বজ্রপাতের আওয়াজ।

বৃষ্টি বিধৌত জানালার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিলাম আমি। কাঁধটা একবার ঝাঁকিয়ে আরেক পাইন্ট এল্-এর অর্ডার দিলাম।

মদের গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়াতে যাচ্ছি, দড়াম করে খুলে গেল সরাইর দরজা। দমকা হাওয়ার সঙ্গে অনুপ্রবেশ করল বৃষ্টির ছাঁট। বন্ধ হয়ে গেল কপাট। লম্বা একজন মানুষ, ভেজা গ্রেটকোট পরনে, কদম বাড়াল বার-এর দিকে। গ্রেটকোটের কলার তুলে কান ঢেকে রেখেছে সে। মাথা থেকে টুপি খুলে রেখে ব্রাণ্ডির অর্ডার দিল আগন্তুক।

করার কিছু নেই তাই লোকটাকে লক্ষ করতে লাগলাম। তার বয়স সত্তরের কোঠায়, ধূসর কেশ, চেহারা দেখে মনে হয় অনেক পোড় খাওয়া, শক্ত মানুষ। কপাল কুঁচকে রেখেছে যেন গভীর কোন চিন্তায় ডুবে গেছে, যদিও শীতল, নীল চোখে মাঝে মাঝেই তীব্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে আমার দিকে।

লোকটাকে অভিজাত বংশীয় পর্যায়ে ফেলা যাবে না। স্থানীয় কৃষক হতে পারে যদিও চেহারা দেখে তেমন মনে হচ্ছে না। অবয়ব থেকে অদৃশ্য কর্তৃত্বের একটা ভাব যেন ফুটে বেরুচ্ছে। সাধারণ জামা-কাপড় পরনে তবে কাট-ছাঁটে রয়েছে আভিজাত্যের ছোঁয়া। বোঝা যায় গাঁয়ের দর্জির বানানো কাপড় নয়।

তুচ্ছ একটি ঘটনা আমাদের আলাপচারিতার সুযোগ করে দিল। বিকট আওয়াজে বাজ পড়ার শব্দে জানালার দিকে ফিরে তাকিয়েছে লোকটা, হাতের ধাক্কায় ভেজা ক্যাপটা পড়ে গেল মাটিতে। আমি মেঝে থেকে ওটা তুলে নিয়ে তার হাতে দিলাম। বৃদ্ধ ধন্যবাদ জানাল আমাকে। আমরা আবহাওয়া নিয়ে দু'একটি মন্তব্য করলাম।

লোকটাকে দেখে ঠিক মিশুক প্রকৃতির না লাগলেও মনে হচ্ছিল সে কোন গুরুতর সমস্যার মাঝ দিয়ে যাচ্ছে এবং কারও সঙ্গে কথা বলতে পারলে তার ভাল লাগবে। আমার অনুমান সত্যি না-ও হতে পারে তবু আমি বকবক শুরু করে দিলাম। বললাম আমার সফরের কথা, জানালাম আমার পূর্ব-পুরুষদের বংশলতিকার সন্ধানে চষে বেড়িয়েছি কিলকেনি, লণ্ডন এবং চেস্টারফিল্ড। অবশেষে জানালাম

চিলটন-পেনদের সঙ্গে আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয়তার কথা এবং চিলটন প্রাসাদ দেখার অভিলাষও বাদ দিলাম না।

হঠাৎ লক্ষ করলাম লোকটা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কেমন তীক্ষ্নতা চাউনিতে। অদ্ভুত একটা নীরবতা নেমে এল ঘরে। খুক খুক কাশলাম আমি, অস্বস্তিতে পড়ে গেছি লোকটা অমনভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে বলে।

অবশেষে যেন আমার বিব্রতকর অবস্থা সম্পর্কে সে সচেতন হয়ে উঠল।

'আপনার দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকা আমার উচিত হয়নি,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল বৃদ্ধ। 'কিন্তু আপনি যা বলছিলেন...' ইতস্তত গলা তার। 'ওই টেবিলে বসে একটু কথা বলি?' ঘরের কিনারে, আধো ছায়া ঢাকা ছোট একটি টেবিলে ইঙ্গিত করল সে।

আমি আপত্তি করলাম না। ব্যাপারটা রহস্যময় লাগছে আমার কাছে, সে সঙ্গে যথেষ্ট কৌতূহলও বোধ করছি। আমরা যে যার মদের গ্লাস নিয়ে নির্জন টেবিলটি দখল করলাম।

কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইল লোকটা, যেন বুঝতে পারছে না কীভাবে শুরু করবে। অবশেষে নিজের পরিচয় দিল উইলিয়াম কাউয়াথ বলে। আমি নিজের নাম বললাম। এক চুমুক ব্রাণ্ডি গিলল বৃদ্ধ, তারপর সরাসরি আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমি চিলটন প্রাসাদের কুঠিয়াল।'

আমি বিস্ময় এবং আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখলাম। 'কী আশ্চর্য! চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'আমি এতক্ষণ চিলটন প্রাসাদ নিয়েই ভাবছিলাম। আপনি যেহেতু প্রাসাদটির দায়িত্বে আছেন, আশা করি একবার প্রাসাদ ঘুরিয়ে দেখাতে পারবেন?'

আমার কথা যেন শুনতে পায়নি, অন্যমনস্ক গলায় জবাব দিল, 'হুঁ, পারব।'

লোকটার অনুৎসাহ লক্ষ করে আমি খানিকটা দমে গেলাম। চুপ করে রইলাম।

গভীর একটা দম নিল উইলিয়াম কাউয়াথ। তারপর ঝড়ের বেগে

বলতে শুরু করল, 'দ্বাদশ আর্ল অভ চিলটন রবার্ট চিলটন-পেন মারা গেছেন। হপ্তাখানেক আগে পারিবারিক ভল্টে তাঁকে কবর দেয়া হয়েছে। তাঁর তরুণ উত্তরাধিকার ফ্রেডারিক এখন ত্রয়োদশ আর্ল হয়েছেন। তিনদিন আগে বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে তাঁর। আজ তাঁর গোপন কক্ষে প্রবেশের দিন।'

হাঁ করে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। তারপর শব্দ হাতড়ে বললাম, 'কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন–আপনি এখানে আসার খানিক আগেই আমি গোপন কক্ষ নিয়ে রটনা হওয়া নানান গল্প নিয়ে ভাবছিলাম।'

ঠাণ্ডা চোখজোড়া আবার স্থির হলো আমার চোখে। 'ওটা রটনা কিংবা গল্প নয়–সত্য ঘটনা।'

ভয় এবং উত্তেজনার একটা স্রোত বয়ে গেল শরীরে। 'আপনি আজ রাতে সত্যি ওখানে যাচ্ছেন?'

মাথা দোলাল সে। 'হ্যাঁ। আমি, তরুণ আর্ল এবং আরও একজন।'

আমি নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে। 'আর্ল বেঁচে থাকলে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে নিজেই আমাদেরকে সঙ্গ দিতেন। সেটাই প্রথা। মৃত্যুর ক'দিন আগে তিনি আমাকে হুকুম করেছিলেন তরুণ আর্ল এবং আমার সঙ্গে যেন আরেকজন মানুষ থাকেন। আর সেই মানুষটিকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে–এবং বংশের কেউ।'

আমি মস্ত একটা চুমুক দিলাম মদের গ্লাসে, কিছু বললাম না।

বলে চলল বুড়ো, 'তরুণ এই আর্ল ছাড়া প্রাসাদে আর কেউ নেই যে আমাদের সঙ্গী হতে পারে। শুধু আছেন আর্লের প্রৌঢ়া মা লেডি বিয়েট্রিস চিলটন এবং এক অসুস্থ খালা। কিন্তু ওঁদেরকে তো আর নিয়ে যাওয়া যাবে না।'

'আর্ল কাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছিলেন?' সাবধানে জানতে চাইলাম।

কপালে ভাঁজ পড়ল কুঠিয়ালের। 'এ দেশে আর্লের দূর সম্পর্কের কয়েকজন পুরুষ কাজিন আছেন। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এঁদের কেউ উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু তাঁদের কেউ আসেননি।'

'খুবই দুর্ভাগ্যজনক!' বললাম আমি।

'হুঁ, খুবই দুর্ভাগ্যজনক।' সায় দিল বুড়ো। 'তাই আপনাকেই অনুরোধ করছি—আর্লের বংশের একজন হিসেবে আজ রাতে আমার এবং তরুণ আর্লের সঙ্গে গোপন কামরায় চলুন যাই!'

বিষম খেলাম। জানালার কাচ আলোকিত হয়ে উঠল বিদ্যুতের ঝলকে, বাইরে পাথুরে চত্বরে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ ভেসে এল কানে। আমার পেটের ভেতরে বরফ ঠাণ্ডা পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল কেউ। সুড়সুড়িটা বন্ধ হলে ফিরে পেলাম কথা বলার শক্তি।

'কিন্তু আমি...এটা...আমার সম্পর্কটা তো খুবই দূরের। রক্তের সম্পর্ক নেই বললেই চলে।' কাঁধ ঝাঁকাল কুঠিয়াল। 'কিন্তু পদবী তো একই। সামান্য হলেও পেন বংশের রক্ত বইছে আপনার ধমনীতে। বর্তমান জরুরী পরিস্থিতিতে এর বেশি কিছু দরকার নেই। আমি নিশ্চিত বৃদ্ধ আর্ল বেঁচে থাকলে আমার সঙ্গে অমত করতেন না। আপনি আসছেন তো?'

ওই শীতল নীলচোখের আগ্রহ এবং চাপ এড়ানো সত্যি খুব কঠিন। যেন আমার অন্তরাত্মাও টের পাচ্ছে, কোনও অজুহাত তার কাছে খাটবে না।

অবশেষে, অনিবার্যতা এড়াতে না পেরেই যেন কুঠিয়ালের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম আমি। মনে হচ্ছিল এ সাক্ষাৎ ঘটা যেন ছিল অবশ্যম্ভাবী, চিলটন প্রাসাদের গোপন কক্ষ দর্শন যেন আমার নিয়তিতেই লেখা ছিল।

মদ পান শেষ করে আমি নিজের ঘরে চলে এলাম গায়ে বর্ষাতি চাপাতে। প্রস্তুত হয়ে নীচে নেমে দেখি স্থূলকায় বারটেণ্ডার টুলে বসে নাক ডাকাতে লেগেছে। ঘনঘন বজ্রপাতের কানফাটানো শব্দ তার নিদ্রায় বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটাতে পারছে না। লোকটার প্রতি ঈর্ষা জাগল আমার। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম উইলিয়াম কাউয়াথের সঙ্গে।

বাইরে এসে আমার গাইড জানাল পায়ে হেঁটে যেতে হবে

প্রাসাদে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। হুংকার ছাড়ছে বাতাস, সেই সঙ্গে গুড়ুম গুড়ুম বজ্রের শব্দে কথা বলা প্রায় দুঃসাধ্য। কুঠিয়াল লম্বা লম্বা কদম ফেলে হাঁটা দিল। যেন এ রাস্তার প্রতিটি ইঞ্চি তার চেনা। আমি চললাম তার পেছন পেছন।

গাঁয়ের রাস্তা ধরে খানিকটা এগোনোর পরে একটা মোড় ঘুরলাম, ওটা সরু হতে হতে ক্রমে একটা ফুটপাথে মোড় নিল। বৃষ্টির পানিতে ভয়ানক পিচ্ছিল।

রাস্তাটি হঠাৎ ওপরের দিকে খাড়া হয়ে গেছে, পা ফেলতে হচ্ছে অত্যন্ত সাবধানে। তবে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকের আলোয় খানাখন্দগুলো দেখে হাঁটতে পারছি।

যদিও কয়েক মিনিট কিন্তু আমার মনে হলো এক ঘণ্টা ধরে হাঁটছি। অবশেষে দাঁড়িয়ে পড়ল কুঠিয়াল।

সমতল, পাথুরে একটা মালভূমির পাশে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা একটি কাঠামো আঙুল তুলে দেখাল বৃদ্ধ। 'চিলটন প্রাসাদ।'

অন্ধকারে প্রথমে কিছুই ঠাহর হলো না চোখে। তারপর ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ।

উঁচু বুরুজের, সময়ের বিবর্তনে ক্ষয়ে যাওয়া দেয়ালের পেছনে এক ঝলক দেখতে পেলাম নরম্যান আর্মলের চৌকোনা প্রকাণ্ড প্রাসাদটিকে। চারটে আয়তাকার টাওয়ার বা গম্বুজ, তাতে সরু জানালা, শয়তানের লম্বালম্বি চেরা চোখের মত লাগল। বিশালাকার পাইল ঢেকে রেখেছে আইভি লতার ঝাড়, সবুজ নয়, কালচে দেখাল রঙটা।

'এ তো অনেক পুরানো প্রাসাদ!' মন্তব্য করলাম আমি। মাথা দোলাল উইলিয়াম কাউয়াথ। '১১২২ খ্রিস্টাব্দে হেনরী ডি মনটার্গিস প্রাসাদ নির্মাণ করেন।' আর কিছু না বলে সে প্রাসাদের উদ্দেশে কদম বাড়াল।

প্রাসাদের দেয়াল অভিমুখে এগিয়েছি, বেড়ে গেল ঝড়-বাদল। সুচের মত তীক্ষ্ণ বৃষ্টির ফোঁটার আঘাতে আর বাতাসের প্রবল হুংকারে কথা বলা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। আমরা মাথা নিচু করে, বাতাস

আর বৃষ্টির সঙ্গে যুঝতে যুঝতে এগিয়ে চললাম।

অবশেষে চলে এলাম দেয়ালের সামনে। এর উচ্চতা এবং পুরুত্ব বিস্মিত করে তুলল আমাকে। এরকম দেয়াল তোলার উদ্দেশ্য একটাই হতে পারে–শত্রুর হামলা থেকে প্রাসাদ রক্ষা।

কাঠের প্রকাণ্ড একটি ঝুলন্ত সেতু পার হওয়ার সময় নীচের কালিগোলা অন্ধকার পরিখায় উঁকি দিলাম। পরিখায় পানি আছে কিনা বোঝা গেল না। একটি নিচু, ধনুকের মত বাঁকা তোরণ পার হয়ে ঢুকে পড়লাম নুড়ি বিছানো উঠনে। উঠনে কেউ নেই।

নুড়ি বিছানো পথ দ্রুত মাড়িয়ে কুঠিয়াল আমাকে নিয়ে আরেকটি ধনুকাকৃতির তোরণে ঢুকল। দেয়ালের মধ্যে তোরণটি। ভেতরে আরেকটি উঠন দেখতে পেলাম। আগেরটির চেয়ে ছোট। উঠনের পরে আইভি লতায় জড়ানো প্রাসাদের মূল স্তম্ভ।

অন্ধকার, পাথুরে একটি প্যাসেজ ধরে আমাকে নিয়ে চলল বুড়ো। থেমে দাঁড়াল ভারী একটি দরজার সামনে। শতাব্দী প্রাচীন ওক কাঠের দরজায় লোহার গজাল বসানো। কুঠিয়াল টান মেরে খুলে ফেলল দরজা। সামনে প্রাসাদের বিরাট হলঘর।

হলঘরের সমান দৈর্ঘ্যের চারটে লম্বা টেবিল এবং বেঞ্চি ঘরটাকে প্রায় দখল করে রেখেছে। দেয়ালে মশাল রাখার ধাতব ব্র্যাকেট। দেয়াল জুড়ে ঝুলছে লোহার বর্ম, ঢাল, বর্শা, ব্যানার ইত্যাদি।

উইলিয়াম কাউয়াথ একটা হাত নেড়ে বলল, 'চিলটন প্রাসাদের প্রভুরা তরবারির ওপর নির্ভর করে বহু শতক ধরে রাজ্য শাসন করেছেন।'

প্রকাণ্ড হলঘর ধরে হাঁটা দিল সে, ঢুকল স্বল্পালোকিত আরেকটি প্যাসেজে। আমি নীরবে অনুসরণ করলাম তাকে।

পাশাপাশি হাঁটছি, অনুচ্চ গলায় কুঠিয়াল বলল, 'তরুণ উত্তরাধিকার ফ্রেডরিকের শরীর বিশেষ ভাল নেই। বাবার মৃত্যুতে তিনি সাংঘাতিক শক্ পেয়েছেন–আজ রাতের কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে ভয় পাচ্ছেন। যদিও জানেন তাঁকে যেতেই হবে।'

ধাতব কারুকাজ করা একটি কাঠের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল বুড়ো, আমার দিকে রহস্যময় দৃষ্টিতে একবার তাকাল, তারপর নক্ করল দরজায়।

ভেতর থেকে সাড়া দিল একজন। জানতে চাইল কে। নিজের পরিচয় বলল কুঠিয়াল। শুনতে পেলাম ভারী একটি হুড়কো টেনে খুলে ফেলা হলো। মেলে গেল দরজা।

চিলটন-পেনরা তাঁদের সময়ে বীর্যবান বীরযোদ্ধা হিসেবে নাম কামালেও, বীর রক্তের ছিটেফোঁটারও চিহ্ন নেই আমার সামনে দাঁড়ানো মানুষটির মধ্যে, যার পরিচয় ত্রয়োদশ আর্ল এবং তরুণ উত্তরাধিকার ফ্রেডরিক হিসেবে। এ অতিশয় কৃশ, ফ্যাকাসে চামড়ার এক তরুণ। কালো, কোটরাগত চোখ জোড়ায় ফুটে আছে ভয় এবং শংকা। তার পরনের পোশাক যাত্রা পালার রাজা-বাদশাদের মত। গাঢ় সবুজ ভেলভেটের কোট এবং ট্রাউজার্স, সবুজ স্যাটিনের ওয়েস্টব্যাণ্ড, ঘাড়ে এবং কব্জিতে সাদা লেস লাগানো।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে যেন আমাদেরকে ভেতরে ঢোকার ইশারা করল। বন্ধ করল দরজা। ছোট ঘরটির দেয়ালের পুরোটা জুড়ে শোভা পাচ্ছে টাপেস্ট্রি। যার বিষয়বস্তু শিকার অথবা মধ্যযুগের যুদ্ধের দৃশ্য। জানালা থেকে ঢুকে পড়া দমকা বাতাসের ধাক্কায় ছবিগুলো বারবার দুলে উঠছে, যেন ফিরে পেয়েছে জীবন। ঘরের এক কোণে একটি অ্যান্টিক সামিয়ানার বিছানা, আরেক কোণে বড় একটি লেখার টেবিল, পাথরের একটি ল্যাম্পসহ।

আমার পরিচয় দিল কুঠিয়াল, ব্যাখ্যা করল আমাকে কেন সঙ্গে নিয়ে এসেছে। তারপর জানতে চাইল তার প্রভু গোপন কক্ষে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত কিনা।

এ কথা শোনা মাত্র ফ্রেডরিকের বিবর্ণ, ফ্যাকাসে মুখখানা সম্পূর্ণ রক্তশূন্য হয়ে গেল। তবু সে মাথা দুলিয়ে সায় দিল। পা বাড়াল প্যাসেজে।

দলে সবার আগে থাকল উইলিয়াম কাউয়াথ, তার পেছনে তরুণ আর্ল, সবার শেষে আমি।

প্যাসেজের শেষ মাথায় এসে কুঠিয়াল মাকড়সার জালে ভরা একটি ঘরের দরজা খুলল। এটি একটি স্টোর রুম। এখান থেকে সে মোমবাতি, বাটালি, একটি ধারাল গাঁইতি এবং লম্বা হাতলঅলা একটি ভারী হাতুড়ি নিল। জিনিসগুলো একটি চামড়ার ব্যাগে ঢুকিয়ে ব্যাগটি এক কাঁধে ফেলল বুড়ো। তারপর ঘরের দেরাজ থেকে তুলে নিল একটি মশাল। জ্বালল। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল ঘর। সন্তুষ্ট কুঠিয়াল বন্ধ করে দিল ঘরের দরজা। ইশারা করল তার পেছন পেছন যেতে।

একটু পরে পাথরের ঘোরানো একটি সিঁড়ির কাছে চলে এলাম আমরা। মাথার ওপর মশাল উঁচু করে ধরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল কুঠিয়াল। আমরা নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলাম।

কমপক্ষে পঞ্চাশটি লম্বা সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে লাগলাম নীচে। যত নীচে নামছি, ততই ভেজা এবং ঠাণ্ডা লাগছে সিঁড়িগুলো। বাতাস ক্রমে শীতলতর হয়ে উঠছে। কেমন নোনা ধরা, স্যাঁতসেঁতে বাতাস।

সিঁড়ি যেখানে শেষ সেখান থেকে শুরু হয়েছে একটি গুহা। পিচকালো অন্ধকারে ঢাকা। এবং নির্জন।

মশাল তুলল কুঠিয়াল। 'চিলটন প্রাসাদ নরম্যান আদলে গড়ে তোলা হলেও ধারণা করা হয় স্যাক্সন ধ্বংসাবশেষের ওপর এ প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছে। এখানকার প্যাসেজওয়েগুলোর নির্মাতা নাকি স্যাক্সনরা।'

গুহার অন্ধকারে একবার উঁকি দিল কুঠিয়াল। কেমন ইতস্তত ভাব। কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে। তারপর আমাদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে প্যাসেজ ধরে এগোল।

আমি তরুণ আর্লের পেছন পেছন হাঁটছি। কাঁপছে গা। বরফ শীতল বাতাস হাড়মজ্জা যেন ফুটো করে দিচ্ছে। পায়ের নীচের পাথর ঘিনঘিনে কী একটা পদার্থ মেখে পিচ্ছিল হয়ে আছে। স্বল্প আলোয় বোঝা যাচ্ছে না।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কুঠিয়াল। কান খাড়া করে

আবার কিছু শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু চারদিক সুনসান, নীরব। কোনও শব্দ নেই। আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

প্যাসেজের শেষ মাথায় আবার এক সার সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে। আমরা পনেরোটির মত সিঁড়ির ধাপ নেমে আরেকটি গুহায় প্রবেশ করলাম। এ গুহাটি প্রাসাদের মত নিরেট পাথর কেটে তৈরি। দেয়ালে লেগে আছে পটাশিয়াম ও সোডিয়াম নাইট্রেটের সাদা সাদা গুঁড়ো। হিম শীতল বাতাসে কেমন বোটকা একটা গন্ধ। দুর্গন্ধটা কীসের ঠিক বুঝতে পারলাম না।

অবশেষে যাত্রা বিরতি দিল কুঠিয়াল, মশাল রেখে কাঁধ থেকে নামাল চামড়ার ব্যাগ।

আমরা পাথরের একটি দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। দেয়ালটা নোনা ধরা এবং সোরার দাগ থাকলেও দেখে মনে হলো এটি খুব বেশিদিন হয়নি তৈরি করা হয়েছে। আমাদেরকে এক নজর দেখে নিয়ে উইলিয়াম কাউয়াথ আমার হাতে ধরিয়ে দিল মশাল। 'এটা একটু ধরুন। আমার কাছে মোমবাতি আছে, তবে...'

কথা অসমাপ্ত রেখে সে ব্যাগ থেকে গাঁইতি বের করে দেয়াল খুঁড়তে লাগল। শক্ত পাথরের দেয়াল হলেও সে দ্রুত গর্ত করে ফেলল ওতে। তারপর হাতুড়ির বাড়িতে বড় করে চলল গর্ত। আমি মশালটা ওকে ধরতে বলে ওর কাজে হাত লাগাতে চাইলাম। কিন্তু মাথা নেড়ে নিজের কাজ করে চলল কুঠিয়াল।

এতক্ষণ ধরে তরুণ আর্ল একটি কথাও বলেনি। তার কাগজের মত সাদা, ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মায়াই লাগল।

হাতুড়ির কাজ শেষ হওয়ার পরে নীরবতা নেমে এল প্যাসেজে। দুই ফুটের মত গর্ত হয়ে গেছে দেওয়ালে। একজন মানুষ ওই ফুটো দিয়ে দিব্যি গলে যেতে পারবে।

উইলিয়াম কাউয়াথ ঝুঁকে গর্তটা পরীক্ষা করল। ঝাড়া এক মিনিট নীরবে তাকিয়ে রইল দেয়ালের ওপাশের অন্ধকারে। শেষে ফের ব্যাগ তুলে নিল কাঁধে, আমার হাত থেকে মশাল নিয়ে দেয়ালের গর্তে উবু হয়ে ঢুকে পড়ল। আমরাও ওর পিছু নিলাম।

দেয়ালের ওপাশের ঘরে ঢুকতেই সেই বোটকা গন্ধটা তীব্র হয়ে ঝাপটা দিল নাকে। নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল। বমি এসে গেল।

কাশতে কাশতে কুঠিয়াল বলল, 'দু'এক মিনিটের মধ্যেই গন্ধ কমে যাবে। গর্তের সামনে চলে আসুন।'

দেয়ালের গর্তের সামনে এসে দাঁড়ালাম। গন্ধটার তীব্রতা কিছুমাত্র না কমলেও অন্তত বুক ভরে শ্বাস নেয়া যাচ্ছিল।

উইলিয়াম কাউয়াথ মাথার ওপরে তুলে ধরল মশাল। আমি ভয়ে ভয়ে তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিলাম অন্ধকারে।

কোন কিছুর সাড়াশব্দ নেই। প্রথমে চোখে কিছু ঠাহরও হলো না, শুধু সোরা মাখানো দেয়াল আর ভেজা পাথুরে মেঝে ছাড়া। হঠাৎ, ঘরের দূরপ্রান্তে, মশালের আলো যেখানে সামান্যই পৌঁছেছে, সেই আবছা আলোয় দুটো ছোট, টকটকে লাল বিন্দু দেখতে পেলাম। বিন্দু জোড়া দিয়ে যেন আগুন ঝরছিল। মনকে বোঝাতে চাইলাম ও দুটো একজোড়া লাল পাথর, দুটো রুবি, মশালের আলোয় জ্বলজ্বল করছে।

কিন্তু পরের মুহূর্তে বুঝে ফেললাম—অনুভব করতে পারলাম ওগুলো আসলে কী। দুটো রক্তিম লাল চোখ, অঙ্গারের মত জ্বলছে, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে দেখছে আমাদেরকে।

কুঠিয়াল মৃদু গলায় বলল, 'এখানে দাঁড়ান।'

ঘরের কিনারে পা বাড়াল সে, মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ল, মশালটা উঁচু করে ধরল। এক মুহূর্ত নীরব রইল সে, তারপর ভয়ার্ত শিসের মত একটা শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।

আবার যখন কথা বলল কুঠিয়াল, বদলে গেছে কণ্ঠস্বর। সাপের মত হিসহিস করে উঠল, 'সামনে বাড়ুন।' অদ্ভুত, ফাঁপা শোনাল তার গলা।

ফ্রেডরিকের পেছন পেছন এগোলাম আমি। দাঁড়ালাম কুঠিয়ালের দুই পাশে।

দূর প্রান্তে, পাথরের বেঞ্চে যে জিনিসটা হামাগুড়ি দিয়ে বসে

আছে, ওটাকে দেখে মনে হলো এখুনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলব। আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে এল। শরীরে রক্ত চলাচল যেন থেমে গেল। মাথাটা ঘুরে উঠল বন্‌ন্‌ করে। আমি বোধহয় চিৎকার দিয়েও উঠেছিলাম। কিন্তু রা বেরোয়নি গলা দিয়ে।

পাথরের বেঞ্চিতে যে জিনিসটা বসে আছে ওটা যেন নরক থেকে উঠে এসেছে। অশুভ, ভয়ঙ্কর লাল চোখ দুটো প্রমাণ করে ওটা জ্যান্ত, কিন্তু প্রাণীটা বন্দি হয়ে আছে কুচকুচে কালো, কুঁকড়ে যাওয়া, প্রায় মমির মত জরজরে একটা শরীরের মধ্যে। বিকৃত একটা লাশের মত শরীর। শব-কাঠামোটার গায়ে পচা, নোঙরা ছেঁড়া কম্বল জড়ানো। বীভৎস ধূসর-সাদা খুলিতে আটকে আছে অল্প কিছু সাদা চুল। শীর্ণ চামড়ার বিকট মুখে লালচে আঠালো কী যেন লেগে রয়েছে।

ওই ভয়ংকর জিনিসটার মধ্যে এমন ভয়াবহ, গা শিউরানো একটা ব্যাপার আছে যা কোন মানুষের মধ্যে থাকতে পারে না। ওই দানব রক্তচক্ষুর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। ওই ভয়ানক চোখ জোড়া বর্ণনাতীত ভয়ঙ্কর, যার দিকে তাকায়, মনে হবে তার বুক ছিঁড়ে কলজে টেনে আনবে।

আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখি কুঠিয়াল ফ্রেডরিককে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে এলিয়ে পড়েছে বুড়োর গায়ে। বীভৎস প্রাণীটাকে দেখে ভয়ে আমার আত্মা উড়ে গেলেও তরুণ আর্লের করুণ দশা দেখে আমার মমতা হলো।

শিসের মত নিঃশ্বাস ফেলল কুঠিয়াল, তারপর আবার নিচু গলায়, শ্বাপদ স্বরে বলল, 'আপনারা সামনে যাকে দেখছেন উনি লেডি সুসান গ্ল্যানভিল। তাঁকে ১৪৭৩ সালে এ ঘরে বন্দি করে রাখা হয়।'

আতংকের একটা ঢেউ বয়ে গেল আমার শরীরে। মনে হলো অশুভ একটা শক্তি যেন ছুটে আসছে আমাদের দিকে।

ভয়ংকর ওই প্রাণীটা পুরুষ না নারী কিছুই বুঝতে পারিনি আমি। কিন্তু নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে ভৌতিক জীবটা লালচে মুখ হাঁ করে খনখনে গলায় হেসে উঠল।

আমি এই প্রথম লক্ষ করলাম দানবীটাকে দেয়ালের সঙ্গে ডাবল শিকল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। সময়ের আবর্তনে কালো হয়ে যাওয়ার কারণে অন্ধকারে শিকলগুলো আগে চোখে পড়েনি।

মুখস্থ পড়ার মত বলে চলেছে কুঠিয়াল, 'লেডি গ্ল্যানভিল চিলটন-পেনদের মায়ের দিকের পূর্বপুরুষ। উনি শয়তানের পূজা করতেন। তাঁকে ডাইনি হিসেবে অভিযোগ করা হয়। তবে তিনি পালিয়ে যান। শেষে তাঁর নিজের লোকরা তাঁকে জোর করে এখানে ধরে নিয়ে আসে। তাঁকে দেয়ালের সঙ্গে শিকলে বেঁধে, মৃত্যুর দুয়ারে ফেলে রেখে তারা চলে যায়।'

একটুক্ষণ বিরতি নিয়ে আবার শুরু করল বুড়ো। 'তবে কাজটা করতে ওরা দেরি করে ফেলেছিল। কারণ লেডি গ্ল্যানভিল আগেই অন্ধকারের শক্তির সঙ্গে একটি চুক্তি করে ফেলেন। ওটা ছিল বর্ণনাতীত ভয়ংকর এক অপশক্তি। এক দুঃস্বপ্ন।'

কুঠিয়াল তার জ্বলন্ত মশাল লাল চোখের বিকট প্রাণীটার উদ্দেশে একবার নেড়ে বলল, 'লেডি ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। মৃত্যুকে ঘৃণা করতেন তিনি। ভয় পেতেন মরণ। তিনি সেই ভয়াল ভয়ংকর অপশক্তির সঙ্গে নিজের আত্মা এবং শরীর বিনিময় করেন—আজীবন বেঁচে থাকার অঙ্গীকারে।'

কুঠিয়ালের কণ্ঠ যেন দুঃস্বপ্নের মত, ভেসে আসছে বহুদূর থেকে।

সে বলে চলল, 'চুক্তি ভাঙার পরিণাম যে কত ভয়ংকর হতে পারে তা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। লেডি গ্ল্যানভিলের কোনও বংশধর এ কাজ করার সাহস দেখায়নি এর ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে। গত প্রায় পাঁচশো বছর ধরে এভাবেই বেঁচে আছেন লেডি।'

ভাবলাম কুঠিয়ালের গল্প শেষ। কিন্তু সে একঘেয়ে কণ্ঠে বলে যেতে লাগল। ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকাল, অভিশপ্ত কামরার ছাদের দিকে মশাল তুলে ঘোষণার সুরে বলল, 'এ ঘরটি পারিবারিক সমাধি স্থলের ঠিক নীচে। আর্লের মৃত্যুর পরে তাঁর লাশ এনে রাখা হয় পাতাল কুঠুরিতে। শোকাকুল লোকজন চলে যাবার পরে কুঠুরির

কৃত্রিম তলা ঠেলে 'সরিয়ে আর্লের লাশ ফেলে দেয়া হয় এ ঘরে।'

ওপরে মুখ তুলে তাকাতেই চৌকোনা একটি ট্র্যাপডোর দেখতে পেলাম।

কুঠিয়ালের কণ্ঠ এবারে প্রায় অস্পষ্ট শোনাল। 'প্রতি জেনারেশনে একবার খেতে দিতে হয় লেডি গ্ল্যানভিলকে–তিনি আর্লের লাশ খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেন। শয়তানের সঙ্গে এ ভয়ংকর চুক্তি ভঙ্গের কোনও অবকাশ নেই।'

এখন বুঝতে পারছি আমাদের সামনের ওই ভয়াল জীবটার মুখে লালচে আঠাল জিনিসটা আসলে কী ছিল।

নিজের কথার সত্যতার প্রমাণ করতেই যেন হাতের মশালটা পাথরের বেঞ্চির দিকে বাড়িয়ে ধরল কুঠিয়াল, যেখানে ঘাপটি মেরে বসে আছে ভ্যাম্পায়ার দানবী।

মশালের আলোয় দেখতে পেলাম বেঞ্চির নীচের মেঝেতে তাজা রক্ত মেশানো হাড়গোড় এবং মাথার খুলি ছড়ানো। প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষের ছিন্নভিন্ন শরীরের অবশিষ্টাংশ। খানিকটা দূরে আরও কিছু হাড়গোড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কালের বিবর্তনে কালচে, বাদামী রঙ ধারণ করেছে।

এমন সময় চিৎকার দিতে শুরু করল ফ্রেডরিক। তার তীক্ষ্ণ, হিস্টিরিয়া রোগীর মত চিৎকারে ভরে গেল ঘর। কুঠিয়াল তাকে ধরে প্রবল একটা ঝাঁকি দিল, কিন্তু ভয়ার্ত, কান ফাটানো চিৎকারের বিরতি ঘটল না।

বেঞ্চিতে বসে থাকা জিন্দালাশের মত প্রাণীটা তার ভীষণ লাল চোখ মেলে কয়েক মুহূর্ত পরখ করল ফ্রেডরিককে। তারপর তার মুখ দিয়ে জন্তুর মত ঘরঘরে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল। মনে হলো হাসছে।

অকস্মাৎ, আমাদেরকে বুঝে ওঠার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে ওটা বেঞ্চি থেকে পিছলে নেমে এল, লাফ মারল আর্লকে লক্ষ্য করে। দেয়ালের সঙ্গে বাঁধা শিকলের কারণে বাধা পেল সে, দুই/তিন হাতের বেশি এগোতে পারল না। শিকলে জোরে টান খেয়ে ছিটকে গেল

পেছনে। তবু বারবার আর্লের গায়ে ওটা ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। লাফাচ্ছে-ঝাঁপাচ্ছে সেই সঙ্গে গলা দিয়ে খনখনে, বিকট একটা হাসির শব্দ বেরিয়ে আসছে। এমন ভয়ংকর হাসি, আমার ঘাড়ের পেছনের সবগুলো চুল দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে।

উইলিয়াম কাউয়াথ মশালটা বাগিয়ে ধরল দানবীর দিকে। কিন্তু ওটার লম্ফঝম্প কমল না। আর্ল গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে, বীভৎস চেহারার জীবটা তার সঙ্গে সমান তালে খলখলে গলায় হেসে চলেছে, সম্মিলিত.বীভৎস শব্দে নারকীয় হয়ে উঠল পরিবেশ। ইচ্ছে করল এক ছুটে পালিয়ে যাই।

এই প্রথম কুঠিয়ালের মুখটা ভয়ে শুকিয়ে যেতে দেখলাম আমি। সে ভীত দৃষ্টিতে সৃষ্টিছাড়া জীবটাকে দেখছে, বারবার তাকাচ্ছে দেয়ালের শিকলে।

কুঠিয়াল কী ভাবছে বুঝতে পারছি। পাঁচশো বছর ধরে দেয়ালের সঙ্গে লটকানো জং ধরা শিকল কি দানবীটাকে আটকে রাখতে পারবে? ওটা শিকল ছিঁড়ে চলে আসবে না তো?

হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঝট্ করে কী একটা জিনিস বের করে আনল কুঠিয়াল। মশালের আলোয় ঝলসে উঠল ওটা। রুপোর একটি ক্রুশ। এক লাফে সামনে বাড়ল বুড়ো, ক্রুশটা প্রায় ঠেসে ধরল বিকট উল্লাসে লাফাতে থাকা অবিশ্বাস্য ভয়ংকর চেহারার জীবটার মুখে, যাকে দেখে চেনার জো নেই এ এক সময় ছিল সুন্দরী লেডি সুসান গ্ল্যানভিল।

ক্রুশটি মুখ ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি, মরণঘাতী আর্তনাদ ছেড়ে পিছিয়ে গেল বিকট প্রাণীটা। লাফ মেরে উঠে পড়ল বেঞ্চিতে, গুটিশুটি মেরে বসে রইল ওখানে। নীরব এবং নিশ্চল। বিশ্রী মুখটা শুধু খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে আর লাল চোখে ঠিকরে আসা ঘৃণা দেখে বোঝা যায় ওটা জ্যান্ত একটা জীব।

উইলিয়াম কাউয়াথ গম্ভীর গলায় বলল, 'নরকের জীব! ওই বেঞ্চি থেকে আবার নেমে এসেছ তো আমরা এ ঘর ছেড়ে চলে যাব, বন্ধ করে দিয়ে যাব চিরদিনের মত। ঈশ্বরের কসম, এই ক্রুশ আমি

ব্যবহার করব তোমার বিরুদ্ধে।'

লাল আগুনের গোলার মত চোখ জোড়া তীব্র ঘৃণা নিয়ে লক্ষ করছিল কুঠিয়ালকে। আগুন জ্বলছিল যেন চোখে। এবার ওখানে আমি আরেকটি অনুভূতি ফুটে উঠতে দেখলাম—ভয়!

ঘরের ভেতরকার নীরবতা সম্পর্কে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলাম আমি। কয়েক মুহূর্ত বজায় থাকল নৈঃশব্দ। আর্ল চিৎকার থামিয়েছে, তবে এবারে আরও ভয়াবহ একটি কাণ্ড ঘটল। হাসতে শুরু করল সে।

খিকখিক করে, চাপা গলায় হাসছে সে। কিন্তু ওর চিৎকারের বীভৎসতার চেয়ে ওটা ভয়ংকর। খিকখিক করে হেসেই চলল সে।

ঘুরল কুঠিয়াল। আমাকে ইশারা করল ভাঙা দেয়ালের দিকে কদম বাড়াতে। আমি এগোলাম ওদিকে। দেয়ালের গর্ত গলে গোপন কক্ষের বাইরে চলে এলাম। আমার পেছনে কুঠিয়াল এল তরুণ আর্লকে নিয়ে। সে এক সেকেণ্ডের জন্যও তার হাসি থামায়নি। উন্মাদের মত হেসেই চলেছে।

কুঠিয়াল কোত্থেকে যেন এক বস্তা চুন সুরকি নিয়ে এল, সেই সঙ্গে পানি। আগেই বোধহয় ব্যবস্থা করে রেখেছিল। মশালের আলোয় কাজ শুরু করে দিল। সিমেণ্ট বানিয়ে দেয়ালের গর্ত বুজে দিতে লাগল সরিয়ে রাখা আগের পাথরগুলো জায়গা মত বসিয়ে।

কাজ করছে কুঠিয়াল, গুহায় মূর্তি হয়ে বসে থাকল আর্ল, মৃদু গলায় হেসেই চলেছে।

গোপন কক্ষ থেকে কোন কিছুর সাড়াশব্দ আসছে না। শুধু একবার পাথরের সঙ্গে ঘষা খেয়ে ঝনঝন শব্দে বাজল লোহার শিকল।

দেয়ালে শেষ পাথরটা তুলে ফোকর পুরোপুরি বন্ধ করে দিল কুঠিয়াল। তারপর আমাদেরকে নিয়ে ফিরে চলল প্যাসেজওয়ে ধরে। সেই বরফশীতল সিঁড়ি বেয়ে আমরা ওপরে উঠতে লাগলাম। আর্ল তো সিঁড়ি বাইতেই পারছিল না। তাকে ধরে ধরে বহু কষ্টে নিয়ে আসতে হলো।

নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় ধপ করে বসে পড়ল আর্ল। স্থির দৃষ্টি মেঝেতে। নিঃশব্দে হাসছে। আতংকিত হয়ে লক্ষ করলাম তার সমস্ত কালো চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। তাকে এক গ্লাস মদ জোর করে খাওয়াল কুঠিয়াল। আমি নিশ্চিত মদে সে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছে। মদ পান করিয়ে একরকম জোর করেই আর্লকে বিছানায় শুইয়ে দিল কুঠিয়াল।

উইলিয়াম কাউয়াথ আমাকে আরেকটি ঘরে নিয়ে এল। এই ভয়ংকর জায়গাটা থেকে আমি এখন পালাতে পারলেই বাঁচি। তবে বাইরে ঝড়ের মাতামাতি একটুও কমেনি। আর মনে হয় না একজন সঙ্গী ছাড়া গাঁয়ে ফিরে যাবার সাহস পাব।

চেহারা করুণ করে ডানে-বামে মাথা নাড়ল কুঠিয়াল। 'আমার প্রভু বোধহয় প্রচণ্ড ভয় পেয়ে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন। আর বেশিদিন বাঁচবেন বলেও মনে হচ্ছে না। উনি বরাবরই এরকম—দুর্বলচিত্ত, ভীতু। তাঁর দশা যা দেখছি তাতে মনে হয় না উনি আর কোনদিন সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

সহানুভূতির স্বরে দু'একটা কথা বললাম আমি। কুঠিয়াল শীতল নীল চোখ রাখল আমার চোখে। 'এমনকী হতে পারে না,' বলল সে, 'তরুণ আর্ল যদি মারা যান, আপনি তার জায়গায়...' ইতস্তত করছে সে, 'আপনাকে একটু ভেবে দেখার অনুরোধ করছি। আপনি তো এ বংশেরই মানুষ। হোক না দূর সম্পর্কের...আপনি এরপর আর্ল হলেন...'

আর কিছু শুনতে চাই না আমি। যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম ওই ভয়ংকর লাল চোখ মেলে শিকল দিয়ে বাঁধা সৃষ্টিছাড়া জীবটা শিকল ছিঁড়ে, দেয়াল ভেঙে গোপন কক্ষ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। চার হাতপায়ে ভর করে উঠে আসছে শ্যাওলা জমা বরফ ঠাণ্ডা সিঁড়ি বেয়ে...

পরদিন ভোর হওয়ার আগেই আমি আমার ঘরের দরজার ছিটকিনি খুলে চোরের মত চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লাম। ঠাণ্ডা প্যাসেজওয়ে,

প্রকাণ্ড, নির্জন হলঘর দিয়ে পা টিপেটিপে হাঁটলাম, যেন কেউ টের না পায়। পার হলাম নুড়ি ছড়ানো উঠন এবং কুচকুচে কালো পরিখা। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম গাঁয়ের সরাইখানার উদ্দেশে।

দুপুরের আগেই মালসামান নিয়ে লণ্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। ভাগ্য ভাল, পরদিনই একটা জাহাজ পেয়ে গেলাম। আটলাণ্টিক পাড়ি দিচ্ছে।

আমি এ জীবনে আর ইংল্যাণ্ডমুখো হচ্ছি না। চিলটন প্রাসাদ আর তার অধিবাসীদের কাছ থেকে আমি চিরতরে দূরে থাকতে চাই।

ক্যালডেনস্টাইনের ভ্যাম্পায়ার

এক

যুবক বয়সেই ইউরোপের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোটা আমার নেশায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ইতালি, স্পেন, নরওয়ে এবং দক্ষিণ ফ্রান্সে আমার আনন্দময় সময় কেটেছে। তবে সবচেয়ে ভাল লেগেছে জার্মানী। পকেটে রেস্তের পরিমাণ অল্প, পছন্দগুলোও দামী নয় অথচ মুক্ত বাতাসে জীবন উপভোগ করতে চাওয়া মানুষের জন্য সবচেয়ে ভ্রমণ উপযোগী দেশ হলো জার্মানী। ও দেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষগুলো সহজ-সরল, সরাইখানাগুলো আরামপ্রদ এবং সস্তা। আমি জার্মানীতে বহুবার ছুটি কাটাতে গিয়েছি তবে একবারের ঘটনা স্মৃতিতে দারুণভাবে গেঁথে রয়েছে। ওই অদ্ভুত এবং ভয়ানক অভিজ্ঞতার কথা জীবনেও ভুলব না।

১৯৩৩ সালের গ্রীষ্মকাল। ডোনাল্ড ইয়াংয়ের সঙ্গে জাহাজে চেপে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে বেড়িয়ে আসার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন। এমন সময় শিশুতোষ একটি রোগে আক্রান্ত হলো ডোনাল্ড। হাম-এ আক্রান্ত হলো ও। সাগর ভ্রমণে গেলে এখন একা যেতে হবে আমাকে, কিন্তু একা একা জাহাজ ভ্রমণের বিষয়টি মোটেই মনঃপূত হলো না। মানুষজনের সঙ্গে খুব একটা মিশতে পারি না আমি। আর এসব জাহাজে নাচ-গান-খানা-পিনার অঢেল আয়োজনের অভাব নেই। হৈ হুল্লোড়ে ভরা ককটেল পার্টিতে নিজেকে মনে হবে পানি থেকে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেতে থাকব। বন্ধ হয়ে আসবে দম। তাই জাহাজ ভ্রমণের চিন্তা বাদ দিয়ে জার্মানীর একটি মানচিত্র খুলে বসলাম। এ দেশের কোথায় ঘুরতে যাওয়া যায় তার প্ল্যান করতে লাগলাম।

বেশ কয়েকটি জায়গায় যাবার চিন্তা করেও পরে নাকচ করে দিলাম পরিকল্পনা। প্রথমে বেছে নিয়েছিলাম মোসেল ভ্যালি। তারপর ওটা বাতিল করে নির্বাচন করলাম লাহ্ন। ব্ল্যাক ফরেস্টে যাব নাকি হার্জ মাউণ্টেনে ঘুরে বেড়াব এ নিয়ে দোদুল্যমান রইলাম বেশ কিছুক্ষণ। তারপর ভাবলাম স্যাক্সোনি থেকে আরেকবার ঘুরে আসা যায়। শেষে দক্ষিণ বাভারিয়াকে টার্গেট করলাম। ওদিকটাতে এখনও যাওয়া হয়নি। আর নতুন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে ভালই লাগবে।

সারা পৃথিবী চষে বেড়ানো শক্তসমর্থ অভিযাত্রীও থার্ডক্লাসে ভ্রমণ করলে ক্লান্তির চরমে পৌঁছে যাবে। আমারও একই দশা হলো। মিউনিখ পৌঁছে নিজেকে রীতিমত বিধ্বস্ত লাগল। সৌভাগ্যক্রমে হোফগার্টেনের কাছে, ইন্ অভ দা গোল্ডেন অ্যাপল-এর সন্ধান পেয়ে গেলাম। এ সরাইখানায় পিটার স্মিট ভাল মদ এবং ভাল খাবার বিক্রি করে। টানা দশ বছর কানাডা থাকার সুবাদে চমৎকার ইংরেজি বলতে পারে পিটার। আমার ক্লান্ত চেহারা দেখে যা বোঝার বুঝে নিল। এক মার্ক ভাড়ায় আরামদায়ক একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দিল সে আমার জন্য, খেতে দিল গরম কফি এবং রোল, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে টানা বিশ্রাম নিতে বলল। ওর পরামর্শ মেনে নিলাম, ঝাড়া বারো ঘণ্টা গভীর ঘুম ঘুমালাম, ঘুম ভাঙার পরে শরীরটাকে ডেইজি ফুলের মত তাজা লাগল। এক প্লেট শুয়োরের মাংস, এবং বড় দুই গ্লাস বিয়ার খেয়ে শরীর পুরোপুরি চাঙা হবার প্রক্রিয়াটি যেন শেষ হলো। আমি মিউনিখ-দর্শনে বেরিয়ে পড়লাম।

নগরীটি জার্মানীর চতুর্থ বৃহত্তম শহর, দর্শনার্থীদের দেখার মত অনেক কিছু আছে এখানে। আমি Fraun-kirthe-এ গেলাম, দেখলাম প্রাচীন Rathaus সেন্ট পিটারের আমলের চতুর্দশ শতকের একটি গির্জা এটি, মারিয়েন প্লাজের কাছে। Regina-palast ঘুরে দেখলাম। ওখানে তখন টী-ডান্স (Tea-dance) চলছিল। তারপর গোল্ডেন অ্যাপল-এ ফিরে এলাম ডিনার করতে। এরপরে ন্যাশনাল থিয়েটারে গেলাম উরব Meistersinger দেখতে। ঘরে ফিরতে ফিরতে মধ্যরাত পার। বিছানায় শোয়ার সময় সিদ্ধান্ত নিলাম মিউনিখে

আরেকটা দিন কাটাব।

আমি মিউনিখের কোথায় কোথায় ঘুরে বেরিয়েছি কিংবা কী কী দেখেছি তার বর্ণনা করে আপনাদের বিরক্তি উদ্রেক করতে চাই না। যেখানে গেছি কিংবা যা দেখেছি তা অসাধারণ কিছু নয়। সবই সাধারণ জায়গা।

ডিনার শেষে পিটার এল আমার সঙ্গে ট্যুরের প্ল্যান করতে। দর্শনীয় আর কোথায় যাওয়া যায় তার একটা তালিকা করল সে। বাভারিয়ান গ্রামগুলো খুব ভাল চেনে পিটার। কোন্ কোন্ সরাইখানায় গেলে আমার সময়টা ভাল কাটবে তারও একটা তালিকা আমার হাতে ধরিয়ে দিল সে। বলল ট্রেনে করে যেন রোজেন হেইমে যাই এবং সেখান থেকে শুরু করি আমার হণ্টন পর্ব। দুশো মাইল রাস্তা ভ্রমণের একটা রুট তৈরি করলাম দু'জনে মিলে। ভ্রমণ শেষে মিউনিখ ফিরতে ফিরতে আমার দিন পনেরো লেগে যাবে।

পরদিন সকালের ট্রেনে রওনা হয়ে গেলাম রোজেন হেইম-এর উদ্দেশে। প্রচণ্ড তুষারপাত শুরু হয়েছে। ছেচল্লিশ মাইল দূরত্ব পার হতে প্রায় তিনঘণ্টা লেগে গেল। শহরটি ছোট, শান্ত, চনমনে। গড়ে উঠেছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাউনের আদলে। শহরটিতে রয়েছে পঞ্চদশ শতকের চার্চ এবং একটি পুরানো চ্যাপেলে বাভারিয়ান পেইণ্টিং সমৃদ্ধ চমৎকার একটি মিউজিয়াম।

ওখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ালাম না, ট্রাউনস্টেইনের রাস্তা অভিমুখে হাঁটা দিলাম–এ মনোরম পথ ঘিরে রেখেছে বাভারিয়া'র বৃহত্তম হ্রদ চিয়েম-সিকে।

ট্রাউনস্টেইনে রাতটা কাটিয়ে পরদিন রওনা হলাম প্রাচীন প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা শহর মুহ্লডাফ। ওখান থেকে ফারকিরচেন হয়ে ভিলশোফোন যাবার ইচ্ছে আমার কিন্তু ভুল রাস্তায় মোড় নেয়ার কারণে ঢুকে পড়লাম গ্যাংকোফেন নামে ছোট একটি এলাকায়। স্থানীয় এক সরাই'র মালিক আমার বেগতিক অবস্থা দেখে বাড়িয়ে দিল সাহায্যের হাত। একটা মাঠ দেখিয়ে বলল ওইদিকে গেলে ফারকিরচেনের রাস্তাটা শর্টকাট হবে। কিন্তু আমি লোকটার কথা ঠিক বুঝতে পারিনি বলে ধরা

খেলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল অথচ আমি তখন নিচু একসার পাহাড়ের মাঝখানে অসহায়ের মত ঘুরে মরছি। এ পাহাড়শ্রেণীর কথা আমার মানচিত্রে উল্লেখ নেই। দ্রুত নেমে আসছে রাত। আমি হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম ছোট একটি গাঁয়ে। উঁচু একটি পাহাড়ের ছায়ায় গ্রামটি। পাহাড়চুড়োয় ধূসর পাথরের একটি প্রাসাদ।

এ জায়গায় ভাগ্যবলেই প্রাগৈতিহাসিক চেহারার একটি সরাইখানার দেখা মিলল। তবে দেখতে যেমনই হোক সরাইটি বেশ আরামদায়ক। সরাই'র মালিকের কথা শুনে মনে হলো ঘটে বুদ্ধি রাখে এবং বন্ধুবৎসল। জানাল এ এলাকায় দর্শনার্থী আসে না বললেই চলে। ছোট্ট গ্রামটির নাম ক্যালডেনস্টাইন।

আমাকে ছাগলের দুধের পনির, সালাদ, মোটা রুটি আর জলের মত পাতলা লাল মদ পরিবেশন করা হলো। ওই সময় এ খাবারটিই অমৃতের মত লেগেছে। আমি খেয়ে দেয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করতে বেরুলাম।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। মেঘশূন্য আকাশের পটভূমিকায় পাহাড়ের ওপরের প্রাসাদটিকে কোনও জাদুর প্রাসাদ বলে মনে হচ্ছিল। ছোট একটি ভবন–আয়তাকার, চারটে প্রাসাদশৃঙ্গ,–তবে দারুণ লাগছিল দেখতে। মনে হচ্ছিল এত সুন্দর প্রাসাদ জীবনে দেখিনি। একটি জানালায় মিটমিট করে জ্বলছে বাতি। তার মানে ওখানে মানুষজন আছে। অনেকগুলো পাথুরে সিঁড়ির ধাপ নিয়ে খাড়া একটা পথ উঠে গেছে ওপর দিকে। ক্যালডেনস্টাইনের ভূ-স্বামীর সঙ্গে দেখা করে যাব কিনা ভাবলাম একবার। পরে চিন্তাটা নাকচ করে দিয়ে ফিরে এলাম সরাইখানায়। পাবলিক রুমে বসে অল্প ক'জন লোক মদ পান করছে। যোগ দিলাম ওদের সঙ্গে।

উপস্থিত লোকজনের মধ্যে প্রায় সবাই শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ। তারা আচরণে বিনয়ী হলেও আন্তরিকতার একটা অভাব লক্ষ করলাম, এদের মধ্যে যা জার্মান গ্রামবাসীদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। কেমন অসামাজিক এবং অমিশুক স্বভাবের লাগল লোকগুলোকে। মনে হলো তারা আমার কাছ থেকে কিছু একটা গোপন করতে চাইছে। ভয়ংকর

কোনও সত্য। আমি তাদের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত হতে চাইবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম, আমার সাথে আলাপ জমানোর মুডে নেই তারা। আমার সঙ্গে যেন কথা বলে এ আশায় একজনকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, ভাই, পাহাড়ের ওই প্রাসাদে কে বাস করেন?'

নির্দোষ এ প্রশ্নের এমন প্রতিক্রিয়া পাব ভাবিনি। তারা দারুণ চমকে উঠল। যারা পান করছিল বিয়ার তারা তাদের মগগুলো টেবিলে নামিয়ে রেখে আমার দিকে আতংক ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কেউ কেউ বুকে আঁকল ক্রশ চিহ্ন, এক বয়সী মজুর খসখসে গলায় বলে উঠল, 'চুপ করুন, ভাই। উনি শুনে ফেলবেন।'

আমার প্রশ্ন যে ওদের সবাইকে বিচলিত করে তুলেছে তার প্রমাণ পেলাম দশ মিনিটের মাথায়। সবাই একযোগে ত্যাগ করল সরাইখানা। আমি অবিবেচকের মত কোনও কাজ করে ফেললাম কিনা ভেবে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম সরাই'র মালিকের কাছে। যোগ করলাম, আশা করি আমার উপস্থিতি তার ব্যবসার কোনও ক্ষতি করেনি।

সে হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বলল লোকগুলো এমনিতেও আর বেশিক্ষণ সরাইতে থাকত না। 'প্রাসাদের কথা বলেছেন বলে ওরা ভয় পেয়েছে,' বলল সরাইঅলা, 'ওদের ধারণা, রাতের বেলা ওই ভবনের দিকে তাকালেও নাকি দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হয়।'

'কিন্তু কেন?' জানতে চাইলাম আমি। 'ওখানে কে থাকেন?'

'ওটা কাউন্ট লুদভিগ ভন ক্যালডেনস্টাইনের বাড়ি।'

'উনি ওখানে কতদিন ধরে আছেন?'

সরাই'র মালিক এগিয়ে গেল দরজার দিকে, সাবধানে বন্ধ করল কপাট। তারপর আমার চেয়ারের পাশে এসে ফিসফিস করে বলল, 'উনি ওখানে প্রায় তিনশ বছর ধরে বাস করছেন।'

'ধ্যাত, কী বাজে কথা বলছেন!' হেসে ফেললাম আমি। 'একজন মানুষ, সে কাউন্ট হোক বা কৃষক, তিনশো বছর বেঁচে থাকতে পারে নাকি? আপনি আসলে বলতে চাইছেন কাউন্টের পরিবার বংশ পরম্পরায় অত বছর ধরে ওখানে বাস করছেন, তাই না?'

'আমি যা বলেছি ওটাই সত্যি, ইয়ংম্যান,' জোর দিয়ে বলল বৃদ্ধ। 'কাউন্টের পরিবার দশ শতক ধরে ওই প্রাসাদের মালিক। কাউণ্ট নিজে বার্ন ক্যালডেনস্টাইনে প্রায় তিনশো বছর ধরে বসবাস করছেন।'

'কিন্তু তা কী করে সম্ভব?'

'উনি একজন ভ্যাম্পায়ার। প্রাসাদের নীচে অনেক বড় বড় ভল্ট আছে। ওই ভল্টের একটিতে কাউণ্ট দিনের বেলায় ঘুমিয়ে থাকেন যাতে সূর্যের আলো গায়ে না লাগে। কেবল রাতের বেলা তিনি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়েন।'

সরাইঅলার এ ফ্যাণ্টাসি কাহিনি আমার যে বিশ্বাস হলো না তা বলাবাহুল্য। মুচকি হেসে বুঝিয়ে দিলাম আমি তার গল্প বিশ্বাস করিনি। কিন্তু বুড়োর চেহারা দেখে মনে হলো সে এ ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস। আমি এ নিয়ে আর কিছু বলার সাহস পেলাম না। বৃদ্ধ চটে যেতে পারে সে ভয়ে। আমি বিয়ার শেষ করে সিধে হলাম। শুতে যাব। সিঁড়িতে পা রেখেছি, সরাইঅলা পেছন থেকে খপ করে কনুই চেপে ধরল, অনুনয়ের সুরে বলল, 'সার, দয়া করে আপনার ঘরের জানালা বন্ধ রাখবেন। ক্যালডেনস্টাইনের রাতের বাতাসটা তেমন স্বাস্থ্যপ্রদ নয়।'

ঘরে ঢুকে দেখি জানালা ইতিমধ্যে কেউ শক্ত করে বন্ধ করে রেখেছে। গরমে সিদ্ধ হয়ে যাবার দশা। সঙ্গত কারণেই সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেললাম জানালা। ঝুঁকে মুখ বাড়িয়ে বুক ভরে নিলাম তাজা বাতাস। জানালার ঠিক উল্টোদিকে প্রাসাদ। ভরা পূর্ণিমার আলোয় আবারও স্বপ্নিল লাগল ভবনটিকে।

ঘরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছি, মনে হলো টারেট বা প্রাসাদ শৃঙ্গের ওপরে, আকাশের পটভূমিকায় ফুটে আছে কালো একটা শরীর। বাদুড়ের মত প্রকাণ্ড ডানা মেলে ওটা উড়াল দিল রাতের আকাশে। ওটা ঈগল হতে পারে না, ঈগল অত বড় পাখি নয়। তবে চাঁদের আলোয় আকার-আকৃতি বিকৃতও দেখাতে পারে। লক্ষ করলাম উড়তে উড়তে অনেক দূরে চলে গেল, শেষে একটা কালো বিন্দুর মত দেখাল। আর ঠিক তখন, দূর থেকে ভেসে এল কুকুরের আর্তচিৎকার। বিকট, যেন শোকে বিলাপ করছে জানোয়ারটা।

আমি কাপড় ছেড়ে ঘুমাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। সরাই মালিকের অনুনয় অগ্রাহ্য করে জানালা খোলাই রাখলাম। ব্যাগ খুলে বের করে নিলাম ইলেকট্রিক ফ্ল্যাশলাইটটি। রেখে দিলাম বিছানার পাশের ছোট টেবিলের ওপরে। টেবিলের ওপর ঝুলছে কাঠের একটি ক্রুশ।

সাধারণত বালিশে মাথা এলিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দু'চোখ বুজে আসে। কিন্তু আজ কেন যেন ঘুম আসছে না। চাঁদের আলো চোখের ওপর পড়েছে বলেই হয়তো ঘুমাতে পারছিলাম না। নিরুপায় হয়ে ভেড়া গুনতে লাগলাম। কিন্তু তাতেও লাভ হলো না।

সরাইখানার একটি ঘড়ি ঢং ঢং শব্দে মধ্য রাতের ঘোষণা দিল। হঠাৎ অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হলো। মনে হলো আমি যেন ঘরে একা নেই। আরও কেউ আছে। অনুভূতিটা মুহূর্তের জন্য আমার শরীরে ভয়ের শিহরণ তুলল। জোর করে ভয় দূর করে আমি পাশ ফিরে শুলাম। জানালার পাশে ও কে! লম্বা, কালো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে জানালার সামনে। ঝট করে উঠে বসলাম, হাত বাড়িয়ে দিলাম টেবিলে ফ্ল্যাশলাইটের জন্য। ফ্ল্যাশলাইট হাতড়াতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে কী যেন একটা ছিটকে পড়ল টেবিলে। কাঠের সেই ছোট্ট ক্রুশটি। ওটা টেবিল থেকে যাতে না পড়ে যায় সেজন্য চট করে মুঠো করে ধরে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে ভেসে এল ক্রুদ্ধ গর্জন। দেখলাম জানালার সামনে দাঁড়ানো লোকটা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে, এক লাফে সরে গেল ওখান থেকে, মিলিয়ে গেল রাতের আকাশে। ওই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে একটি ব্যাপার আমি খেয়াল করেছি–ওই লোকটা, সে যে-ই হোক, তার কোনও ছায়া পড়েনি ঘরে। চাঁদের আলো যেন তার শরীর ভেদ করে ঢুকছিল ভেতরে।

আধঘণ্টা লাগল সুস্থির হতে। তারপর সাহস করে নামলাম বিছানা থেকে। বন্ধ করে দিলাম জানালা। এরপর বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়লাম এবং মরার মত ঘুমালাম পরদিন সকাল আটটা পর্যন্ত। চাকরের ডাকে ঘুম ভাঙল আমার।

চনমনে রোদে গত রাতের ঘটনাটা বিশ্বাস করাটা হাস্যকর একটি

ব্যাপার মনে হচ্ছিল আমার কাছে। ভাবলাম ওরকম আসলে কিছু ঘটেনি, স্রেফ দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম। রাতটা কেমন কেটেছে সরাইঅলা বিনীত ভঙ্গিতে জানতে চাইলে জোর দিয়ে বললাম এমন আরামের ঘুম জীবনে ঘুমাইনি। যদিও আমার চেহারা দেখে এ কথা সরাইঅলার বিশ্বাস না হবারই কথা।

দুই

নাশতা সেরে আমি গ্রাম ঘুরতে বেরুলাম। গ্রামটি বেশ বড়ই মনে হলো, রাস্তার পাশে, উপত্যকায় কিছু বাড়িঘর চোখে পড়ল। ছোট একটি চার্চও আছে। রোমান আদলে তৈরি, খুবই জীর্ণ দশা। অতিসত্বর মেরামতের প্রয়োজন। ভবনটিতে প্রবেশ করলাম আমি, উঁচু বেদীতে চোখ বুলাচ্ছি, এমন সময় সাইডডোর দিয়ে একজন প্রীস্ট ঢুকলেন ঘরে। রোগা-পাতলা, কঠোর তপস্বীর মত চেহারা। আমাকে দেখে আন্তরিক একটি হাসি দিলেন। প্রত্যুত্তরে আমিও হাসলাম, বললাম ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছি। ভবনের করুণ দশার কথা উল্লেখ করে তিনি আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। তবে চার্চের সবকিছুরই ভগ্নদশা নয়। পঞ্চদশ শতকের একটি গ্লাস দেখালেন প্রীস্ট, এখনও চকচক করছে। একই সময়কার দীক্ষা-বারি রাখার একটি পাত্র আমার মনোযোগ কাড়ল, ম্যাডোনার মূর্তিটিও খুব সুন্দর।

যাওয়ার সময় দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমি প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ফাদার, আপনার কাছ থেকে যে আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়েছি, ক্যালডেনস্টাইনের ভূ-স্বামীর কাছ থেকেও অনুরূপ আচরণ আশা করতে পারি কি?'

'ক্যালডেনস্টাইনের ভূ-স্বামী,' নামটা উচ্চারণ করার সময় কেঁপে গেল প্রীস্টের কণ্ঠ। 'আপনি কি সত্যি ওই প্রাসাদে যেতে চাইছেন?'

'আমার সেরকমই ইচ্ছে,' জবাব দিলাম আমি। 'প্রাসাদটা আমার

কাছে খুব চিত্তাকর্ষক মনে হচ্ছে। প্রাসাদ-দর্শন না করে এখান থেকে চলে গেলে মনে একটা আফসোস থেকে যাবে।'

'ওই অভিশপ্ত জায়গায় না যাওয়াই ভাল,' অনুনয়ের সুরে বললেন প্রীস্ট। 'ক্যালডেনস্টাইন প্রাসাদে বহিরাগত কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। তা ছাড়া,' বলে চললেন তিনি, 'ওখানে দেখার মত কিছু নেই-ও।'

'শুনেছি ভবনে চমৎকার কিছু ভল্ট আছে। আর একজন মানুষ গত তিনশো বছর ধরে ওই ভল্টে বাস করে আসছেন,' বললাম আমি। 'ওগুলো অন্তত দেখা যেতে পারে, নাকি?'

রক্তশূন্য হয়ে গেল প্রীস্টের মুখ। 'আপনি তা হলে ভ্যাম্পায়ারের কথা জানেন। শয়তান নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে নেই, মাই সন। ঈশ্বর আমাদেরকে জিন্দালাশের হাত থেকে রক্ষা করুন।' বুকে ক্রুশ আঁকলেন তিনি।

'ফাদার,' বললাম আমি, 'আপনি নিশ্চয় মধ্যযুগীয় এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন না?'

'যা সত্যি তাতে সবাই বিশ্বাস করে। আর আমরা, ক্যালডেনস্টাইনের বাসিন্দারা জানি, ১৬৪৫ সালে কাউন্ট ফিওডরের মৃত্যুর পরে আর কাউকে কবর দেয়া হয়নি। ও প্রাসাদ দখল করে রেখেছেন ফিওডরের কাজিন লুডভিগ। ওঁর বাড়ি হাঙ্গেরী।'

'এ গাঁজাখুরি গল্প,' আপত্তির সুরে বললাম আমি। 'এ রহস্যের নিশ্চয় কোনও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা রয়েছে। ১৬৪৫ সালে একজন লোক ওই প্রাসাদে এসেছে, এখনও সে বেঁচে আছে, এ কথা কল্পনাও করা যায় না।'

'যারা শয়তানের পূজারী তাদের পক্ষে দীর্ঘদিন জীবন ধারণ করা সম্ভব,' বললেন প্রীস্ট। 'ইতিহাস সাক্ষী সবসময়ই মন্দের সঙ্গে শুভ'র যুদ্ধ হয়েছে এবং মন্দ এ যুদ্ধে প্রায়ই জিতে গেছে। ক্যালডেনস্টাইন প্রাসাদ বিভীষিকা এবং অস্বাভাবিকতার আস্তানা। আপনাকে অনুরোধ–ওই প্রাসাদ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে থাকবেন।'

প্রীস্ট আমাকে আন্তরিকতার সঙ্গে বিদায় দিলেন, আশীর্বাদের

ভঙ্গিতে তুললেন হাত, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন চার্চের ভেতরে।

এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই প্রীস্টের কথা শোনার পরে আমার গা ছমছম করে উঠেছিল, মনে পড়ে গিয়েছিল গতরাতের দুঃস্বপ্নের কথা। ওটা কি সত্যি দুঃস্বপ্ন ছিল? নাকি ভ্যাম্পায়ার স্বয়ং ছুটে এসেছিল আমাকে তার শিকার বানাতে? আকস্মিক ক্রুশে হাত লেগে যাওয়ায় ব্যর্থ আক্রোশে সে গর্জন করে উঠেছিল হতাশা থেকে? এসব চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেতে প্রাসাদে যাওয়ার ইচ্ছেটা প্রায় মরে গেল। আমি আবার ধূসর রঙের প্রাসাদ দেয়ালে চোখ তুলে তাকালাম। সকালের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে। আপন মনে হেসে উঠলাম ভয় পেয়েছি বলে। মধ্যযুগের কোনও কাল্পনিক দানব আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। প্রীস্ট আসলে তাঁর অশিক্ষিত প্যারিশনারদের মতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

একটি জনপ্রিয় গানের সুর শিস দিয়ে বাজাতে বাজাতে গাঁয়ের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। একটু পরেই চলে এলাম প্রাসাদ অভিমুখে চলে যাওয়া সরু রাস্তায়। খাড়া ঢালের মত রাস্তাটা। পায়ে চলা পথটিতে একটু এগোতেই পেয়ে গেলাম ধাপে ধাপে সিঁড়ি। উঠে গেছে ওপর দিকে। খাড়া সিঁড়িগুলো মিশেছে ছোট্ট একটি মালভূমির সঙ্গে। ভবনের মূল দরজার সামনে এ মালভূমি। জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই কোথাও, তবে এণ্ট্রান্সে ঝুলছে ভারী একটি ঘণ্টা। জং ধরা একটি চেইনে টান দিতেই ফাটল ধরা জিনিসটা ঢং ঢং শব্দে বেজে উঠল। শব্দে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ায় প্রাসাদের একটি টারেটে বসা কতগুলো রুক (কাকের মত দেখতে বড় পাখি) কিচির-মিচির করে উঠল। কিন্তু শব্দ শুনেও কেউ দেখতে এল না কে ঘণ্টা বাজিয়েছে। আবার ঘণ্টা বাজালাম। এবারে ঘণ্টাধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই শুনতে পেলাম কেউ দরজার হুড়কো খুলছে। প্রকাণ্ড কপাট জোড়া খুলে যাওয়ার সময় কজাগুলো ক্যাঁচকোঁচ শব্দে তীব্র আপত্তি জানাল। উদয় হলো এক বুড়ো। সূর্যের আলোয় পিটপিট করছে চোখ।

'ক্যালডেনস্টাইনের প্রাসাদে কে এসেছে?' কণ্ঠে তীক্ষ্ণ নিনাদ তুলে জিজ্ঞেস করল সে। লক্ষ করলাম লোকটা আধা-অন্ধ।

'আমি একজন ইংরেজ ভিজিটর,' জবাব দিলাম। 'কাউন্টের সঙ্গে

দেখা করতে এসেছি।’

‘হিজ এক্সেলেন্সি ভিজিটরদের সঙ্গে দেখা করেন না,’ জবাব এল এবং লোকটা আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করতে গেল।

‘অন্তত প্রাসাদ ঘুরে দেখার অনুমতি পেতে পারি কি?’ দ্রুত বললাম আমি। ‘আমি মধ্যযুগের দুর্গ দেখতে বিশেষ আগ্রহী। এই চমৎকার ভবনটি না দেখে ক্যালডেনস্টাইন ত্যাগ করলে আমার মনে বিরাট আফসোস থেকে যাবে।’

চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকাল বুড়ো। ইতস্তত গলায় বলল, ‘এখানে দেখার মত তেমন কিছু নেই, সার। আপনি বেহুদা সময় নষ্ট করছেন।’

‘তবু একটু ঘুরে দেখার সুযোগ পেলে খুশি হব,’ বললাম আমি। ‘আর আমার ধারণা কাউন্ট এতে কোনও আপত্তি করবেন না। তোমাকে কথা দিচ্ছি বোকার মত কিছু করে বসব না এবং হিজ এক্সেলেন্সির প্রাইভেসিতে বিঘ্ন ঘটানোর কোনও অভিপ্রায় আমার নেই।’

‘এখন ক’টা বাজে?’ জিজ্ঞেস করল বুড়ো।

বললাম এগারোটা বাজে। বুড়ো বিড়বিড় করে বলল, ‘সূর্য আকাশে থাকতে থাকতে ঘুরে বেড়ানোই ভাল,’ ইঙ্গিত করল ভেতরে যেতে। আমি নগ্ন একটি হলঘরে প্রবেশ করলাম, দেয়ালে ঝুলছে ছেঁড়া ট্যাপেস্ট্রি, স্যাঁতসেঁতে, নোনা ধরা এবং পচা একটা গন্ধ নাকে লাগল। হলরুমের শেষ মাথায় আচ্ছাদিত বেশ কয়েকটি নকশাদার ঢাল।

‘এটি প্রাসাদের মূল হলঘর,’ বিড়বিড় করল আমার গাইড। ‘এই প্রাসাদ ক্যালডেনস্টাইনের মহান ভূ-স্বামীদের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষি। আমাদের ষষ্ঠ কাউন্ট ফ্রেডারিক বারোজন ইটালিয়ান জিম্মির চোখ তুলে ফেলেছিলেন। তারপর তিনি তাদেরকে পাহাড় চুড়ো থেকে ঠেলে ফেলে দেন। কাউন্ট অগাস্ট বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছিলেন ওয়াটার্মবার্গের প্রিন্সকে, তারপর তার লাশ দিয়ে ভোজের আয়োজন করেন।’

ভয়ংকর এবং গা শিউরানো সব গল্প বলে যেতে লাগল বুড়ো। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম ক্যালডেনস্টাইনের কাউন্ট তাঁর পূর্বসূরিদের চেয়ে ভয়াবহতার দিক থেকে কোনও অংশে কম নন। মূল হল থেকে

বৃদ্ধ আমাকে নিয়ে গেল ছোট আকারের কয়েকটি ঘরে। এ ঘরের আসবাবে ছাতা ধরে গেছে। বুড়োর নিজের ঘর উত্তর টারেটে, সে আমাকে পুরো ভবনটি ঘুরে দেখালেও এমন কোনও ঘর চোখে পড়ল না যেখানে তার প্রভু থাকতে পারে। কোনও রকম দ্বিধা না করেই প্রতিটি ঘরের দরজা খুলে দিল বুড়ো। আমার মনে হলো এখানে সে ছাড়া বোধহয় আর কেউ থাকে না।

'কাউন্ট কোন্ ঘরে থাকেন?' মূল হল ঘরে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

আমার দিকে হতবুদ্ধির মত এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল বৃদ্ধ? তারপর জবাব দিল, 'মাটির নীচেও আমাদের কিছু ঘর আছে। হিজ এক্সেলেন্সি ওই ঘরের একটিতে বিশ্রাম নেন। ওখানে কেউ তাঁকে বিরক্ত করে না।'

এ প্রাসাদ এত নির্জন এবং নিশ্চুপ, এখানকার যে কোনও ঘরেই কাউন্ট বাস করতে পারতেন, নিশ্চয় কেউ তাকে বিরক্ত করত না।

'তোমাদের নিজস্ব কোনও চ্যাপেল নেই?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'চ্যাপেলও নীচে।'

বুড়োকে জানালাম চ্যাপেলের ব্যাপারে আমার যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে এবং মাটির নীচের ঘরে কীভাবে প্রার্থনা করা হয় তা দেখতে দারুণ কৌতূহল জাগছে। বুড়ো নানান ওজর-আপত্তি করল ওখানে যেন না যাই সেজন্য। শেষে আমার জেদের কাছে পরাস্ত হয়ে রাজি হলো মাটির নীচের ঘরে যেতে। একটি তাক থেকে পুরানো আমলের একটি লণ্ঠন নামিয়ে আনল সে। জ্বালল ওটা। দেয়ালে ঝোলানো একটি ট্যাপেস্ট্রির কিয়দংশ ওপরে তুলতেই বেরিয়ে পড়ল একটি লুকানোর দরজা। বোটকা একটা গন্ধ ধাক্কা দিল নাকে। আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল বুড়ো আমাকে নিয়ে। তারপর একটি প্যাসেজ ধরে চললাম। প্যাসেজের মাথায় আরেকটি দরজা। দরজার পরে বড় একটি গুহা, চার্চের ঢঙে সাজানো। মড়া রাখা ঘরের মত গুমোট গন্ধ ছড়াচ্ছে এ ঘর, লণ্ঠনের আলোয় আঁধার আরও ঘন করে তুলেছে। আমার গাইড চলল বেদীর দিকে, উঁচু করে ধরল হাতের বাতি, ইঙ্গিতে দেখাল ল্যাজারাসের ভয়ংকর একটি ছবি। মরা

মানুষের শরীরের ওপর থেকে উঠে আসছে ল্যাজারাস। ছবিটি বেদীর ওপর ঝুলছে। আমি ছবিটি আরও ভাল করে দেখার জন্য কদম বাড়াতেই আরেকটি দরজা চোখে পড়ল।

'এর পেছনে কী আছে?'

'আস্তে কথা বলুন, সার,' আকুতি করল বুড়ো। 'এই ভল্টেই শুয়ে বিশ্রাম নেন ক্যালডেনস্টাইনের ভূ-স্বামী।' কথা বলছে বুড়ো হঠাৎ দেয়ালের ওপাশ থেকে ভেসে এল একটা শব্দ—ঘুমের মধ্যে কেউ যেন পাশ ফিরে নিঃশ্বাস ফেলল।

বুড়োও শুনতে পেয়েছে শব্দটা, কাঁপা হাতে আমার বাহু খামচে ধরে টানতে টানতে বের করে নিয়ে এল চ্যাপেল থেকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠছি, লণ্ঠন হাতে আগে আগে থাকল বৃদ্ধ। ক্যাসল হল্-এ আবার পা রাখার পরে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমার দিকে চট্ করে একবার তাকাল বুড়ো। বলল, 'সবই তো দেখলেন, সার। বললাম না পুরানো ওই ভবনে দেখার মত কিছু নেই।'

আমি লোকটার হাতে পাঁচ মার্কের একটা মুদ্রা গুঁজে দিতে চাইলাম। কিন্তু নিল না সে।

'টাকা দিয়ে আমি কী করব, সার?' ফিসফিস করল বৃদ্ধ। 'মরা মানুষের সঙ্গে থাকি। টাকা-পয়সা আমার কোনও কাজে লাগে না। যদি সম্ভব হয়, টাকাটা যাজককে দেবেন। আর বলবেন আমার জন্য যেন একটু প্রার্থনা করে।'

বললাম বুড়োর অনুরোধ আমি রক্ষা করব। তারপর উন্মাদের মত সাহসে ভর করে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কাউন্ট ভিজিটরদের সঙ্গে কখন দেখা করেন?'

'আমার প্রভু ভিজিটরদের সঙ্গে কখনও দেখা করেন না।'

'কিন্তু প্রাসাদে মাঝেমধ্যে আসেন নিশ্চয়? সারাটা সময় নিশ্চয় ভল্টের মধ্যে শুয়ে থাকেন না।'

'সাধারণত রাতের বেলা এক/দুই ঘণ্টার জন্য তিনি হলরুমে এসে বসেন। মাঝে মাঝে ব্যাটলমেন্টে (প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দুর্গের ছাদ) হাঁটাহাঁটি করেন।'

'তা হলে আজ রাতে আবার আসছি আমি,' বললাম আমি। 'আমি হিজ এক্সেলেন্সির কাছে আমার শ্রদ্ধা জানাতে চাই।'

দরজা খোলার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে ছিল বুড়ো, ফিরে নিস্তেজ চোখ জোড়া আমার চোখে রেখে বসল, 'সূর্যাস্তের পরে ক্যালডেনস্টাইনে ভুলেও পা বাড়াবেন না। তা হলে এমন কিছু হয়তো দেখবেন, ভয়ে উড়ে যাবে আত্মা।'

'ভূত-প্রেতের গল্প শুনিয়ে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা কোরো না,' রূঢ় গলায় বললাম আমি। তারপর গলার স্বর উঁচু করে ঘোষণার সুরে বললাম, 'আজ রাতে আমি কাউন্ট ভন ক্যালডেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে আসব।'

বৃদ্ধ ভৃত্য ঝড়াং করে খুলে ফেলল দরজা, জীর্ণ ভবনের ভেতরে ঢুকে পড়ল ঝলমলে সূর্যের আলো।

'যদি আসেন উনি আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবেন,' বলল সে, 'তবে মনে রাখবেন প্রাসাদে প্রবেশ করলে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় আসবেন। কিছু ঘটে গেলে তার জন্য আমি দায়ী থাকব না।'

তিন

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসতেই আমার সমস্ত সাহস বাষ্পের মত উবে গেল। ভাবলাম প্রীস্টের পরামর্শমত ক্যালডেনস্টাইন ছেড়ে চলে গেলেই বুঝি ভাল করতাম। কিন্তু আমার একগুঁয়ে স্বভাব আমাকে যেতে দিল না। যেহেতু শপথ করেছি আবার প্রাসাদ দেখতে যাব, কেউই আমাকে এখন বাধা দিতে পারবে না। রাত নামার অপেক্ষায় থাকলাম। কোথায় যাচ্ছি সে ব্যাপারে সরাইঅলাকে কিছুই বললাম না। রওনা হয়ে গেলাম প্রাসাদের পথে। খাড়া ঢাল বেয়ে উঠতে লাগলাম ওপরে। এখনও চাঁদ উঁকি দেয়নি আকাশে, সিঁড়িতে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে

পথ "লছি। ভাঙা ঘণ্টার শিকল ধরে টান দিতেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। বৃদ্ধ ভৃত্য দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। আমাকে স্বাগত জানানোর ভঙ্গিতে 'বাউ' করল। 'হিজ এক্সেলেন্সি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলেছেন, সার,' বলল সে। 'ক্যালডেনস্টাইন প্রাসাদে আসুন– প্রবেশ করুন সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়।'

এক সেকেণ্ডের জন্য দ্বিধায় ভুগলাম। কেউ যেন আমাকে সাবধান করে দিচ্ছিল সময় থাকতে এখান থেকে কেটে পড়াই উত্তম। কিন্তু বুকে সাহস নিয়ে আমি দরজার গোবরাটে পা রাখলাম।

উনুনে দাউ দাউ জ্বলছে কাঠ-কয়লার আগুন, থমথমে, অন্ধকার বাড়িটিতে উষ্ণ এবং প্রাণবন্ত একটা পরিবেশ এনে দিয়েছে। রুপোর মোমবাতিদানে জ্বলছে মোম। দেখলাম ডায়াসের টেবিলে এক লোক বসে আছেন। আমাকে এগুতে দেখে তিনি ডায়াস থেকে নেমে এলেন অভ্যর্থনা করতে।

ক্যালডেনস্টাইনের কাউন্টের চেহারার বর্ণনা কীভাবে দেব। অস্বাভাবিক লম্বা মানুষটা, চেহারায় ফুটে আছে অপার্থিব বিবর্ণ একটা ভাব। তাঁর চুল কুচকুচে কালো, হাত জোড়া নমনীয় তবে আঙুলগুলো সরু এবং হাতের নখ খুবই বড়। তবে কাউন্টের চোখ জোড়া আমাকে সবচেয়ে আকর্ষণ করল। তাঁর চোখ যেন লাল অঙ্গারের মত জ্বলছে, চোখের তারায় খেলা করছে অগ্নিশিখা। তিনি বেশ আন্তরিকভাবে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

'আমার ক্ষুদ্র বাড়িতে আপনাকে সুস্বাগতম, সার,' অনেক খানি নিচু হয়ে 'বাউ' করলেন তিনি। 'আপনাকে রাজকীয়ভাবে অভ্যর্থনা জানাতে পারিনি বলে দুঃখ প্রকাশ করছি। কারণ আমরা এখানে খুব সাধারণ জীবনযাপন করি। তা ছাড়া অতিথিদের আগমনও ঘটে খুব কম। আপনি কষ্ট করে এসেছেন বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি।'

আমি বিনীত ভঙ্গিতে, নম্রস্বরে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি লম্বা টেবিলের একটি আসন আমাকে দেখিয়ে দিলেন বসার জন্য। টেবিলের ওপরে একটি ডিকান্টার এবং মদের গ্লাস।

'ওয়াইন চলবে তো?' আহ্বান করলেন কাউন্ট। কানায় কানায়

ভরে দিলেন গ্লাস। অত্যন্ত দুর্লভ মদ। কিন্তু আমি একা একা ডিনার খাব ভাবতেই অস্বস্তি লাগছিল। 'আপনার সঙ্গে যোগ দিতে পারছি না বলে ক্ষমা করবেন,' বললেন তিনি আমার অস্বস্তি লক্ষ করে। 'আমি একেবারেই ওয়াইন পান করি না।' হাসলেন তিনি। লক্ষ করলাম তাঁর সামনের দুটো দাঁত বাকিগুলোর চেয়ে লম্বা এবং ধারালো।

'এখন বলুন,' বলে চললেন তিনি। 'আপনি এই পাণ্ডববর্জিত এলাকায় কী জন্য এসেছেন? ক্যালডেনস্টাইনের বর্ণনা কোনও ম্যাপেও পাবেন না। আর বলেছিই তো আমাদের এখানে মেহমান খুব কম আসে।'

বললাম আমি হণ্টন টুরে বেরিয়েছি। ফারকিরচেনে যেতে পথ ভুলে এখানে এসে পড়েছি। শুনে মৃদু গলায় হেসে উঠলেন কাউণ্ট। আবার ঝিলিক দিল শ্বদন্তের মত ধারালো দাঁত জোড়া।

'আপনি তা হলে ক্যানডেনস্টাইনে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় এসেছেন আমাকে এক নজর দেখবেন বলে?'

বারবার 'নিজের ইচ্ছা' কথাটা শুনতে ভাল্লাগছিল না। 'নিজের ইচ্ছায় আসব না তো পরের ইচ্ছায় আসব?' তীক্ষ্ণ গলায় ছুঁড়ে দিলাম প্রশ্নটি।

'পুরানো, বন্ধ দিনগুলোতে এ প্রাসাদে লোকজন ধরে নিয়ে আসা হত তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে। আমরা এখন শুধু সেসব মেহমানকেই স্বাগত জানাই যে স্বইচ্ছায় এ প্রাসাদ দেখতে আসে।'

কথা বলছি, একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল আমার। মনে হচ্ছিল আমার শরীর থেকে সমস্ত শক্তি নিংড়ে নিয়ে আমাকে ছোবড়া বানিয়ে ফেলা হয়েছে। ভীষণ বমি বমি লাগছিল। কাউণ্ট কী সব জায়গা নিয়ে কথা বলছিলেন কিন্তু তাঁর কণ্ঠ যেন ভেসে আসছে বহু দূর থেকে। কাউণ্ট যে তাঁর অঙ্গারের মত চোখে আমার দিকে স্থির, কটমটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সে ব্যাপারে আমি পূর্ণ সচেতন। মনে হলো চোখ জোড়া যেন দ্রুত বড় হয়ে উঠছে। আমি যেন দুটো আগুনের কুয়োয় তাকিয়ে আছি। তারপর, কেন জানি না, হঠাৎ হাতের ধাক্কায় মদের গ্লাসটা উল্টে গেল। ঝনঝন শব্দে ভাঙল কাঁচ, চমকে উঠলাম। সেই সঙ্গে ফিরে পেলাম বোধবুদ্ধি। কাঁচের ভাঙা একটা টুকরোয় কেটে গেছে

হাত, সরু ধারায় রক্ত বেরিয়ে জমা হতে লাগল টেবিলে। আমি রুমাল খুঁজছি, পকেট থেকে রুমাল বের করতে যাচ্ছি, দারুণভাবে শিউরে উঠলাম ভৌতিক এক চিৎকারে। চিৎকারটা ভল্টের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল। চিৎকারটা এসেছে কাউণ্টের মুখ থেকে, তিনি ঝট্ করে উবু হলেন। তারপর জিভ বের চেটে চেটে খেতে লাগলেন টেবিলে গড়িয়ে পড়া রক্ত। এমন গা গোলানো দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি। ধস্তাধস্তি করে টেবিল ছাড়লাম, পা বাড়ালাম দরজায়।

কিন্তু আতংকে আমার শরীর অবশ, কয়েক কদম হাঁটার পরেই কাউণ্ট পেছন থেকে আমাকে ধরে ফেললেন, বসিয়ে দিলেন আমার শূন্য আসনে।

'মাই ডিয়ার, সার,' বললেন তিনি। 'আমার অসৌজন্যতা অনুগ্রহ করে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমার পরিবারের সদস্যরা রক্ত-দর্শনে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন, উল্টোপাল্টা আচরণ করেন। আপনার কাছে ব্যাপারটা পাগলামি মনে হলেও এটাই সত্যি যে রক্ত দেখলে আমরা মাঝে মাঝে বুনো জন্তুর মত হয়ে যাই। একজন অতিথির সামনে এরকম অসৌজন্যমূলক আচরণ করা আমার মোটেই উচিত হয়নি বেশ বুঝতে পারছি। তবে আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমি এই উন্মাদনা জয় করার চেষ্টা চালাচ্ছি এবং এ কারণেই মানুষজনের সামনে আমি খুব একটা আসি না।'

কাউণ্টের ব্যাখ্যা যুক্তিসংগত মনে হলেও ব্যাপারটা আমার কাছে রীতিমত ঘেন্নার লাগল—বিশেষ করে যখন দেখতে পাচ্ছি তাঁর মুখে এখনও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত লেগে রয়েছে।

'আমি বোধহয় আপনার ঘুমের দেরি করিয়ে দিচ্ছি, ইয়োর এক্সেলেন্সি,' বললাম আমি, 'তা ছাড়া আমারও সরাইখানায় ফেরা দরকার।'

'ওহ্ নো, মাই ফ্রেণ্ড,' বললেন কাউণ্ট। 'রাত আমার খুব প্রিয় সময়। রাতের প্রহরগুলো খুব উপভোগ করি আমি। আপনি যদি আজ রাতটা আমার এখানে কাটিয়ে যান, কৃতজ্ঞবোধ করব। আমার বাড়িটি বড্ড নির্জন, নিজেকে খুব একা একা লাগে। আপনার সঙ্গ আমার জন্য

উপভোগ্য হয়ে উঠবে। দক্ষিণ টারেটে আপনার জন্য একটি রুম প্রস্তুত করা হয়েছে। আর কাল, কে জানে আরও অতিথির হয়তো আগমন ঘটতে পারে।'

ভয়ের শীতল একটা হাত চেপে ধরল আমার হৃৎপিণ্ড, আমি টলতে টলতে সিধে হলাম, বিড়বিড় করে বললাম, 'আমাকে যেতে দিন...আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে এক্ষুণি গাঁয়ে ফিরতে হবে।'

'আজ রাতে আর আপনার গাঁয়ে ফেরা হচ্ছে না। কারণ ঝড় আসছে আর ঝড়ের সময় পাহাড়ি পথটা খুব বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।'

এ কথা বলে কাউন্ট একটি জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। জানালা খুলে হাত তুললেন আকাশের দিকে। তাঁর আদেশ পালন করতেই যেন অনুগত ভৃত্যের মত মেঘ চিরে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ, গুরুগম্ভীর বজ্রপাতের আওয়াজে থরথর করে কেঁপে উঠল প্রাসাদ। তারপর ঝমঝম শব্দে নামল বৃষ্টি, পাহাড় থেকে আর্তনাদ তুলে ছুটে এল ঝড়ো হাওয়া। জানালা বন্ধ করে টেবিলে ফিরলেন কাউন্ট।

'দেখতেই তো পাচ্ছেন, বন্ধু,' খিকখিক হাসলেন তিনি, 'এমন বিরূপ আবহাওয়ায় গাঁয়ে ফিরতে পারবেন না। আজ রাতে এই গরীবের সামান্য আতিথেয়তা গ্রহণ না করা ছাড়া আপনার কোনও উপায় নেই।'

লাল টকটকে চোখ মেলে আমার দিকে তাকালেন কাউন্ট। আবার মনে হলো আমার শরীর থেকে সমস্ত শক্তি চুষে ছিবড়ে নেয়া হচ্ছে। কাউন্টের কণ্ঠ এখন ফিসফিসানিতে পরিণত হয়েছে, ভেসে আসছে যেন বহু দূর থেকে।

'চলুন আমার সঙ্গে। আপনার ঘর দেখিয়ে দিই। আজ রাতে আপনি আমার মেহমান।'

টেবিল থেকে একটি মোম তুলে নিলেন তিনি। আর আমি সমাহিতের মত তাঁর পেছন পেছন এগোলাম। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটি খালি করিডরে ঢুকলাম, তারপর আমাকে নিয়ে আসা হলো বিষণ্ন চেহারার একটি ঘরে। এ ঘরে আসবাব বলতে শুধু চার খুঁটিঅলা একটি প্রাচীন খাট।

'আরামে ঘুমান,' অশুভ একটা চাউনি চকচক করে উঠল কাউন্টের

চোখে। 'কাল রাতে আপনি আরও দু'একজন সঙ্গী পাবেন।'

আমাকে একা রেখে চলে গেলেন কাউন্ট। তাঁর পেছনে ভারী দরজাটি বন্ধ হলো সশব্দে। শুনলাম টেনে দেয়া হলো হুড়কো। শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু জড়ো করে দরজায় ধাক্কা দিলাম আমি। কিন্তু খুলল না বাইরে থেকে বন্ধ দরজা। এ ঘরে এখন আমি বন্দি। কীহোল দিয়ে ভেসে এল কাউন্টের ঘরঘরে গলার হাসি।

'হ্যাঁ, কাল রাতে আপনি আরও সঙ্গী পাবেন। ক্যালডেনস্টাইনের প্রভুরা তাঁদের পূর্ব-পুরুষের বাড়িতে আপনাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাবেন।'

মস্ত ঠাট্টা করা হয়েছে এমন ভঙ্গিতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন কাউন্ট। তাঁর হাসি ক্রমে মিলিয়ে যেতে লাগল। ভূতুড়ে হাসির তীব্রতা আর প্রচণ্ড ক্লান্তিতে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লাম আমি অজ্ঞান হয়ে।

চার

কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরল আমার। কোনমতে শরীরটাকে টেনে নিয়ে এলাম বিছানায়, শুয়ে পড়তেই আবার সবকিছু আঁধার হয়ে এল চোখে। যখন জ্ঞান ফিরল, গরাদঅলা জানালা দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকছে ঘরে। কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে তিনটা বাজে। বিকেল। দিনের বেশিরভাগ সময় ফুরিয়ে গেছে।

এখনও দুর্বল শরীর তবু টলতে টলতে গেলাম জানালার ধারে। উঁচু উঁচু পাহাড়ি ঢাল ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না। মানব বসতির কোনও চিহ্ন দেখতে পেলাম না। গুঙিয়ে উঠলাম আমি, ফিরে এলাম বিছানায়। প্রার্থনা করার চেষ্টা করলাম। মেঝেয় আলোর ফালির উজ্জ্বলতা ক্রমে ফিকে হয়ে আসছে, দেখতে দেখতে আরও ম্লান হয়ে এল। তারপর ঘনাতে লাগল ছায়া, একসময় শুধু জানালার আবছা কাঠামোটা ফুটে রইল মেঝেতে।

আঁধার আমার ভেতরে নতুন একটা ভয় এনে দিল। আমি বিছানায় শুয়ে ঘামতে লাগলাম। এমন সময় পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম করিডোরে, একটু পরেই খুলে গেল আমার ঘরের দরজা, মোমবাতি হাতে ভেতরে ঢুকলেন কাউন্ট।

'সারাদিন দেখা করতে পারিনি বলে ক্ষমা চাইছি,' বললেন তিনি। 'কিন্তু নিজের প্রয়োজনেই দিনের বেলা ঘর ছেড়ে বেরোই না আমি। এখন আপনাকে খানিকটা সঙ্গ দিতে পারব বলে আশা করি।'

উঠে বসতে চাইলাম কিন্তু আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সাড়া দিল না। নিষ্প্রাণ হাসি হেসে কাউন্ট আমার কোমর এক হাতে জড়িয়ে ধরে আমাকে শিশুর মত বিছানা থেকে নামিয়ে আনলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে রেখেই এগিয়ে চললেন করিডোর ধরে, তারপর সিঁড়ি বেয়ে হলঘরে ঢুকলাম দু'জনে।

টেবিলে তিনটে মোম জ্বলছে। কাউন্ট আমাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। একটু পরে অন্ধকারে চোখ সয়ে এল। দেখলাম টেবিলে আরও দু'জন লোক। মোমের ম্লান আলোয় তাদের চেহারা দেখে আঁতকে উঠলাম। ওগুলো মরা মানুষের মুখ, চেহারায় ফুটে আছে শয়তানির ছাপ, কাউন্টের মত এদের চোখ দিয়েও বিচ্ছুরিত হচ্ছে একই নারকীয় আলো।

'আমার চাচা এবং কাজিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই,' বললেন কাউন্ট। 'ইনি অগাস্ট ভন ক্যালডেনস্টাইন আর উনি ফিওডর ভন ক্যালডেনস্টাইন।'

'কিন্তু,' অস্ফুট আওয়াজ বেরুল আমার গলা থেকে, 'আমি শুনেছি কাউন্ট ফিওডর ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে মারা গেছেন।'

তিন ভয়ংকর দানব ঠাঠা করে হেসে উঠল, যেন মস্ত ঠাট্টা করেছি আমি। অগাস্ট ঝুঁকে এলেন সামনের দিকে, আমার মাংসল হাতে চিমটি কাটলেন।

'ওর গা ভর্তি রক্ত,' খিকখিক হাসলেন তিনি। 'ওর রক্ত পান করার জন্য আমার আর তর সইছে না, লুডভিগ।'

এ কথা শুনে নিশ্চয় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম কারণ চোখ

মেলে দেখি আমি টেবিলে শুয়ে আছি আর ওরা তিনজন ঝুঁকে রয়েছেন আমার ওপর। ফিসফিস করছেন তাঁরা।

'গলাটা কিন্তু আমার,' বললেন কাউন্ট। 'আমি ওর মেহমানদারি করেছি। কাজেই গলার ভাগ আমি পেতেই পারি।'

'ওটার ভাগ আমার পাওয়া উচিত ছিল,' বিড়বিড় করলেন অগাস্ট। 'কারণ আমি বয়সে তোমাদের জ্যেষ্ঠ। তা ছাড়া বহুদিন আমি কিছু খাইনি। তবে আমি বুকের অংশটা খেতে রাজি আছি।'

'আমি পা খাব,' কর্কশ গলায় বলে উঠল তৃতীয় দানব। 'পায়ে সব সময় লাল, তাজা রক্ত ভরা থাকে।'

জানোয়ারের মত জিভ বের করে ঠোঁট চাটছে ওরা, সাদা শ্বদন্ত চকচক করছে মোমের আলোয়। হঠাৎ একটা শব্দ চূর্ণ করে দিল নিশীথ নৈঃশব্দ। প্রাসাদের ঘণ্টা বাজছে। দানবগুলো চট করে ফিরে গেল ডায়াসে। অসন্তোষে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। আবার বাজল ঘণ্টা। অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে কেউ ঘণ্টা বাজিয়েই চলেছে।

'আমরা এ মুহূর্তে কিছু করতে পারব না,' চেঁচিয়ে উঠলেন কাউন্ট। 'আপনারা জলদি যে যার জায়গায় ফিরে যান।'

ছোট দরজা দিয়ে মাটির নীচের চ্যাপেলে অদৃশ্য হয়ে গেল কাউন্টের দুই সঙ্গী। কাউন্ট একা দাঁড়িয়ে রইলেন ঘরের মাঝখানে। আমি উঠে বসলাম টেবিলে, জোরাল একটি কণ্ঠ শুনতে পেলাম মূল দরজার ওপাশে। 'ঈশ্বরের নামে দরজা খোলো,' বজ্র নির্ঘোষে বলল কণ্ঠটি।

যেন দারুণ একটা শক্তি সম্মোহন করেছে কাউন্টকে, এমনভাবে তিনি এগিয়ে গেলেন দরজায়, টেনে খুলে ফেললেন হুড়কো। সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা মেরে খুলে ফেলা হলো কপাট; দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন চার্চের সেই প্রীস্ট। রুপোর একটি বাক্স হাতে, তাতে ঘড়ির মত কী যেন একটা লটকানো। তাঁর সঙ্গে সেই সরাইঅলা। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে বেচারার। দু'জন পা বাড়াল হলঘরে, কাউন্ট ওদেরকে দেখে দ্রুত পিছু হঠলেন।

'গত দশ বছরে এ নিয়ে অন্তত তিনবার আমি ঈশ্বরের শক্তি নিয়ে

হাজির হয়েছি তোমার সামনে,' চেঁচিয়ে উঠলেন প্রীস্ট। 'তিনবার এই পাপের ঘরে পবিত্র আচার অনুষ্ঠানের চেষ্টা করা হয়েছে। তোমাকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, অভিশপ্ত মানব। তুমি তোমার কুৎসিত কবরে ফিরে যাও, শয়তানের সৃষ্টি। ফিরে যাও, আমি হুকুম করছি।'

কাউন্টের গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা গোঙানি বেরিয়ে এল, তিনি ছোট দরজার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। প্রীস্ট চলে এলেন টেবিলের কাছে, আমাকে নীচে নামতে সাহায্য করলেন। সরাইঅলা ফ্লাস্কে নিয়ে আসা ব্রাণ্ডি জোর করে খাইয়ে দিল আমাকে। সিধে হয়ে দাঁড়াতে রীতিমত কসরত করতে হলো আমাকে। 'বোকা ছেলে,' বললেন প্রীস্ট। 'আপনাকে এখানে আসতে মানা করেছিলাম। নিষেধ শোনেননি। দেখলেন তো পরিণাম কী হলো।'

প্রাসাদ থেকে আমাকে বেরুতে সাহায্য করল ওরা, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম নীচে। কিন্তু সরাই পর্যন্ত পৌঁছুতে পারলাম না, তার আগেই নেতিয়ে পড়লাম ওদের কাঁধে। অস্পষ্ট মনে পড়ে ওরা আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে, তারপর আর কিছু মনে নেই। জেগে দেখি সকাল হয়ে গেছে।

প্রীস্ট এবং সরাইঅলা ডাইনিংরুমে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমরা একসঙ্গে নাশতা খেতে বসলাম।

'এ সবের অর্থ কী, ফাদার?' নাশতা দেয়ার পরে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আপনাকে তো আগেই বলেছি,' জবাব এল। 'ক্যার্লডেনস্টাইনের কাউন্ট একজন ভ্যাম্পায়ার। সে মানুষের রক্ত পান করে বেঁচে আছে। বছর আটেক আগে আপনার মত এক স্বাস্থ্যবান যুবক প্রাসাদ দেখতে গিয়েছিল। তার ফিরতে দেরী হচ্ছিল দেখে আমি প্রাসাদে যাই এবং দানবটার কবল থেকে তাকে রক্ষা করি। বছর দুই পরে এক মহিলা গিয়েছিল কাউন্টের সঙ্গে দেখা করতে। সে ঈশ্বর কিংবা শয়তান কিছুই বিশ্বাস করত না। আমি আবার বাধ্য হই কিছু পবিত্র আচার অনুষ্ঠান করতে। মহিলা প্রাণে বেঁচে যায়। আমি দেখলাম আপনি পাহাড়ে

উঠেছেন এবং নিরাপদে ফিরেও এসেছেন। দেখে স্বস্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু গতকাল সকালে হেনরিখ এসে বলল আপনি সরাইখানায় নেই। তার শংকা, আপনি কাউন্টের কবলে পড়েছেন। রাত নামা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি। তারপর প্রাসাদের উদ্দেশে যাত্রা করি। বাকি ঘটনা আপনি জানেন।'

'আপনারা আমাকে ওই দানবগুলোর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই।'

'দানবগুলো!' বিস্মিত শোনাল প্রীস্টের কণ্ঠ। 'কাউন্ট ছাড়া আরও কেউ আছে নাকি ওখানে? কাউন্টের ভৃত্য তার মনিবের মত রক্ত-পিপাসু নয় বলেই জানি।'

'না। ভৃত্যের কথা বলছি না আমি। ওখানে আরও দু'জন ছিল—অগাস্ট এবং ফিওডর।'

'অগাস্ট এবং ফিওডর,' বিড়বিড় করলেন প্রীস্ট। 'তা হলে আমরা যা ভেবেছি তার চেয়েও ভয়ংকর ব্যাপার ঘটছে ওখানে। অগাস্ট মারা যায় ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে, ফিওডর ১৬৪৫-এ। দানবীয় কর্মকাণ্ডে কেউ কারও চেয়ে কম নয়। কিন্তু ওরাও যে জিন্দালাশ হয়ে বেঁচে আছে তা কল্পনাও করিনি।'

'ফাদার,' গলা কেঁপে গেল সরাইঅলার। 'আমরা এখানে আর নিরাপদ নই। ভ্যাম্পায়ারের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য কর্তৃপক্ষকে খবর দিলে হয় না?'

'কর্তৃপক্ষ আমাদের কথা শুনে বিশ্বাস করবে না। হাসাহাসি করবে,' বললেন ফাদার। 'আমাদের নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে আইন।'

'কী করতে চাইছেন?' জানতে চাইলাম আমি।

'অবিশ্বাস্য এবং ভয়ংকর কিছু একটা করব নিশ্চয়ই। সে দৃশ্য দেখার মত সাহস কি আপনার হবে?'

আমি প্রীস্টকে বললাম উনি আমার জীবন বাঁচিয়ে চিরঋণী করেছেন। তাঁকে সাহায্য করতে পারলে ধন্য মনে করব নিজেকে।

'আমি চার্চে যাব কয়েকটা জিনিস নিয়ে আসতে,' বললেন প্রীস্ট। 'তারপর দু'জনে মিলে রওনা হব প্রাসাদের উদ্দেশে। তুমি আমাদের

সঙ্গে যাবে, হেনরিখ?'

একটু ইতস্তত করল সরাই মালিক। তবে চেহারা দেখে বুঝতে পারছিলাম প্রীস্টের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে তার। বলল, 'অবশ্যই যাব, ফাদার।'

দুপুর নাগাদ আমরা আমাদের রহস্যময় মিশনে বেরিয়ে পড়লাম। গত রাতে প্রাসাদের দরজা হাট করে খুলে রেখে গিয়েছিলাম। ওটা এখনও তেমনি খোলা। হলঘরে কেউ নেই। ট্যাপেস্ট্রির নীচের দরজা খুলে, হাতে শক্তিশালী ইলেকট্রিক মশাল নিয়ে নোনা ধরা সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে নামতে লাগলেন প্রীস্ট। দাঁড়িয়ে পড়লেন চ্যাপেলের দরজার সামনে, আলখেল্লার পকেট থেকে বের করলেন তিনটে ক্রুশ এবং পবিত্র পানির একটি পাত্র। আমাদের দু'জনকে একটি করে ক্রুশ দিলেন, দরজায় ছিটালেন হলি ওয়াটার। তারপর খুলে ফেললেন দরজা। আমরা গুহায় প্রবেশ করলাম।

বেদীর দিকে প্রায় ফিরে চাইলেনই না প্রীস্ট, কদম বাড়ালেন ভল্টের এণ্ট্রান্সে। বন্ধ। প্রচণ্ড এক লাথিতে ছুটিয়ে ফেললেন ছিটকিনি। লাফিয়ে এল বদ গন্ধের এক ঝলক হাওয়া, তীব্র ঝাপটা দিল নাকে। বিশ্রী গন্ধটার ধাক্কায় আমরা পিছিয়ে এলাম। ক্রুশটা সামনের দিকে তুলে ধরে গলা ফাটালেন প্রীস্ট, 'ঈশ্বর, পুত্র এবং হলি গোস্টের নামে বলছি,' তিনি আমাদেরকে নিয়ে সমাধিস্থলে নেমে এলেন। ওখানে কী অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য সে ব্যাপারে কোনও ধারণাই ছিল না আমার। তবে সমাধিস্থলের ভেতরের দৃশ্য দেখে রীতিমত আঁতকে উঠলাম। ঘরের মাঝখানে, কাঠের একটি শবযানে শুয়ে আছেন ক্যালডেনস্টাইনের কাউণ্ট। তাঁর লাল ঠোঁটজোড়া হাসির ভঙ্গিতে ফাঁক হয়ে আছে, অশুভ চোখ জোড়া অর্ধনিমীলিত।

ভল্টের কুলুঙ্গিগুলোতে বেশ কয়েকটি কফিন। প্রতিটি কফিন খুলে পরীক্ষা করলেন। তারপর আমাদেরকে ইশারা করলেন দু'টি কফিন মেঝেতে নামিয়ে রাখতে। একটি কফিনের গায়ে নাম লেখা অগাস্ট ভন ক্যালডেনস্টাইন, অপর কফিনে ফিওডর। এত ভারী, তিনজনে মিলে কফিন নামাতে গিয়েও ঘেমে গেলাম। মনে হলো কাউণ্ট আমাদেরকে

সারাক্ষণই আধবোজা চোখে লক্ষ করছেন। যদিও বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করছেন না তিনি।

'এখন,' ফিসফিস করলেন প্রীস্ট, 'সবচেয়ে ভীতিকর কাজটি করব।'

বড় একটি স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে প্রথম কফিনের ঢাকনা খুলতে লাগলেন। নাটবল্টু খোলার পরে আলগা হয়ে গেল ঢাকনা। প্রীস্ট ঢাকনা তুলে ধরলেন। ভেতরে শুয়ে আছেন কাউন্ট অগাস্ট। গত রাতে যে চেহারায় তাঁকে দেখেছি অবিকল সেরকম চেহারায় রয়েছেন তিনি। লাল টকটকে চোখ জোড়া বিস্ফারিত, চকচক করছে। মন্দ আর অশুভ সত্তা যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে চোখ থেকে। বদ একটা গন্ধ ঘিরে রেখেছে কফিন। প্রীস্ট দ্বিতীয় বাক্স খোলার কাজে লেগে গেলেন। কাউন্ট ফিওডর ফ্যাকাসে সাদা মুখে শুয়ে আছেন কফিনে। জট পাকানো চুলে প্রায় ঢেকে আছে চেহারা।

তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড শুরু করলেন প্রীস্ট। আমাদের কাছ থেকে ক্রুশগুলো নিলেন তিনি, শরীর দুটোর বুকের ওপর সোজা করে রাখলেন। তারপর ল্যাটিন ভাষায় মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন। মন্ত্র পড়া শেষ করে পিছিয়ে গেলেন প্রীস্ট, কফিনে ছিটিয়ে দিলেন মন্ত্রঃপূত পবিত্র পানি। জিন্দালাশের গায়ে পানির ফোঁটা পড়তেই শরীর দুটো মোচড় খেতে লাগল অব্যক্ত যন্ত্রণায়, তারপর ফুলতে শুরু করল, এমনভাবে ফুলে ঢোল হলো যেন এখনই বিস্ফোরিত হবে। তারপর আমাদের চোখের সামনে ওগুলো পরিণত হলো ধূলিকণায়। আমরা নীরবে কফিনের ঢাকনা নামিয়ে দিলাম, কুলুঙ্গিতে রেখে এলাম ওগুলো।

'আমরা এখন ক্ষমতাশূন্য হয়ে পড়েছি,' বললেন প্রীস্ট। 'লুডভিগ ভন ক্যালডেনস্টাইন মৃত্যুকে জয় করেছে–আমরা অন্যদের যেভাবে ধ্বংস করেছি একে সেভাবে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। আমরা শুধু প্রার্থনা করতে পারি, ঈশ্বর নিজে এই দানবকে শাস্তি দেবেন, তাকে তার পৈশাচিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখবেন।'

প্রীস্ট তৃতীয় ক্রুশটি কাউন্টের বুকে রেখে ল্যাটিন মন্ত্র আওড়াতে

আওড়াতে গায়ে ছিটিয়ে দিলেন পবিত্র পানি। তারপর আমরা চলে এলাম ভল্ট থেকে, দরজা বন্ধ করছি, এমন সময় ঠকাশ করে কী যেন পড়ল মেঝেতে। কাউন্টের বুক থেকে ক্রুশটা পিছলে পড়ে গেছে নিশ্চয়।

আমরা প্রাসাদ অভিমুখে চললাম। বাইরের বাতাস আগে কখনও এত মধুর লাগেনি। তবে সেই বৃদ্ধ ভৃত্যকে দেখতে পেলাম না কোথাও। আমি বললাম লোকটাকে খুঁজে বের করা দরকার। সে উত্তর টারেটে থাকে, মনে পড়ল আমার। সেখানে গিয়ে দেখলাম ছাদের বিমে রশি লাগিয়ে নিথর শরীরে ঝুলছে সে। কমপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা আগে মারা গেছে বুড়ো। প্রীস্ট ভৃত্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করলেন।

ক্যালডেনস্টাইন প্রাসাদের রহস্য নিয়ে এখনও হতবিহ্বল আমি। কাউন্ট অগাস্ট এবং কাউন্ট ফিওডরের মৃত্যুর পরে ভ্যাম্পায়ার হয়ে যাওয়ার ঘটনা রূপকথার গল্প বলে মনে হলেও কাউন্ট লুডভিগের অমর হয়ে থাকার ব্যাপারটি আমার কাছে অবিশ্বাস্য এবং উদ্ভট লাগছে। প্রীস্ট বিষয়টি আমার কাছে ব্যাখ্যা করেননি, তবে আমার ধারণা, কাউন্ট হয়তো আশপাশের মানুষজনের রক্ত পান করে এতদিন ধরে বেঁচে আছেন।

ক্যালডেনস্টাইনে শেষ রাতে আমার ঘরের জানালা খোলার পরে প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম একটি টারেটের মাথায় কালো একটি শরীর দাঁড়িয়ে আছে। ফুরফুরে জোছনার আলোয় চেনা যাচ্ছিল ছায়াময় ওই কাঠামোটা—স্বয়ং ক্যালডেনস্টাইনের ভূ-স্বামী।

এরপরে আর বলার কিছু নেই। মিউনিখে আমি ফিরে আসি প্রায় কুড়ি দিন পরে। পিটার শ্মিট হাসতে হাসতে বলছিল আমি নিশ্চয় কোনও বাভারিয়ান গ্রামের নীল নয়না সুন্দরীর কবলে পড়ে গিয়েছিলাম। এজন্যই ফিরতে দেরি। আসল কারণটা বললাম না যে তিনজন মানুষ, প্রাকৃতিক কারণেই বহু আগে যাদের মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল তাদের জন্যই আমার ফিরতে দেরি হয়েছে।

লনমোয়ার ম্যান

হ্যারল্ড পারকিটের নিজের লন বা বাগান নিয়ে গর্বের অন্ত ছিল না। লনের ঘাস কাটার জন্য পাঁচ ডলার দিয়ে সে একটি ছেলে রেখেছিল। লনমোয়ার বা ঘাস কাটার যন্ত্র দিয়ে ছেলেটি চমৎকার ঘাস কাটত। কিন্তু গত বছরে, অক্টোবরের মাঝামাঝিতে ঘটে গেল মারাত্মক এক দুর্ঘটনা। লনের ঘাস কাটার সেটা ছিল শেষ ঋতু। ঘাস কাটার যন্ত্র দিয়ে ঘাস কাটা হচ্ছে, এমন সময় কোথেকে প্রতিবেশী কাস্টনমেয়ারদের কুকুরটা ধাওয়া করে নিয়ে এল স্মিথদের বেড়ালটাকে। দিশেহারা বেড়াল তাল সামলাতে না পেরে, ছুটতে গিয়ে ঢুকে পড়ল ঘাস কাটা যন্ত্রের নীচে। মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল জানোয়ারটার শরীর।

ভয়াবহ এ দৃশ্য দেখে হ্যারল্ডের মেয়ে এলিসিয়া এমন জোরে লাফিয়ে উঠল, হাতের আইসক্রিম ছিটকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল নতুন জাম্পারটা। তবে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হলো হ্যারল্ডের বউ কার্লার। রক্ত সে এমনিতেই সইতে পারে না, চোখের সামনে জলজ্যান্ত একটা প্রাণীকে যন্ত্রের নীচে পড়ে কচুকাটা হতে দেখে দাঁত-কপাটি লেগে গেল তার। অজ্ঞান হয়ে পড়ল কার্লা।

লনের ঘাস কাটা মাথায় উঠল হ্যারল্ডের। বউকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। ওই বছর আর ঘাস কাটা হলো না। পরের বছর, জুলাই'র মাঝামাঝিতে লনের ঘাস এমন বড় হয়ে উঠল যেন একটা জঙ্গল। ওই জঙ্গলে সুযোগ পেলেই লুকিয়ে পড়ল ডন স্মিথের চার বছরের মেয়ে জেনি, যখনই তাকে সকালের নাস্তায় দুধ কিংবা দুপুরে স্পিনাচ খাওয়ার জন্য জোরাজুরি করা হলো।

জুলাই'র শেষের দিকে একদিন, বারান্দায় বসে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলাচ্ছে হ্যারল্ড, নজর আটকে গেল পাস্ট টাইম কলামে। ওখানে লেখা: *বাগানের ঘাস কাটা হয়। ন্যায়সঙ্গত দামে।* ৭৭৬-২৩৯০।

হ্যারল্ড ফোন করল এ নাম্বারে। ভেবেছিল আবেগশূন্য গলার কোনও মহিলার গলা শুনবে, চেঁচিয়ে ডাকছে তার ছেলেকে। বদলে ভেসে এল প্রাণবন্ত, পেশাদার একটি কণ্ঠ, 'প্যাস্টোরাল গ্রিনারি অ্যান্ড আউটডোর সার্ভিসেস...আপনার কোনও সাহায্যে আসতে পারি?'

সতর্কতার সাথে হ্যারল্ড জানতে চাইল প্যাস্টোরাল গ্রিনারি কীভাবে তার সাহায্যে আসতে পারে। রেট জিজ্ঞেস করল সে, কণ্ঠটি যে পারিশ্রমিক দাবি করল তা হ্যারল্ডের নাগালের বাইরে নয়।

হ্যারল্ড ফোন রেখে দিল। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। বারান্দায় গিয়ে বসল। রেডিও ছেড়ে তাকিয়ে রইল লনের দিকে। কার্লা মেয়েকে নিয়ে তার মা'র বাসায় গেছে। বাড়িতে একা হ্যারল্ড। মা-মেয়ে ফিরে আসার আগে প্যাস্টোরাল গ্রিনারির লোকটা এসে লন সাফ করে দিয়ে গেলে বেশ হয়।

বিয়ারের ক্যান খুলল হ্যারল্ড। পান করল। ছুঁড়ে ফেলে দিল ক্যান। লম্বা লম্বা ঘাসের দিকে তাকিয়ে রইল অলস চোখে। ঝিমুনি এসে গেল ওর।

আধঘণ্টা পর ডোর বেলের শব্দে ঘুমের চটকা ভেঙে গেল হ্যারল্ডের। চেয়ার ছেড়ে সিধে হলো। গেল দরজা খুলতে। ঘাসের ছাপঅলা ডেনিস ওভারঅল পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়িতে। একটা টুথপিক চিবুচ্ছে। লোকটা মোটা। জীর্ণ, নীল ওভারঅল ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে ভুঁড়ি। হ্যারল্ডের মনে হলো লোকটা পেটের মধ্যে বাস্কেটবল লুকিয়ে রেখেছে।

'বলুন?' জিজ্ঞেস করল হ্যারল্ড পারকিট, এখনও ঘুম যায়নি চোখ থেকে।

দাঁত বের করে হাসল লোকটা, মুখের এক কোনা থেকে আরেক কোনায় টুথপিকটা ঠেলে নিয়ে গেল জিভ দিয়ে। লোকটার গা থেকে

ঘাস, মাটি আর তেলের অদ্ভুত একটা গন্ধ আসছে।

'প্যাস্টোরাল পাঠিয়েছে আমাকে,' উৎফুল্ল গলা তার, খ্যাচখ্যাচ করে কুঁচকি চুলকাল। 'আপনিই বোধহয় ফোন করেছিলেন, না?' দাঁত বের হয়েই আছে।

'অ। লনের ব্যাপারে আপনি এসেছেন?' হ্যারল্ড বোকা বোকা চোখে চেয়ে আছে।

'জি, আমি।' লোকটা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল। 'আমি লনমোয়ার ম্যান।'

হ্যারল্ড একপাশে সরে দাঁড়াল। লোকটা চট করে ঢুকে পড়ল ঘরে। লিভিংরুম এবং কিচেন পার হয়ে চলে এল পিছনের বারান্দায়।

'পিছনের লনের দশা তো একেবারে ছ্যাড়াব্যাড়া,' হ্যারল্ড বলল লোকটাকে। 'অনেকদিন ঘাসটাস কাটা হয়নি কি না।'

'ও নিয়ে আপনি কিস্যু ভাববেন না, ভায়া,' চোখে কৌতুক ফুটিয়ে বলল লোকটা। 'ঘাস যত লম্বা হবে ততই ভাল। এখানকার মাটি খুবই উর্বর।' বলে এক লাফে বাড়ির ভিতরে আবার ঢুকে পড়ল সে। পা বাড়াল সামনের হলঘরে। ভুরু কুঁচকে তাকে দেখল হ্যারল্ড। তারপর বসল একটা চেয়ারে। ঝিমুতে লাগল আবার। হঠাৎ বিকট শব্দে ঘুম ছুটে গেল হ্যারল্ডের। লাফ মেরে উঠল। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গেল চেয়ার। এক ছুটে চলে এল সদর দরজায়। তাকাল। বাইরে একটা লব্ঝঝড়ে সবুজ রঙের ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে, গায়ে লেখা প্যাস্টোরাল গ্রিনারি ইনক। বিকট গর্জনের আওয়াজ এবার বাড়ির পিছন দিক থেকে আসছে। ওদিকে ছুটল হ্যারল্ড। পেছনের বারান্দায় এসে জমে গেল মূর্তির মত।

মোটা লোকটা সঙ্গে যে লাল রঙের ঘাস কাটার যন্ত্রটি নিয়ে এসেছিল ওটা নিজে নিজে চলছে। কেউ ঠেলছে না ওটাকে। যন্ত্রটার পাঁচ হাতের মধ্যে কেউ নেই। হ্যারল্ড পারকেটের পিছনের লনের ঘাস সাফ করে চলেছে ওটা। রীতিমত চিৎকার ছাড়ছে যন্ত্রটা, নীল তেলতেলে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বাতাসে কাটা ঘাসের কেমন টকটক গন্ধ।

তবে হ্যারল্ডকে আতঙ্কিত করে তুলেছে লনমোয়ার ম্যান।

লোকটা পরনের সমস্ত জামাকাপড় খুলে ফেলেছে। গায়ে সুতোগাছটিও নেই। পাখির খাবার রাখা হয় যে পাত্রে, লনের মাঝখানে, ওটার ওপর জামাকাপড়গুলো ভাঁজ করে রাখা। সারা গায়ে ঘাস মাখা, ন্যাংটো লোকটা ঘাস কাটার যন্ত্রের হাত পাঁচেক পিছনে, হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। কচমচ করে ঘাস চিবুচ্ছে সে। চিবুক বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে সবুজ রস, ফোলানো পেট বেয়ে নামছে। যন্ত্রটা মোড় ঘোরার সময় লোকটা অশ্লীল ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠছে।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল হ্যারল্ড পারকিট। 'থামো বলছি!'

কিন্তু লোকটা হ্যারল্ডের কথা শুনেছে বলে মনে হলো না। কচমচ করে ঘাস চিবিয়েই চলেছে।

এমন সময় ছুঁচোটাকে দেখতে পেল হ্যারল্ড। ঘাস কাটার যন্ত্রের সামনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আতঙ্কে বোধহয় লোপ পেয়ে গেছে বুদ্ধি, কোথায় যাবে বুঝে উঠতে পারছে না। থরথর করে কাঁপছে। লোকটাও দেখতে পেল প্রাণীটাকে। বিকট, জান্তব একটা চিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে। পরমুহূর্তে যন্ত্রটা হামলা চালাল ছুঁচোটার উপর। ধারাল ফলার আঘাতে শতখণ্ড হয়ে গেল ছুঁচো। লোকটা ওদিকে একবার তাকিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হলো আবার।

লনমোয়ার ম্যান হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে ঘাস খেতে খেতে। আতঙ্কে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে হ্যারল্ড। দেখছে লোকটার বিরাট ভুঁড়ি বেলুনের মত ফুলে উঠছে। সে হাত বাড়িয়ে ছিন্নভিন্ন ছুঁচোর লাশ টেনে নিল। ঘাস চিবানোর মত ছুঁচোর মাংস চিবোতে লাগল সে এবার।

আর সহ্য করতে পারল না হ্যারল্ড। হড়হড় করে বমি করে দিল। দুনিয়া হঠাৎ ধূসর হয়ে এল, বুঝতে পারল চেতনা হারাচ্ছে। বারান্দায় দড়াম করে পড়ে গেল সে...

কেউ ধরে ঝাঁকাচ্ছে ওকে। কার্লা। হয়তো বাসন মেজে রাখেনি হ্যারল্ড কিংবা ময়লার ঝুড়ি পরিষ্কার করেনি। তাই রেগে গেছে কার্লা। দুঃস্বপ্ন দেখছিল হ্যারল্ড। ঝাঁকির চোটে দুঃস্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে এল সে। চাইল চোখ মেলে। প্রথমেই দেখতে পেল একজোড়া শ্বদন্ত। কিন্তু

কার্লার তো শ্বদন্ত নেই। তা ছাড়া এই দাঁত দুটিতে লোমও গজিয়েছে—সবুজ লোম। দেখতে অনেকটা ঘাসের মত।

'ওহ্, মাই গড!' বলল হ্যারল্ড।

'আপনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, ভায়া।' কানে ভেসে এল লনমোয়ার ম্যানের গলা। ঝুঁকে আছে সে হ্যারল্ডের উপর, লোমঅলা দাঁত বের করে হাসছে। ওর ঠোঁট এবং থুতনিতেও লোম ঝুলছে। সারা মুখেই লোম। চারদিক পুরো নিস্তব্ধ। ঘাস কাটার যন্ত্রের শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে বসল হ্যারল্ড। তাকাল নিশ্চল যন্ত্রের দিকে। লনের সমস্ত ঘাস চমৎকারভাবে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখার আর দরকার নেই। লনমোয়ার ম্যানের দিকে ফিরল হ্যারল্ড। লোকটা এখনও নগ্ন, ঠোঁটের কোনা দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে সবুজ রস।

'এসব কী?' কাতর গলায় জানতে চাইল হ্যারল্ড।

লনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দেখাল লোকটা। 'এটা? বেশ, এটা নতুন একটা জিনিস যা করার জন্য বস চেষ্টা চালাচ্ছেন। আমরা এক ঢিলে দুই পাখি মারছি, ভায়া। আমাদের কাজের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছি, আমাদের অন্যান্য কাজগুলো করার জন্য টাকার জোগাড়ও চলছে। মাঝে মাঝে আপনার মত দু'একজন বোকাসোকা খদ্দের পেয়ে যাই। বস সবসময়ই স্যাক্রিফাইস করতে রাজি।'

হ্যারল্ড কিছু বলল না। মাথায় একটা শব্দ ঘুরপাক খাচ্ছে—স্যাক্রিফাইস। মনশ্চক্ষে দেখতে পেল বিবর্ণ লাল ঘাস কাটার যন্ত্রটি থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে ছুঁচোর খণ্ডিত দেহ।

ধীরে ধীরে সিধে হলো সে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত বুড়োদের মত। মনে পড়ল এলিসিয়ার ছড়ার একটা লাইন। অস্ফুটে বলল, 'ঈশ্বর ঘাসের মঙ্গল করুন।'

লনমোয়ার ম্যান তার আপেল রঙা উরুতে চাপড় বসাল। 'ঠিক বলেছেন, ভায়া। আপনার কথাটা আমি লিখে রাখব অফিস ফাইলে, অফিসে গিয়েই।'

'আচ্ছা,' খিড়কির দুয়ারে পা বাড়াল হ্যারল্ড, মুখে চেষ্টাকৃত হাসি ফোটাল। 'আপনি বরং অফিসে চলে যান। আমি একটু ঘুমাব—'

'শিওর, বাডি,' বলল লনমোয়ার ম্যান, ভারী শরীর নিয়ে সিধে হলো। হ্যারল্ড লক্ষ করল লোকটার পায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় আঙুলের মাঝখানে অনেকটা চেরা, দেখাচ্ছে পশুর খুড়ের মত।

'প্রথম প্রথম ব্যাপারটা দেখে চমকে যায় সকলেই,' বলল লোকটা।

'আপনি এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন,' ধূর্ত চোখে পরখ করল সে হ্যারল্ডকে। 'বস নতুন প্রতিভার অন্বেষণ করছেন সবসময়ই।'

'বস?' অস্পষ্ট গলায় শব্দটি পুনরাবৃত্তি করল হ্যারল্ড।

'প্যান। প্যান হলেন বস।' বলে হেসে উঠল লনমোয়ার ম্যান, তারপর এক লাফে নেমে পড়ল লনে। বিকট গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ির চারপাশে গড়িয়ে যেতে লাগল।

'প্রতিবেশীরা—' হ্যারল্ড বলতে গেল, ওকে হাত তুলে বাধা দিল লনমোয়ার ম্যান, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল ঘরের কোণে।

বাড়ির সামনে এসে নেকড়ের মত গর্জন ছাড়ল লনমোয়ার ম্যান।

ওদিকে তাকাল না হ্যারল্ড, ঘরে ঢুকল সে। এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে, থাবা মেরে তুলল রিসিভার। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ডায়াল করল।

'সার্জেন্ট হল,' বলল ওপাশের কণ্ঠ।

মুক্ত কানে একটা আঙুল ঢুকিয়ে হ্যারল্ড বলল, 'আমার নাম হ্যারল্ড পারকিট। আমার ঠিকানা ১৪২১ ইস্ট এণ্ডিকট স্ট্রিট। আমি ফোন করেছি...' কী বলবে হ্যারল্ড? বলবে প্যান নামে এক লোকের অধীনে কাজ করতে এসেছে জানোয়ারের খুড়অলা পায়ের একটা লোক, সে হ্যারল্ডের লনের দফারফা করছে?

'বলুন, মিস্টার পারকিট?'

'আমি অশ্লীল শরীর প্রদর্শনের অভিযোগ করতে চাই।'

'অশ্লীল শরীর প্রদর্শনের অভিযোগ?' পুনরাবৃত্তি করল সার্জেন্ট হল।

'হ্যাঁ। এক লোক এসেছে আমার লন পরিষ্কার করতে। সে পুরো ন্যাংটো। আপনি দয়া করে এখানে কাউকে পাঠাবেন?'

‘ঠিকানা কী বললেন? ১৪২১ ওয়েস্ট এণ্ডিকট?’ জিজ্ঞেস করল সার্জেণ্ট হল।

‘ইস্ট!’ চেঁচিয়ে উঠল হ্যারল্ড। ‘ফর গডস শেক–’

‘আপনি বলছেন সে পুরো নগ্ন? তার পুরুষাঙ্গও দেখতে পাচ্ছেন?’

হ্যারল্ড কথা বলতে চাইল। কিন্তু বলতে পারল না। ঘাস কাটার যন্ত্রটা আবার চালু হয়েছে। শব্দ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, যেন গর্জন করে ফাটিয়ে ফেলবে দুনিয়া।

‘আপনি কী বলছেন কিছুই শুনতে পাচ্ছি না,’ বলল সার্জেণ্ট। ‘আপনার ফোনের লাইনে বোধহয় কোনও সমস্যা হয়েছে–’

দড়াম শব্দে খুলে গেল সামনের দরজা।

চরকির মত ঘুরল হ্যারল্ড। লনমোয়ার ম্যানের ঘাস কাটার প্রকাণ্ড যন্ত্র দরজা দিয়ে ঢুকছে ভিতরে। পিছনে লনমোয়ার ম্যান। এখনও নগ্ন। ভয়ঙ্কর লাগছে দেখতে। মাথার বেসবল ক্যাপটা একটা আঙুলের ডগায় রেখে বনবন করে ঘোরাচ্ছে লোকটা।

‘কাজটা ঠিক করলেন না, ভায়া,’ বলল সে ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে।

‘হ্যালো? হ্যালো, মিস্টার পারকিট–’

ঘাস কাটার যন্ত্রটাকে সামনে বাড়তে দেখে আতঙ্কিত হ্যারল্ডের অবশ হাত থেকে খসে পড়ল টেলিফোন। কার্লার নতুন মোহাক কার্পেট কাটতে কাটতে এগিয়ে আসছে ওটা।

সাপ যেন সম্মোহন করেছে ব্যাঙকে, সেই দৃষ্টিতে হ্যারল্ড তাকিয়ে আছে যন্ত্রটার দিকে। ওটা কফি টেবিলটাকে নিখুঁতভাবে টুকরো করে ফেলল। চেয়ারের উপর দিয়ে লাফিয়ে পিছন দিকে চলে এল হ্যারল্ড, চেয়ারটাকে শরীরের সামনে ঢালের মত ধরে পিছু হটতে লাগল রান্নাঘরের দিকে।

‘এতে কোনও লাভ হবে না, ভায়া,’ উদাস গলায় বলল লনমোয়ার ম্যান। ‘খামোকা জিনিসপত্র আরও নষ্ট হবে। আপনি যদি শুধু একটু দেখিয়ে দিতেন আপনার সবচেয়ে ধারাল ছুরিখানা কোথায় রাখেন। আপনার এই স্যাক্রিফাইসটা তা হলে যন্ত্রণাহীন হতে পারত...’

হ্যারল্ড লোকটার গায়ে ছুঁড়ে মারল চেয়ার। সে তখন দরজায়

ছিটকিনি লাগাচ্ছে। ঠাস করে লোকটার গায়ে বাড়ি খেল চেয়ার। ক্রুদ্ধ গর্জন ছাড়ল লনমোয়ার ম্যান। হ্যারল্ড বারান্দার স্ক্রিন ডোর দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল, নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। শুনল পিছনে হুংকার ছাড়ছে হিংস্র লোকটা। ছুটে আসছে। লনের উপর দিয়ে তীর বেগে ছুটল হ্যারল্ড। পিছনে ধাওয়া করল লনমোয়ার ম্যান। লোকটা কতটুকু পিছনে আছে দেখার জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল হ্যারল্ড এবং নিজেই নিজের পায়ে বেধে পড়ে গেল ধপাশ করে।

শেষমুহূর্তে হ্যারল্ড দেখল ঘাস কাটার যন্ত্রটা ওর দিকে এগিয়ে আসছে, ধারাল ব্লেডগুলো যেন লোকটার শ্বদন্ত, হিংস্র ভঙ্গিতে হাসছে। যন্ত্রের পিছনে লনমোয়ার ম্যান। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে।

'পুরো নরক একটা,' শেষ ছবিটি তোলা হলে মন্তব্য করল লেফটেন্যান্ট গুডউইন। সাদা পোশাক পরা দুই লোকের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। তারা হাতের ঝুড়ি নিয়ে লন ধরে হাঁটা দিল।

'ঘণ্টা দুই আগে লোকটা বলেছিল তার লনে কে এক নগ্ন লোক এসে হামলা করেছে।'

'তাই নাকি?' জিজ্ঞেস করল পেট্রলম্যান কুলি।

'হ্যাঁ। ক্যাস্টনমেয়ার নামে এক লোকের ধারণা ওই লোকটা আর কেউ নয়, হ্যারল্ড পারকিট নিজে। হতে পারে, কুলি। এটা ঘটাও বিচিত্র নয়।'

'সার?'

'প্রচণ্ড গরমে হয়তো লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল,' মাথার তালুতে টোকা দিল লেফটেন্যান্ট গুডউইন। 'সিজোফ্রেনিয়া।'

'জি, সার।' বলল কুলি।

'লোকটার শরীরের বাকি অংশ কোথায়?' জানতে চাইল এক সাদা কোট।

'বার্ডবাথে।' বলল গুডউইন।

'বার্ডবাথ!' বিস্ময় সাদা কোটের কণ্ঠে।

'হুঁ।' বলল গুডউইন। পেট্রলম্যান বার্ডবাথের দিকে তাকাল। সাথে

সাথে ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা।

'সেক্স ম্যানিয়াক,' বলল লেফটেন্যান্ট গুডউইন। 'কোনও সন্দেহ নেই।'

'প্রিন্ট?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইল কুলি।

'ফুলপ্রিন্টের কথা জানতে চাইছ নিশ্চয়।' নতুন কাটা ঘাসের দিকে তাকাল গুডউইন।

গলা দিয়ে ভোঁতা একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল কুলির।

লেফটন্যান্ট গুডউইন পকেটে হাত ঢোকাল, পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়ে ঘুরল। 'পৃথিবী মাথা পাগলা, উন্মাদ লোকে ভর্তি। এ কথা ভুলো না, কুলি। প্রচুর সিজোফ্রেনিক আছে। ল্যাবের ছেলেটা বলল কেউ পারকিটকে তার লিভিংরুমে তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল ঘাস কাটার যন্ত্র হাতে। ভাবতে পারো?'

'না, সার।' বলল পেট্রলম্যান কুলি।

গুডউইন হ্যারল্ড পারকিটের তকতকে লনের দিকে তাকাল। তারপর বাড়িটি একপাক ঘুরে দেখার জন্য পা বাড়াল। তাকে অনুসরণ করল কুলি। তাদের পিছনে, বাতাসে ভেসে রইল নতুন কাটা ঘাসের মিষ্টি একটা গন্ধ।

———

টাটরাসের আতঙ্ক

পোল্যাণ্ডের টাটরা পবর্তমালার কোলে, একটি গাঁয়ে বাস করত এক বনপাল। তার সঙ্গে থাকত তার স্ত্রী এবং দুই ছেলেমেয়ে। চারজনের এ সংসার নিয়ে বেশ সুখেই ছিল বনপাল। সন্তানদেরকে সে পাগলের মত ভালবাসত।

গরমের সময় ছেলেমেয়েরা তাদের দুই কামরার কাঠের কুটিরের সামনে খেলা করত। তাদের মা জানালার ধারে বসে উল বুনত কিংবা সেলাই করত। আর তাদের বাবা যেত বিশাল পাইনের জঙ্গলে কাজ করতে। প্রকাণ্ড পবর্তশ্রেণীর পুব থেকে উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ সবুজ গহীন অরণ্য।

গ্রীষ্মের পরে এবারে একটু তাড়াতাড়িই যেন হামলা চালাল শীত। ছোট হয়ে এল দিন। অন্ধকার গ্রাস করল দিনগুলোকে। শোঁ শোঁ শব্দে বইতে লাগল হাড় কাঁপানো বাতাস, তুষারে ঢেকে গেল ওদের বাড়ি, জমিন এবং গাছপালা।

প্রথমে পুকুর তারপর নদীর পানি জমে বরফ হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে বেড়ে চলল ঠাণ্ডা। সঙ্গে অনবরত তুষারপাত তো রয়েইছে। একদিন জঙ্গল থেকে ভেসে এল দল বেঁধে ঘুরে বেড়ানো নেকড়ের ডাক। দিনে সংক্ষিপ্ত আলোয় বাইরের কাজ সারতে লাগল পুরুষরা। বনপাল কিংবা গাঁয়ের অন্য কেউ একা একা বনে ঢুকতে সাহস পেত না। সন্ধ্যার আগেই তারা ফিরে আসে বাড়িতে, দরজা-জানালা শক্তভাবে বন্ধ করে বসে থাকে ঘরে।

শীতের কামড় বাড়ছে সেই সঙ্গে বেড়ে চলছে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া ক্ষুধার্ত নেকড়ের পালের ডাক। খরগোশ, চলাফেরায় অসমর্থ বুড়ো ভল্লুক, শেয়াল কিংবা আহত কোন হরিণ তাদের

শিকারের প্রধান লক্ষ্য। তবে এসব শিকার না মিললে তারা গাঁয়ে ঢোকারও সাহস করে। ভোরের প্রথম ম্লান আলোয় গ্রামবাসী বরফের গায়ে নেকড়ের পায়ের ছাপ ফুটে থাকতে দেখে। তারা দ্রুত সেলার কিংবা বাইরের ঘরে গিয়ে খোঁজ নেয় গৃহপালিত শূকর, হাঁস এবং মুরগিগুলোর সংখ্যা কমে গেছে কিনা।

প্রতি বছরই দীর্ঘ শীত থুত্থুরে বুড়ো কিংবা অল্প বয়েসী কোনও বাচ্চাকে কেড়ে নেয়।

বসন্ত আসি আসি করছে, এমন একদিনে, মেয়েটির বয়স তখন নয়, ছেলেটির সাত, তাদের মা অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং মারা গেল।

'এখন আমাদের কী হবে?' স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে বাড়ি ফিরে বিলাপ করে উঠল বনপাল।

'আমি তোমার থলেতে খানিকটা রুটি আর ছাগলের দুধের পনির ভরে দিয়েছি,' বলল ছোট মেয়েটি। 'কুড়োলটা নিয়ে জঙ্গলে যাও। আগে যেভাবে কাজ করছিলে সেভাবে করে যাও। আমি আর আমার ভাই মিলে তোমার সেবা করব, ঘর-বাড়ির যত্ন নেব, দেখে রাখব হাঁস-মুরগিগুলোকে।'

এতটুকুন বাচ্চা এতসব কাজ করতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দিহান বনপাল। তবু মেয়ের কথা মত কাজ করল সে। বুকে পাথর চেপে সে জঙ্গলে গেল, কাজ শেষে শোকাকুল হৃদয়ে ফিরে এল বাড়িতে। দরজা খুলেই দেখল মেঝে চমৎকারভাবে ঝাঁট দেয়া, পরিপাটি করে পেতে রাখা হয়েছে বিছানা, লোহার কড়াইয়ে টগবগ ফুটছে সুপ। সে তার বাচ্চাদেরকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদল।

'তোমাদের মা'র অভাব জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত অনুভব করব আমি,' বলল বনপাল। 'তবে আমরা একসঙ্গে থাকলে আশা করি খুব বেশি কষ্ট আমাদের হবে না।'

'মা'র জন্য আমার খুব কষ্ট হয়,' রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে বড় বোনকে বলল ছোট ভাই। 'আমার কি সবসময় এরকম কষ্ট হতে থাকবে?'

'এক সময় কষ্টটা কমে যাবে,' ভাইকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল

বোন।

মা হারানোর বেদনা প্রকটভাবে বিঁধছিল দু'ভাইবোনের বুকে, তবে বাড়িতে এবং মাঠে দু'জনকেই কঠোর পরিশ্রম করতে হয় বলে আস্তে আস্তে শোকের মাত্রাটা কখন কমে আসছিল ওরা নিজেরাও টের পাচ্ছিল না। আগের মত আর তীক্ষ্ণভাবে মায়ের অনুপস্থিতি ওরা অনুভব করে না।

শীতকালের জন্য ওরা ওদের মা'র মতই প্রস্তুতি নিল। শাকপাতা, বেরী, মাশরুম ইত্যাদি জোগাড় করে রাখল, নিজেদের ভাগের মাংস শুকিয়ে রাখল লবণ দিয়ে। শীতের সময় তেমন শিকার নাও মিলতে পারে এ আশঙ্কায় গ্রামবাসীদের কয়েকজন উদ্যোগী হয়ে কয়েকটি পশুপাখি জবাই করে পড়শীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে।

গাঁয়ের পুকুর থেকে শেষ কার্প মাছটি ধরা হলো, জমাট বাঁধার আগেই নদী থেকে তুলে আনা হলো শেষ ট্রাউট মাছটি। আবার হাড় কাঁপানো বাতাস ধেয়ে এল উত্তর থেকে, সঙ্গে ঘূর্ণায়মান তুষার। ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল রাতের বেলা ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগল গাঁয়ের দিকে খিদের জ্বালায়।

এক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল বনপালের। গাঁয়ের ধর্মযাজক মীটিং ডেকেছিলেন অভিভাবকহীন একটি পরিবারকে কে দেখাশোনা করবে তার ব্যবস্থা নিতে। বনপাল ঘরে ঢুকে দেখে তার ছেলেমেয়েরা রান্নাঘরের চুল্লির সামনে খড়ের মাদুরে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। সে বাচ্চাদের গায়ে কম্বল টেনে দিল। তারপর নিঃশব্দে ঢুকল নিজের ঘরে। বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ একটা অস্বস্তি নিয়ে ঘুম ভেঙে গেল বনপালের। উঠে বসল বিছানায়। বুঝতে পারছে না ঘরে এত আলো এল কোত্থেকে। ভারী কাঠের দরজায় খিল এঁটে দিলেও সে ছোট্ট জানালাটির খড়খড়ি নামাতে ভুলে গেছে। খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো আসছে। থৈ থৈ আলোয় ভাসছে ঘর।

বনপাল জানালা দিয়ে চাঁদের দিকে তাকাল। তার মনে হচ্ছে এত

বড় এবং সুন্দর চাঁদ সে জীবনে দেখেনি। হঠাৎ আলোর রশ্মি বাধা পেল, প্রকাণ্ড একটা মাথা উদয় হয়েছে জানালার সামনে, জোছনা ঢুকতে পারছে না। রোমশ, সাদা মাথাটা বিশালদেহী কোন জানোয়ারের। লাল জ্বলজ্বলে একজোড়া চোখ, সে প্রথমে একটি থাবা রাখল জানালার গরাদে, তারপর অপরটি। বনপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে বুঝতে পেরে জানোয়ারটা মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে মৃদু গলায় ডাক ছাড়ল।

'নেকড়ে!' আঁতকে উঠল বনপাল। লাফ মেরে নেমে এল বিছানা থেকে, দ্রুত পরে নিল জামা কাপড়, পায়ে গলাল বুটজুতো, তারপর একহাতে লণ্ঠন, অপর হাতে বন্দুক নিয়ে পা বাড়াল রান্নাঘরে। দরজার ভারী হুড়কো খুলতে যাচ্ছে, শব্দে জেগে গেল তার মেয়ে।

'কী হয়েছে, বাবা?' ঘুম ঘুম চোখে জানতে চাইল সে।

'নেকড়ে। বিরাট সাদা একটা নেকড়ে। আমি বাইরে যাচ্ছি। ওটাকে গুলি করে মারব। তুমি দরজা বন্ধ করে দাও, মা।'

'বাবা, এত রাতে তোমাকে একা বাইরে যেতে দেব না,' কেঁদে উঠল ছোট মেয়েটি। কিন্তু তার বাবা তার নিষেধ মানল না। সে লণ্ঠন হাতে চিৎকার করতে করতে ছুটল। ঢুকে পড়ল বনভূমিতে। দূর থেকে ভেসে এল নেকড়ের ভৌতিক ডাক। গা ছমছম করে উঠল ছোট মেয়েটির।

দরজার হুড়কো লাগিয়ে দিল সে। তারপর রান্নাঘরের জানালার খড়খড়ি তুলে চাঁদনী রাতটাকে দেখল ভয়ে ভয়ে। জানালার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হলো না তার। ফিরে এল বিছানায়।

বাবার অপেক্ষায় বসে রইল।

জঙ্গলের অনেক ভেতরে চলে এসেছে বনপাল। এদিকে পাইন গাছের শাখায় জমাট বেঁধে রয়েছে তুষার, জমিনের বরফের গায়ে ফুটে আছে সাদা নেকড়েটার পায়ের ছাপ। এতক্ষণ চাঁদের আলোয় পরিষ্কার চেনা যাচ্ছিল পদচিহ্ন কিন্তু অরণ্যের গভীরে, বরফ মোড়া গাছের ঘন ডাল জড়াজড়ি করে চাঁদোয়া তৈরি করে জোছনার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করে

রেখেছে। ফলে বনপালের এখন শুধু লণ্ঠনই ভরসা।

নেকড়েটাকে দেখে রীতিমত মুগ্ধ বনপাল। এত সুন্দর এবং এমন ধবধবে সাদা নেকড়ে জীবনে দেখেনি সে। ওটাকে আবার চোখে পড়লেই গুলি করবে। জানোয়ারটা নিশ্চয় দল নেতা।

দল নেতা?

দাঁড়িয়ে পড়ল বনপাল।

সে এসব কী করছে? রাতের বেলা, বাচ্চাগুলোকে বাড়িতে একা রেখে সে বেরিয়েছে নেকড়ে শিকারে। এটা পাগলামি ছাড়া আর কী?

ঝট্ করে ঘুরল বনপাল, ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে, আকুল আর্তনাদ ভেসে এল কানে।

'বাঁচাও! বাঁচাও! আমাকে কেউ রক্ষা করো।'

'কে?' চেঁচাল বনরক্ষক। 'কোথায় তুমি?'

'আমি এখানে। আপনার কাছেই। দয়া করে আমাকে বাঁচান।'

হাতের লণ্ঠনটি উঁচু করে ধরতেই একটি নারীমূর্তি দেখতে পেল বনপাল। গাছের পাশে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। গায়ে ফারের পোশাক।

'নেকড়ে–নেকড়ের দল সারারাত আমার পিছু নিয়েছে। আমাকে বাগে পেলে আর ছাড়বে না। আমাকে বাঁচান, বনপাল। আমাকে রক্ষা করার কেউ নেই। নেকড়ের দল হামলা করলে আমি কিছুই করতে পারব না।'

বিস্মিত বনপাল ক্রন্দনরতা নারীটিকে দেখছে। তারপর তাকাল চারপাশে। কান পাতল। সাদা নেকড়েটাকে দেখতে পাচ্ছে না কোথাও, তার সাড়াশব্দও নেই। বনপালের ভয়ে পালিয়ে গেছে?

'আমার সঙ্গে আসুন,' গম্ভীর গলায় বলল বনপাল। 'এ জঙ্গল থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরুনো যায় ততই মঙ্গল।' মহিলার হাত ধরে সে ফিরে চলল। মহিলা প্রায় হাঁটতেই পারছে না। বনপালের শরীরের সঙ্গে সে একরকম ঝুলে থাকল।

বাড়ির দরজায় এসে হাঁক ছাড়ল বনপাল। 'বাচ্চারা, দরজা খোলো। আমার সঙ্গে একজন অতিথি আছে।'

কাঠের ভারি হুড়কো টেনে নামানোর শব্দ হলো। খুলে গেল দরজা। মহিলাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল বনপাল।

ক্লান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আগুনের সামনে ধপ করে বসে পড়ল নারী। প্রথমে ফারের কোট খুলল সে, তারপর ফারের হ্যাট। গলানো সোনার মত চুল ছড়িয়ে পড়ল তার কোমর পর্যন্ত।

এদিকে ছোট ছেলেটির ঘুম ভেঙে গেছে। সে দামী পোশাক পরা মহিলার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর সাহস করে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল ঝকঝকে সোনালি কেশরাজি।

'তুমি কি রাজকুমারী?' মহিলার মখমলের গাউনে হাত ছোঁয়াল ছেলেটি।

হাসল মহিলা। হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটির দিকে। ছেলেটি দ্বিধা করছে দেখে সামনে ঝুঁকে ওকে কোলে তুলে নিল সে, হালকা চুম্বন করল কপালে।

'এরা আপনার বাচ্চা?' বনপালের দিকে ফিরল স্বর্ণকেশী। 'খুব সুন্দর শিশু।' মেয়েটির দিকে একটি হাত বাড়িয়ে দিল সে। কিন্তু ছোট মেয়েটি ভয় পেয়ে সরে গেল দূরে, কাছে ঘেঁষল না।

'তুমি কি রাজকুমারী?' পুনরাবৃত্তি করল ছোট ছেলেটি। মাথা নেড়ে করুণ হাসল নারীটি।

'পাশের ঘরে আপনার জন্য বিছানা করা হয়েছে,' জানাল বনপাল। 'আমি এ ঘরের মেঝেতে বাচ্চাদের নিয়ে শোব। আপনার এখানে কোনও ভয় নেই।'

'আমি তেমন ক্লান্ত নই,' বলল নারী। 'আগুনের পাশে বসে থাকতে ভালই লাগছে। বাচ্চারা ঘুমাক। আপনি ইচ্ছে করলে কিছুক্ষণ আমাকে সঙ্গ দিতে পারেন।'

ছেলেটি একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু মেয়েটির চোখে ঘুম নেই। সে চোখ বুজে রইল। শুনল বাবা মহিলার সঙ্গে কথা বলছে।

'আপনার জন্য কিছু করার থাকলে জানাবেন। বলেছেন আপনি রাজকুমারী নন, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে আপনার জন্ম অভিজাত কোন বংশে। গরীবের এ ঘরে আপনার নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছে।'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমার জন্ম ধনী বাবার ঘরে। কিন্তু প্রাসাদে বিত্তবৈভবের মাঝে থাকলেও মানসিক শান্তি কোনোদিন পাইনি।

'আমার বাবা তাঁর এক বয়সী বন্ধুর সঙ্গে আমাকে বিয়ে দেয়ার মতলব করেছিলেন। লোকটাকে আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। বাবাকে অনেক অনুনয় করেছিলাম বিয়েটা ভেঙে দেয়ার জন্য। কিন্তু আমার কথা কানে তোলেননি তিনি। শেষে আমার হবু বরকে টাকা এবং গহনার লোভ দেখাই। বলি আমাকে যেন আমার এক আত্মীয়র বাড়িতে সে দিয়ে আসে। সেই আত্মীয় আমার বাবার চেয়ে অনেক ভাল।

আমার প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল বুড়ো। আমরা রাতের বেলা যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু তুষারঝড়ে হারিয়ে ফেললাম পথ। আমাদের গায়ের গন্ধ পেয়ে পিছু নিল একপাল নেকড়ে। ওরা জানত আমাদের ঘোড়াগুলো বেশি দূরে যেতে পারবে না। রাস্তায় মরে পড়ে থাকবে। একটা ঘোড়া যখন হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে, আমার হবু বর আমাকে জলদি পালিয়ে যেতে বলল। সে ঠেকিয়ে রাখবে নেকড়ের দলকে। কিন্তু আমি পালিয়ে যেতে চাইনি। এমন সময় বাকি ঘোড়াটাও হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আমাদেরকে বহন করা স্লেজটা ডিগবাজি খেল। আমার সমস্ত টাকা পয়সা, গহনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল। আমি ধাক্কার চোটে ছিটকে পড়লাম একটা গাছে, বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখি আমি মাটিতে পড়ে আছি। একা। আমার বর সম্ভবত পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দূরাগত নেকড়ের ডাক শুনে আমার মনে হচ্ছিল...আমার মনে হচ্ছিল... শিউরে উঠল সে। 'আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম।'

'এখন বিছানায় যান। ঘুমিয়ে পড়ুন,' বলল বনপাল। 'আজ রাতে আর কিছু করতে পারব না। তবে আপনার যতদিন ইচ্ছে এ বাড়িতে থাকুন। এখানে আপনার নিরাপত্তার অভাব হবে না।'

সে রাতে সবাই ঘুমিয়ে যাওয়ার পরেও ছোট মেয়েটি অনেকক্ষণ

জেগে রইল। তার প্রচণ্ড ভয় লাগছে। কেন ভয় করছে জানে না।

পরদিন সকালে বনপাল সেই জায়গায় গেল যেখানে গতরাতে মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। খুঁজে বেড়াল হতভাগ্য বর এবং ঘোড়ার মৃতদেহ। কিন্তু ভারি বরফের তলায় চাপা পড়েছে সমস্ত চিহ্ন। জঙ্গলের মধ্যে খোলা একটি জায়গায় এসে নেকড়ে এবং মানুষের পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। বরফের গায়ে কুৎসিত বাদামী দাগ। গতরাতেও এ চিহ্নের রং হয়তো লাল ছিল।

'নেকড়ের পাল আপনার বরকে খেয়ে ফেলেছে আর ডাকাতরা মালপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে।' ফিরে এসে নতুন অতিথিকে খবর দিল বনপাল।

শুনে কেঁদে উঠল মহিলা।

'হায়রে! এখন আমার কাছে টাকা-পয়সা কিছু নেই। কী করে আমি যাব?' কাঁদতে কাঁদতে বলল সে, 'এখন আমার কী হবে?'

'গরম আসা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন। তারপর যেখানে যেতে মন চায়, যাবেন। আমরা আপনাকে সাহায্য করব,' বলল বনপাল। ছোট ছেলেটি জড়িয়ে ধরল মহিলাকে কিন্তু তার বোন মুখ ঘুরিয়ে রাখল। সে বুঝতে পারছে না যে বুড়ো লোকটি এই মহিলার প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে নেকড়ের শিকার হয়েছে তার জন্য মহিলা এক ফোঁটাও চোখের পানি ফেলল না, কাঁদল শুধু টাকা-পয়সার শোকে।

মহিলা থেকে গেল পরিবারটির সঙ্গে। দিনের বেলা সে রান্না করে, ঘর-টর ঝাঁট দেয়, খেলা করে বাচ্চা দুটোর সঙ্গে। ছোট ছেলেটি তাকে পছন্দ করে কিন্তু ছোট মেয়েটি তাকে ভয় পায়। সে নীরবে লক্ষ করে তার বাবা বাইরে থেকে ফিরে এলে মহিলা বাবার পায়ের কাছে বসে গাঁয়ের গল্প শোনে। বাবা সোৎসাহে মহিলাকে নিজের কাজের কথা, পড়শীদের গল্প শোনায়। বলার ভঙ্গিতে একটা গদগদ ভাব থাকে। যেন গল্প শুনিয়ে খুশি করতে চাইছে সুন্দরী মহিলাকে।

বসন্ত এল। গলতে শুরু করল বরফ। মহিলা আবার কান্নাকাটি শুরু করে দিল।

'এখানে কত সুখে ছিলাম আমি,' বলল সে, 'এখন আপনাদেরকে

ছেড়ে চলে যেতে হবে এ দুঃখে বুকটা আমার ফেটে যাচ্ছে। আমার ইচ্ছে করছে না আপনাদেরকে ছেড়ে যেতে। আপনারা তিনজন এখন আমার আত্মার আত্মীয়ের চেয়েও বেশি।'

'তা হলে আমাদের সঙ্গে সারা জীবনের জন্য থেকে যাও,' অনুনয় করল বনপাল। 'আমি তোমাকে বিয়ে করব। তুমি আমার সন্তানদের মা হবে।'

মেয়েটি লক্ষ করল তার বাবা এই মহিলার রূপে এমনই মজেছে, এক বছরও হয়নি তার মা'র কথা একদম ভুলে গেছে। মহিলাকে তার আরও ডর লাগল।

পরদিন বনপাল মহিলাকে নিয়ে গেল পাশের গাঁয়ে, প্রীস্টের কাছে। বিয়ে করবে। কিন্তু বৃদ্ধ প্রীস্ট এমন অসুস্থ, বিছানা থেকে ওঠার জো নেই। আরেকজন প্রীস্টের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের। সে ওদের বিয়ে পড়িয়ে দিতে রাজি হলো।

অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে নিজের কুটিরে ফিরে এল বনপাল। নতুন মা পেয়ে বনপালের ছেলে খুব খুশি। কিন্তু মেয়েটি মোটেই খুশি হলো না। ভয় এবং অস্বস্তি তাকে ঘিরে থাকল।

বিয়ের পরপরই নতুন বউ-এর চেহারা পাল্টে গেল। স্বামী বাড়ি না থাকলে সে কচি ছেলেমেয়ে দুটোকে সারাদিনের জন্য মাঠে পাঠিয়ে দেয় কাজ করতে। আর ওদের বাবা বাড়ি ফেরার পরে ওদের সঙ্গে লোক-দেখানো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে।

'চলো, বাবাকে বলে দিই আমাদের নতুন মা আমাদের সঙ্গে কীরকম দুর্ব্যবহার করছেন,' একদিন বোনকে বলল ভাই। ওদেরকে প্রায়ই কিছু খেতে না দিয়ে কাজে পাঠায় মহিলা।

'এখনই কিছু বলার দরকার নেই। একটু ধৈর্য ধরো,' পরামর্শ দিল বড় বোন। ভাইয়ের হাতে বাসি রুটির একটা টুকরো দিল। এ টুকরোটা ওদের মা শুয়োরের খোঁয়াড়ে ছুঁড়ে মেরেছিল শুয়োরদের খেতে দিতে। মেয়েটি ওটা কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

একরাতে, সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ ঝলমল করছে আকাশে, একটা শব্দে

ঘুম ভেঙে গেল মেয়েটির। দেখল ওদের সৎমা খালি পায়ে, গায়ে শুধু একটা সাদা নাইট গাউন, খুলে ফেলল দরজা। তারপর বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে। গাঁয়ের নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটা দিল।

মেয়েটি ঘুম ভেঙে উঠে বসেছিল, আবার কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়ল। ভোর হওয়ার ঠিক আগে আগে ফিরে এল সৎমা। মেয়েটি দেখল মহিলার হাতে এবং সাদা নাইটগাউনে লাল দাগ। দাগগুলো নির্ঘাত রক্তের। আতংকিত হয়ে সে লক্ষ করল মহিলা নাইট গাউন খুলে ওটা চুল্লির আগুনে পুড়িয়ে ফেলল। তারপর ধুয়ে নিল হাত। হাত ধোয়া গামলার পানি ফেলে দিল বাইরে। শেষে স্বামীর পাশে এসে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে গেল একটু পরেই।

মাসখানেক পরে, আবার আরেক পূর্ণিমার রাতে সৎমা আবার বেরিয়ে পড়ল কুটির থেকে। তবে এবারে ছোট মেয়েটি পিছু নিল তার। গতকাল শুনেছে এক পরিবারের একটি মেয়ে মারা গেছে। চার হপ্তা আগে আরেকটি মেয়ে করুণ মৃত্যুবরণ করেছে।

ছায়ার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ছোট মেয়েটি নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে দ্রুত কদমে চলতে লাগল; সৎমা গির্জার কবরস্থানে পৌঁছে গেছে, প্রকাণ্ড এক খণ্ড কালো মেঘ গ্রাস করল চাঁদ, আঁধারে ঢেলে দিল প্রকৃতি। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার যখন কালো মেঘের অন্তরাল থেকে উঁকি দিল চাঁদ, মেয়েটি দেখল তার সৎমার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সৎমা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড সাদা একটি নেকড়ে।

খানিকক্ষণ নিশ্চল রইল নেকড়ে, তারপর নাক উঁচিয়ে বাতাসে কীসের গন্ধ শুঁকল, এরপর এক লাফে পার হলো গোরস্তানের নিচু দেয়াল, ছুটে গেল সদ্য খোঁড়া একটা কবরের দিকে। থাবা দিয়ে কবরের মাটি খুঁড়তে লাগল।

ভীত, আতংকিত মেয়েটি কাঁপতে কাঁপতে ঘুরে দাঁড়াল, ছুট দিল বাড়ি অভিমুখে, ঘরে এসে সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়। সে রাতে ঘুমের ভান করে জেগে রইল সে। ভোরের আলো ফুটবার খানিক আগে তার সৎমা ফিরে এল বাড়ি, গায়ের সাদা গাউন এবং হাতে যথারীতি লেগে

রয়েছে রক্ত। সে রক্তমাখা গাউন পুড়িয়ে ফেলল, পানির গামলায় ধুয়ে নিল হাত।

ভাইকে ঘটনাটা বললে সে হেসে উঠল।

'তুমি আসলে দুঃস্বপ্ন দেখেছ,' মাঠে কাজ করতে করতে বলল ভাই। 'আমাদের নতুন মা'র সাকুল্যে নাইট গাউন্ আছেই একটা। সে ওটা পোড়াতে যাবে কেন? আর ওই গাউনটা সে রোদে শুকোতে দিয়েছে। ওই দ্যাখো।'

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। তাকাল বাড়ির দিকে। সত্যি, রশিতে সাদা গাউনটা শুকোচ্ছে। এটা কী করে সম্ভব হলো বুঝতে পারছে না সে।

'গাঁয়ের আবার কেউ যদি মারা যায়, আর তার পরের দিন যদি পূর্ণিমা হয়, সেদিন তোমাকে দেখাব সৎমা কী করে,' বলল মেয়েটি।

'আমি জেগে থাকার চেষ্টা করব,' বলল ভাই। 'কিন্তু সারাদিন এত পরিশ্রম করি যে বিছানায় শুলেই ঘুমে জড়িয়ে যায় চোখ। ঠিক সময়ে আমাকে জাগিয়ে দিও।'

মেয়েটি উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল গাঁয়ে আবার কার মৃত্যু-সংবাদ শুনতে হয়। গাঁয়ের কেউ অসুস্থ নেই জেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। মৃত্যু খবরও শুনল না সে। আজ রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারব, পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবল মেয়েটি। সে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু দরজা খোলার শব্দে জেগে গেল। দেখল তার সৎমা ঘর থেকে বেরুচ্ছে। 'উঠে পড়ো! উঠে পড়ো!' ভাইয়ের হাত ধরে ঠেলা দিল বোন। কিন্তু নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে লাগল সারাদিনের পরিশ্রম-ক্লান্ত ভাই।

অগত্যা মেয়েটি একাই বেরিয়ে পড়ল। জনশূন্য রাস্তায় গাছপালার আড়াল নিয়ে এগুতে লাগল সে। কিছুক্ষণ পরে সৎমাকে দেখতে পেল। মহিলা গির্জার গোরস্তানের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

এবারে আর মেঘ ঢেকে দিল না চাঁদ।

মেয়েটি দেখতে পেল সৎমা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলেছে নাইট গাউন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড সাদা নেকড়েয় রূপান্তর ঘটল তার।

মেয়েটি চিৎকার দিল ভয়ে, পিছু হটল দেয়ালে। নেকড়েটা ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটার ওপর।

চিৎকার শুনে গির্জার তত্ত্বাবধায়ক জানালা খুলে তাকাল। 'নেকড়ে!' আর্তনাদ করল সে। 'একটা বিরাট সাদা নেকড়ে একটা বাচ্চাকে হামলা করেছে।' হাতের কাছে রাখা গুলিভরা বন্দুকটা ঝট্ করে তুলে নিল সে। নেকড়ে ততক্ষণে মেয়েটিকে ফেলে দিয়ে নাইট গাউনটা দুই সারি দাঁতের মাঝখানে কামড়ে ধরে গ্রামের দিকে ছুট লাগিয়েছে।

'ওটা বনপালের মেয়ে,' বলল তত্ত্বাবধায়কের বউ। 'মেয়েটাকে বোধহয় নিশিতে পেয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে এদিকে এসে নেকড়ের কবলে পড়েছে।' একটু বিরতি দিল সে। 'ওর বাবাকে কী করে খবরটা দেব?'

মৃত মেয়েটিকে নিজেদের কুটিরে নিয়ে এল তারা। কামড়ের ক্ষতগুলো পরিষ্কার করল। গায়ে সাদা একটা পোশাক পরাল। আড়াআড়িভাবে রাখা দু'হাতের পাঞ্জার ফাঁকে বুনো একটি সাদা ফুল গুঁজে দিল।

পরদিন কবর দেয়া হলো মেয়েটিকে। সৎমা সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে মড়াকান্না জুড়ে দিল। বনপালের চেয়েও বেশি কাঁদল সে। তবে তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বনপালের ছেলে।

সাতদিন বাদে সে গির্জার বিপরীত দিকের কামারশালায় ঢুকল। কামার তখন কাজে ব্যস্ত। 'আমি জানি আপনি গাঁয়ের সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ,' কামারকে বলল ছেলেটি। 'সে জন্য আপনার কাছে বুদ্ধি নিতে এসেছি। শুনেছি শয়তানের শক্তি নাকি আপনাকে সাংঘাতিক ভয় করে।'

'তোমাকে কী বুদ্ধি দেব আমি?' জিজ্ঞেস করল কামার।

'দিন দুই আগে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি,' বলল ছেলেটি। 'দেখলাম আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আর আমার বোন একটা প্রকাণ্ড সাদা ওয়্যারউলফের পিছু নিয়েছে। মায়া নেকড়েটা আমার বোনকে মেরে ফেলল। আর তা দেখে চিৎকার দিয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

গতরাতে আবার একটি স্বপ্ন দেখেছি আমি। আবার দেখলাম পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে। ওয়্যারউলফটা ক্ষুধার্ত হয়ে গির্জার

গোরস্তানে এসে আমার বোনের কবর খুঁড়ে তাকে খেয়ে ফেলল।'

'স্বপ্নের কথা তোমার বাবাকে বলেছ?' জিজ্ঞেস করল কামার।

'বাবা আমার কথা বিশ্বাস করবে না।'

'আর প্রীস্ট?'

'উনি বুড়ো এবং অসুস্থ। আমার কথা তিনি বুঝতে পারবেন না।'

'আমি অনেকদিন ধরে জানি এ গাঁয়ে একটা মন্দ-শক্তি বাস করে।' ধীর গলায় বলল কামার। 'কিন্তু একটু আগেও সেই শয়তানটার পরিচয় জানতাম না। তুমি আমার কাছে এসে ভালই করেছ।

'তোমার বাড়ি ফিরে যাও। চেহারাটাকে শোকাতুর করে রাখবে। আবার যেদিন পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে, জঙ্গলে গিয়ে তোমার বাবাকে তোমার সঙ্গে আসতে বলবে। বলবে তোমার বোনের জন্য আমরা একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান করব। তোমার বাবাকে কিছুতেই বাড়ি যেতে দেবে না।'

'আপনি কি আমার বোনকে রক্ষা করতে পারবেন?'

'কথা দিচ্ছি শুধু তোমার বোনই নয়, আরও অনেককেই আমি রক্ষা করব।'

কামারশালায় যাকে পেল তাদের কারও কাছ থেকে রূপোর মুদ্রা, রূপোর বোতল কিংবা রূপোর বগলস চেয়ে নিল কামার। সবাই কারণটা জানে। তাই আগ্রহ নিয়েই জিনিসগুলো কামারকে দিল তারা। রূপোর এই জিনিসগুলো গলিয়ে একটি সিলভার বুলেট বা রূপোর গুলি তৈরি করল কামার।

পরবর্তী পূর্ণিমা রাতের আগের দিন কামারশালায় হাজির হয়ে গেল গাঁয়ের সকল পুরুষ। তাদের সঙ্গে যোগ দিল বনপাল এবং তাদের ছেলেও। নীরবে তারা খাওয়া দাওয়া করল। তারপর নিঃশব্দে গুণতে লাগল অপেক্ষার প্রহর।

ঘণ্টা দুই পরে একটি নারীকে রাস্তা ধরে ছুটে আসতে দেখল তারা। হাওয়ায় উড়ছে তার ঝলমলে সোনালি কেশ, মাঝে মাঝেই

ঢেকে দিচ্ছে অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা, তার নগ্ন পা এত হালকাভাবে স্পর্শ করছে জমিন, দেখে মনে হয় সে দৌড়াচ্ছে না, উড়ে বেড়াচ্ছে মাটির ওপর দিয়ে।

বনপাল নারীমূর্তিটির কাছে ছুটে যেতে চাইছিল। তাকে বাধা দিল সঙ্গীরা।

'দাঁড়াও,' বিড়বিড় করল তারা। 'দাঁড়াও এবং দেখো কী হয়।'

নারীটি পৌঁছে গেছে গোরস্তানের সামনে। দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর টান মেরে ছিঁড়ে ফেলল পরনের নাইটগাউন। পরমুহূর্তে দেখা গেল তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বিশালাকায় একটি সাদা নেকড়ে, মুখ উঁচু করে বাতাসে গন্ধ শুঁকল সে, তারপর এক লাফে পার হলো কবরস্তানের নিচু দেয়াল। পা বাড়াল বনপালের ছোট মেয়েটির কবরের দিকে। সাতাশ দিন আগে কবর দেয়া হয়েছে মেয়েটিকে।

'এখন?' শান্ত গলায় জানতে চাইল পুরুষরা।

'এখন,' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কামার। কাঁধ বরাবর তুলল বন্দুক, সতর্কতার সঙ্গে স্থির করল লক্ষ্য, গুলি চালাল। সাদা রোমশ চামড়া ভেদ করে জানোয়ারটার হৃৎপিণ্ডে ঢুকে গেল সিলভার বুলেট।

লাফ মেরে মাথা তুলল ওয়্যারউলফ, শেষবারের মত যন্ত্রণাকাতর সুরে ডেকে উঠল, তারপর গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। গাঁয়ের লোকেরা তার কাছে যাওয়ার আগেই নিভে গেল তার প্রাণবায়ু।

'এমন কিছু ঘটার কথা আমি কল্পনাও করিনি,' বলল বনপাল। 'সুন্দরী মেয়েটিকে আমার মনে হয়েছিল কোনও ভাগ্যহতা। আশ্রয় চেয়েছিল বলে ওকে আমার বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম। জানতাম না ও একটা পিশাচী।'

গ্রাম থেকে দূরে একটি নির্জন জায়গায় ওয়্যারউলফটিকে কবর দেয়া হলো। কবরের ওপর চাপিয়ে দেয়া হলো মস্ত একটি পাথর। ছেলেকে নিয়ে বহু দূরের এক গাঁয়ে চলে গেল বনপাল, যেখানে কেউ জানবে না এক ওয়্যারউলফ তার সুখের সংসারটাকে তছনছ করে দিয়েছে।

সোনার হাত

এক মহিলার সোনার একটি হাত ছিল। সড়ক দুর্ঘটনায় সে তার আসল হাতটি হারায়। তবে সোনার হাত পাবার পরে আসল হাতের জন্য তার মোটেই আফসোস ছিল না। মহিলার নাম মোসাম্মৎ খোদেজা খাতুন। তার সোনার হাতটি তৈরি করা হয়েছিল খুবই সুন্দরভাবে। কাঁধ থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত ঝকঝক করত সোনা বাঁধানো হাতটি। মহিলা সোনার আঙুলে দামী পাথরের আংটিও পরত। সোনার হাতটির প্রতি এমনই মোহ ছিল খোদেজা খাতুনের, ছিনতাই হয়ে যাবার ভয়ে পারতপক্ষে ঘর থেকে বেরুত না সে।

মহিলার স্বামী খোদাবক্স মৃধা স্ত্রীর জন্য সোনার হাত বানাতে গিয়ে প্রায় ফতুর হয়ে গিয়েছিল। সে ব্যাংকে যে টাকা গচ্ছিত রেখেছিল, তার পুরোটা তো তুলতে হয়েছেই, কয়েকটা ডিপিএস ম্যাচিওর্ড হবার আগেই তা ভাঙাতে হয়েছে। অবশ্য খোদেজা খাতুনের জন্য সোনার হাত না বানিয়ে উপায় ছিল না খোদাবক্স মৃধার। কারণ স্ত্রীকে সে অত্যন্ত ভয় পায়। খোদেজা খাতুন অত্যন্ত রাগী মহিলা। রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। হাতের কাছে যা পায় তা-ই ছুঁড়ে মারে স্বামীকে লক্ষ্য করে। একবার স্ত্রীর ছুঁড়ে মারা স্টীলের একটা বাটির টার্গেট প্র্যাকটিসে মৃধার কপাল অনেকটাই কেটে যায়। সে দাগটা এখনও মিলায়নি। তবে মৃধা বদমেজাজী স্ত্রীকে যতটা না অপছন্দ করে, তারচেয়ে অনেক বেশি ঘৃণা করে সোনার হাতটিকে। কারণ ওই হাতের জন্য তাকে রাস্তার ফকির বনে যেতে হচ্ছে।

প্রতিদিন সকালে নাস্তার টেবিলে সোনার হাতটির দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকে খোদাবক্স মৃধা। এ হাত তাকে লোকের কাছে

দেনাদার বানিয়েছে। প্রতিবছর সে যে কক্সবাজার কিংবা রাঙামাটি ঘুরে আসার বিলাসিতা দেখায়, সে আনন্দটুকুও কেড়ে নিয়েছে এটা।

মোসাম্মৎ খোদেজা খাতুন তার সোনার হাত ছাড়া আর কিছু বোঝে না। প্রাইভেট টিউটর খোদাবক্সের প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছিল সে। কিন্তু স্বামীর প্রতি তার প্রেম দিন দিন কমে আসছে, ভালবাসা উথলে উঠছে সোনার হাতের প্রতি। প্রতি জন্মদিনে সোনার হাতের সোনার আঙুলের জন্য তার একটি সোনার আংটি চাই-ই। স্ত্রী ভয়ে থরহরিকম্প মৃধা সোনার হাত এবং স্ত্রীকে অভিশাপ দিতে দিতে সোনার আংটি কিনে দিতে বাধ্য হয়। তবে দিন দিন হাতটির প্রতি তার ঘৃণা বেড়েই চলল।

মাঘের কনকনে এক শীতের সকালে খোদেজা খাতুন এক মহিলার মৃত্যু সংবাদ পড়ল প্রথম আলো'র শোক সংবাদের পাতায়। মহিলা তার বান্ধবী। যদিও খুব কমই দেখা সাক্ষাৎ হত দু'জনে। বিশেষ করে সড়ক দুর্ঘটনার পরে। খোদেজা খাতুনের বান্ধবী হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। খবরটা পড়ার পরে মুখ থেকে রক্ত সরে গেল খোদেজা খাতুনের। মৃত্যু চিন্তা ভর করল মস্তিষ্কে। এবং এ চিন্তাটা তাকে এমনই গ্রাস করল, অসুস্থ বোধ করল সে। মারা গেলে সোনার হাতের কী দশা হবে ভেবে দুশ্চিন্তার অন্ত রইল না খোদেজা খাতুনের। হঠাৎ এক নিদ্রাহীন গভীর রাতে একটা বুদ্ধি এল মাথায়। সে ঘুমন্ত মৃধাকে কনুইয়ের গুঁতোয় জাগিয়ে তুলে বলল, 'তোমার আগে যদি আমি মরে যাই, কসম খাও, সোনার হাতটিকেও আমার সঙ্গে কবর দেবে।'

স্ত্রীর কথা শুনে পিলে চমকে গেল মৃধার। ঘুম ঘুম ভাবটা পুরো উধাও হয়ে গেল চোখ থেকে। 'বলছ কী তুমি! ওই হাতের পেছনে আমার সারা জীবনের সঞ্চয় ব্যয় করেছি। ভুলে গেছ!'

'আমি কিছুই ভুলিনি।' কঠিন শোনাল খোদেজা খাতুনের কণ্ঠ। 'তোমার সারা জীবনের সঞ্চয়ের সঙ্গে আমার বাবার টাকাও আছে তা যেন ভুলে যেয়ো না। আমি বলছি তুমি হাতটি আমার কবরের সঙ্গে কবর দেবে। সেই সঙ্গে আঙুলে সোনার আংটিগুলোও যেন থাকে।

রাত দুপুরে ঝগড়াটে স্ত্রীর সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে নাক-মুখ ফাটাতে

চায় না খোদাবক্স মৃধা। তা ছাড়া খোদেজা খাতুন তার আগে মারা যাবে বলেও বিশ্বাস হয় না। বরং ধারের টাকা কীভাবে শোধ করবে সে চিন্তায় মৃধারই যে কোনও সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হবার সম্ভাবনা বেশি। সে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করল।

মৃধাকে স্বস্তি দিয়ে তার স্ত্রী এক বছর পরে মাঘের শীতে হঠাৎ ইন্তেকাল করল। মৃত্যুর কারণ কোনও রহস্যময় রোগ। ডাক্তাররাও বুঝতে পারলেন না। যা হোক, ওপরে শোকের মুখোশ পরা তবে ভেতরে ভেতরে উল্লসিত মৃধা ভাবছিল কবর দেয়ার আগে সে মৃতা স্ত্রীর সোনার হাতখানা খুলে লুকিয়ে রাখবে। কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি। খোদেজা খাতুনের আত্মীয়-স্বজন এসে মরা কান্না জুড়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়ে দিল খোদেজা খাতুন তাদেরকে পইপই করে বলে দিয়েছে মৃত্যুর পরে অবশ্যই যেন সোনার হাতখানা লাশের সঙ্গে কবরস্থ করা হয়। নইলে মরেও সে শান্তি পাবে না এবং অতৃপ্ত আত্মা বেহেশতে যেতে পারবে না। মৃধা যাতে তাদের কথায় সন্দেহ পোষণ করতে না পারে সে জন্য আইনী কাগজপত্র দেখাল তারা। ওতে পরিষ্কার লেখা–খোদেজা খাতুনকে মৃত্যুর পর কবর দেয়ার সময় সোনার হাতও কবর দিতে হবে। একজন বিখ্যাত উকিল এ কাগজ তৈরি করেছেন। লেখার নীচে খোদেজা খাতুনের সই জ্বলজ্বল করছে।

হতাশায় মোচড় দিল খোদাবক্সের বুক। কী চালাক তার স্ত্রী! মৃধার মতলব ঠিকই অনুমান করতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল সে মরে গেলে মৃধা তার সাধের সোনার হাত বিক্রি করে দেবে। যাতে এমন কিছু করতে না পারে সে জন্য আইনী ব্যবস্থাও নিয়েছে। একবারও ভাবল না মৃধার আর্থিক দৈন্যের কথা। মাগী! দাঁতে দাঁত পিষল মৃধা। সোনার হাতখানা যখন কফিনে, লাশের বুকের ওপর রাখা হলো, ওদিকে তাকিয়ে মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল মৃধা। সূর্যের আলো পড়ে কী ঝকঝক করছে হাতখানা! ঝিকিয়ে উঠছে সোনার আংটির দামী পাথরগুলো। গেল, মৃধার সারা জীবনের সঞ্চয় এভাবে ধুলোয় মিশে গেল।

পারিবারিক গোরস্তানে কবর দেয়া হলো খোদেজা খাতুনকে। মৃধা

এবং খোদেজা খাতুনের আত্মীয়-স্বজন ছাড়া কেউ জানল না সোনার হাতসহ কবর দেয়া হয়েছে তাকে। এ বাড়ি খোদেজা খাতুনের বাবা মেয়ের নামে লিখে দিয়েছিলেন। মৃধা ব্যবসা শুরু করে শ্বশুরের দেয়া টাকায়। তবে মেধা ও উদ্যমের অভাবে ব্যবসায় মার খেয়েছে সে। পরে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে শ্বশুরের তদবিরে ঢুকে মোটামুটি উপার্জন করছিল, কিছু সঞ্চয়ও হচ্ছিল। কিন্তু পুরো টাকাটাই তার খরচ হয়ে গেছে স্ত্রীর উদ্ভট শখ মেটাতে। অবশ্য এটা ঠিক, ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থের বেশিরভাগ ছিল যৌতুকের টাকা। জামাই যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সে জন্য মৃধার শ্বশুর তাকে ভাল অংকের টাকাই যৌতুক দিয়েছিলেন।

খোদেজা খাতুন মারা গেছে আজ চারদিন। একটা মুহূর্তও মৃধা সোনার হাতের কথা ভুলতে পারেনি। মাটির নীচে অন্ধকারে পচা লাশের গায়ে কি আলো ছড়াচ্ছে হাতটা? ওটা তো খোদেজা খাতুনের কোনও কাজেই আসবে না। বরং হাতটা বিক্রি করে মৃধা যে টাকা পাবে তা দিয়ে সমস্ত দেনা শোধ তো করা যাবেই, ব্যাংকে বেশ কয়েক লাখ টাকা রাখতে পারবে সে। বছর পাঁচেক আগে সে যখন সোনার হাতটি গড়তে দেয়, তখন সোনার ভরি ছিল নয় হাজার টাকা। এখন বাইশ হাজার। কাজেই সুযোগটা নেবে না কেন সে? ভীতু মৃধার মনে ধীরে ধীরে সাহস জন্মাতে থাকে।

মাঘের কুয়াশা ভরা, হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডার এক রাতে বিছানায় শুয়ে সোনার হাতের কথা ভাবছিল মৃধা, হঠাৎ একটা আশঙ্কা উদয় হলো মনে–হাতটা কেউ চুরি করে নিয়ে যায়নি তো? ওটা কবরে আদৌ আছে কি? কয়েক লাখ টাকা দামের মূল্যবান সম্পদটি ওভাবে হেলায় ফেলে রাখার কোনও মানেই নেই। নাহ্, হাতটির একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল খোদাবক্স মৃধা। গায়ে চড়াল গরম কাপড়। স্টোর রুমে ঢুকল। পুরানো একটা শাবল পেল খুঁজে। ওটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। হন হন করে এগোল পারিবারিক গোরস্তানের দিকে, যেখানে শক্ত, শীতল মাটির নীচে শুয়ে আছে তার স্ত্রী।

ভয় এবং উত্তেজনায় ঘনঘন দম নিচ্ছে মৃধা, গোরস্তানের ভারী লোহার গেটের সামনে হাজির হয়ে গেল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে খুলল গেট। সোনার হাতের লোভ মৃধাকে কদম বাড়াতে সাহায্য করল। পা পা করে এগিয়ে গেল স্ত্রীর কবরের দিকে। ঘোলাটে চাঁদের আলোয় ভৌতিক লাগছে সাদা কবর। নাহ্, কবর ঠিকই আছে। কারও অহেতুক নজর পড়েনি এতে।

মাটি খুঁড়বে কি খুঁড়বে না এ নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড বিবেকের সঙ্গে লড়াই চলল ভীতু মৃধার। যুক্তিবাদী মন বোঝাল, হয়তো চোর-ছ্যাঁচোররা জানে না বলে সোনার হাতটা হাপিশ করতে পারেনি। কিন্তু খোদেজা খাতুনের লোভী কোনও আত্মীয় যদি রাতের আঁধারে কবর খুঁড়ে হাতটি নিয়ে যায়? ওই হাত বিক্রি করলেই সমস্ত টেনশন থেকে মুক্ত হতে পারবে মৃধা। তা ছাড়া ওটা তো মৃত স্ত্রীর কোনও কাজেই লাগছে না। কাজেই ওটা সে নিজের কাজে লাগাবে।

বেলচা নিয়ে কাজে নেমে পড়ল মৃধা। কঠিন, শক্ত মাটি খুঁড়ে চলল। গভীর থেকে গভীরতর হলো গর্ত। অবশেষে তাকাল স্ত্রীর পচা লাশের দিকে। ভক্ করে বিকট দুর্গন্ধ বাড়ি মারল নাকে। কিন্তু মৃধা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে হাতের দিকে। চাঁদের ম্লান আলোতেও হাতখানা যেন জেল্লা ছড়াচ্ছে। মাংস পচা গন্ধটা যেন টেরই পাচ্ছে না মৃধা। সে চট করে সোনার হাত টেনে তুলল কবর থেকে। চেপে ধরল নিজের বুকে।

দ্রুত ঠাণ্ডা মাটি ফেলে বুজিয়ে দিল কবর। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে ত্যাগ করল গোরস্তান, সোনার হাতটি কোটের আড়ালে নিয়ে।

গোরস্তান থেকে মাত্র বেরিয়েছে মৃধা, বলা নেই কওয়া নেই, ঝুপ ঝুপ শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাসটা ক্ষুরের কামড় বসাল গায়ে। বগলের নীচে হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরল মৃধা। ওটার শীতল স্পর্শে গোটা শরীর কেঁপে উঠল।

অবশেষে বাড়ি পৌঁছুল খোদাবক্স মৃধা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। অসুস্থও বোধ করছে। কেমন বমি বমি লাগছে। হাতটি কোথায় রাখা যায় ভাবছে মৃধা কিন্তু জুৎসই কোনও জায়গা খুঁজে পেল না। শেষে

লেপের নীচে ঢুকিয়ে রাখল ওটা। গুটিসুটি মেরে বসে থাকল পাশে।

বাইরে হঠাৎ বেড়ে গেছে হাওয়ার তাণ্ডব। জানালার কাঁচে ক্রুদ্ধ টোকা দিচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটা। মৃধা লেপের নীচে ঢুকে পড়ল। তার শরীর থরথর করে কাঁপছে। যতটা না শীতে, তারচেয়ে বেশি ভয়ে। মুখের ওপরে লেপ তুলে দিল সে। কিন্তু পাশে শুইয়ে রাখা, হাতের বরফ শীতল স্পর্শটা তার শরীর থেকে যেন সমস্ত তাপ শুষে নিয়েছে। নিজেকে কবরে শোয়া লাশ মনে হলো মৃধার।

ঘুমাবার চেষ্টা করল মৃধা। আসছে না। শেষে চেষ্টা বাদ দিয়ে ভাবতে লাগল সোনার হাতটি বিক্রি করার টাকা দিয়ে সে কী কী করবে। এ হাত বিক্রি করতে তার কোনও সমস্যা হবে না। কারণ যে জুয়েলারি হাতটি গড়িয়ে দিয়েছিল তারাই ওটা কিনে নেবে জানিয়েছে। এ ব্যাপারে অনেক আগেই তাদের সঙ্গে কথা বলেছে মৃধা। তাকে তারা চলতি দরটাই দেবে। কাজেই দেনা শোধ করে, ব্যাংকে বেশ বড় অঙ্কের একটা টাকা রেখে এবারে দেশের বাইরে একটা ট্যুর মেরে আসতে পারবে মৃধা। মালয়েশিয়া যাবে। ও দেশের এয়ার লাইন্সে সস্তায় প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু সুখের ভাবনার সুতোটা ছিঁড়ে গেল বাতাসের আর্তনাদ ছাপিয়ে অপার্থিব একটা গোঙানির শব্দ কানে ধাক্কা মারতে। বিছানায় উঠে বসল মৃধা। খাড়া করল কান। আবার শোনা গেল শব্দটা, ঠিক জানালার বাইরে।

'আমার সোনার হাত নিয়েছে কে-এ-এ-এ?'

তীক্ষ্ণ, তীব্র গোঙানি মৃধার রক্ত জমাট বেঁধে দিল মুহূর্তে। তার স্ত্রীর কণ্ঠ না? সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাতাসের হাহাকার। পাশে রাখা সোনার হাতটির দিকে তাকাল মৃধা, শিউরে উঠল গা, সরে এল নিজের অজান্তেই।

জানালার বাইরে আবার শোনা গেল অদ্ভুত কণ্ঠটি। কান পেতে শুনল মৃধা। বাতাসের হো হো অট্টহাসি গিলে খেল আওয়াজ। আড়ষ্ট পেশী ঢিলে হলো, হাসল মৃধা নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা ভেবে। আসলে পুরোটাই ওর কল্পনা, নিজেকে বোঝাল সে। ওর স্ত্রী এখানে আসবে

কোত্থেকে? ঠিক তখন আবার শোনা গেল গায়ের রোম খাড়া করে দেয়া ভৌতিক কান্না, যেন কবর থেকে বিলাপ করছে কেউ।

'আমার সোনার হাত নিয়েছে কে-এ-এ-এ-এ-?'

কণ্ঠটা ক্রমে কাছিয়ে আসছে। ভয়ানক আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মৃধা। বাড়ির ভেতর থেকে যেন আসছে শব্দটা। সোনার হাতটা লুকোবার চিন্তা এল মৃধার মাথায়। সে হাতটার দিকে হাত বাড়াল। আগুনের ছ্যাঁকা খেল আঙুলে। বাপরে, কী ঠাণ্ডা! মৃধার আঙুল অবশ হয়ে গেছে। হাতটা ফেলে দিল সে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল ওদিকে। আবছা চাঁদের আলোয় দেখল সোনার একটা আঙুল ওর দিকে অভিশাপ দেয়ার ভঙ্গিতে উঁচিয়ে আছে। আবার রোমহর্ষক বিলাপ প্রতিধ্বনি তুলল ঘরে।

'আমার সোনার হাত নিয়েছে কে-এ-এ-এ?'

কণ্ঠটা এবার সিঁড়ির গোড়া থেকে শোনা গেল। তারপর পায়ের শব্দ শুনতে পেল মৃধা। ঘষটে ঘষটে ওপরে উঠছে কেউ। সেই সঙ্গে বেডরুমের দরজার দিকে ক্রমে কাছিয়ে আসছে তীব্র আক্ষেপের গোঙানি।

'আমার সোনার হাত নিয়েছে কে-এ-এ-এ?'

বিশ্রী শব্দে ভেঙে গেল দরজা। মৃধা লেপের নীচে বসে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। নড়াচড়া করার শক্তিও নেই।

ভয়ঙ্কর যে জিনিসটা এক হাত বাড়িয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে ওটার অস্তিত্ব অস্বীকার করার জন্য সে চোখ বুজল সভয়ে। যেন আমি কাউকে দেখছি না, আমাকেও কেউ দেখছে না। দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক শব্দ হচ্ছে মৃধার। টের পেল শক্ত, ঠাণ্ডা একটা হাত চেপে ধরেছে গলা। চাপ বাড়ছে। কানের কাছে ফিসফিসে, মৃদু একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

'আমার সোনার হাত নিয়েছে কে?'

গোঁ গোঁ করে উঠল মৃধা, 'আমি!'

পরদিন স্ত্রীর কবরের পাশে কবর দেয়া হলো খোদাবক্স মৃধাকে।

ভয়াল ভয়ঙ্কর

এক

আমি রায়হান মর্তুজা। বয়স ত্রিশ। উচ্চতা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। ওজন ১৭৫ পাউণ্ড। কালো চোখ, ব্যাকব্রাশ করা এক মাথা ঘন কালো চুল। সময় পেলেই টেনিস খেলি। ফলে আমি সুগঠিত একটি শরীরের অধিকারী। থাকি ক্যালিফোর্নিয়ার ছোট্ট শহর মিলভ্যালিতে। মাস ছয়েক আগে আমার আমেরিকান স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে। আমি তাকে যথেষ্ট সময় দিতে পারছি না এ অজুহাতে সে তার পুরানো বয়ফ্রেণ্ডের হাত ধরে চলে গেছে। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি আমি পেশায় ডাক্তার। মিলভ্যালিতে বছরখানেক ধরে ডাক্তারী করছি। আমার বাবাও ডাক্তার ছিলেন। সুনামের সঙ্গে এখানে প্রাকটিস করেছেন। তাই তাঁর রোগীদের পেতে আমার তেমন কষ্ট হয়নি। আমরা আমেরিকায় বসবাস করছি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে। আমার বাবা গত হয়েছেন বছর তিন আগে। মাকে হারিয়েছি ছেলেবেলায়। আমার কোনও ভাই-বোন নেই। বর্তমানে পুরানো আমলের বড় একটি বাড়িতে বাস করছি। বাড়ির চারদিকে গাছ, বাগান তো আছেই। পৈতৃক সূত্রে বাড়িটি পেয়েছি। আমার চার আসনের একটি মার্সিডিস গাড়ি আছে। আমার ব্যস্ত জীবনটা নীরস, একঘেয়ে কাটছিল। তবে ১৯৭৬ সালের ২৮ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমার নিস্তরঙ্গ জীবনে চরম উত্তেজনার খোরাক নিয়ে এল ক্যাথি রেনল্ডস। আমি জড়িয়ে পড়লাম ভয়ঙ্কর এক ঘটনার বেড়াজালে। এমন সব ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে লাগল যা কল্প-কাহিনি এবং হরর কাহিনি দুটোকেই হার মানায়। সেই অবিশ্বাস্য গল্প শুনতে আপনি প্রস্তুত? তবে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি আপনি কিন্তু একটা

গোলক ধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছেন। আপনি এমন সব ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হবেন যার কিছু ব্যাখ্যা হয়তো পাবেন তবে অনেক প্রশ্নের জবাবই থেকে যাবে অমীমাংসিত। শেষের দিকে ব্যাখ্যাতীত অনেক ব্যাপার আছে যার জবাব আমার নিজেরও জানা নেই। কারণ আমি এখনও একটা ঘোরের মধ্যে আছি আসলে কী ঘটেছিল কিংবা এর শুরুটাই বা কীভাবে, ঘটনার শেষ হলো কীভাবে কিংবা আদৌ সমাপ্তি বলে এর কিছু আছে কিনা। আমার গল্প যদি আপনাদের বিশ্বাস বা পছন্দ না হয় আমার কিছু বলার নেই। সেক্ষেত্রে বড়জোর দুঃখ প্রকাশ করতে পারি। আমি শুধু যা ঘটেছে তার বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব। বিশ্বাস করা না করা ভাল লাগা না লাগা আপনার ব্যাপার...

একটু আগেই বলেছি ঘটনার শুরু ১৯৭৬ সালের ২৮ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। আমার এক রোগীকে তখন বিদায় করে দিয়েছি। সাঁঝবেলায় মনে হচ্ছিল দিনটা আজ ভাল যায়নি আমার। ডাক্তার না হলেই বরং ভাল করতাম। কারণ সারাদিন শুধু কাজ আর কাজ। এত কাজ করে করে বেজায় ক্লান্ত আমি।

ডেস্কে বসে এ-মুহূর্তে রোগীর কেস-রেকর্ড লিখছি। কাজটা শেষ করে খানিক ব্রাণ্ডি পান করলাম। তারপর ঢুকলাম ওয়াশরুমে। হাত-মুখ ধুলাম। একটা ড্রিঙ্ক বানালাম। এ কাজটা খুব বেশি করি না আমি। কিন্তু আজ করলাম। ডেস্কের পেছনে, জানালার সামনে এসে দাঁড়ালাম হাতে মদের গ্লাস নিয়ে। থ্রকমর্টন স্ট্রিটের দিকে তাকিয়ে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছি। একটা জরুরি অপারেশনে ব্যস্ত থাকায় দুপুরে লাঞ্চ করা হয়নি। অস্বস্তি লাগছে কেমন। কোথাও যাওয়া দরকার। মনটা একটু ফ্রেশ হবে।

রিসেপশন রুমের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ। আমার নার্স চলে গেছে। দরজায় কেউ মৃদু শব্দে টোকা দিয়ে চলছেই। আমি ওদিকে মনোযোগ দিলাম না। চোখ রাস্তার দিকে। সাঁঝ নেমেছে। থ্রকমর্টন স্ট্রিটের বাতিগুলো জ্বলতে শুরু করেছে। মাত্র ৬-টা বাজে। রাস্তা জনশূন্য—কেউ কোথাও নেই। লোকজন হয়তো ইতিমধ্যে খেতে বসে গেছে। নিজেকে আমার

একা এবং হতাশ লাগল।

দরজায় আবার শুরু হলো টোকা। মদের গ্লাসটা নামিয়ে রাখলাম। এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। খুললাম। সামনে দাঁড়ানো মানুষটিকে দেখে আপনাআপনি মুখ হাঁ হয়ে গেল প্রবল বিস্ময়ে। কারণ ক্যাথি ব্রেনভস দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

'হ্যালো, রায়হান,' হাসল সে। আমার চেহারায় ফুটে-ওঠা বিস্ময় এবং আনন্দটুকু উপভোগ করছে। 'ক্যাথি,' বিড়বিড় করলাম আমি। সরে দাঁড়ালাম একপাশে ওকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার জন্য। 'তোমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি। এসো ভেতরে এসো!' আমার মুখে মুচকি হাসি ফুটল। ক্যাথি আমাকে পাশ কাটাল, রিসেপশন রুম হয়ে পা বাড়াল আমার অফিসে।

'কী ব্যাপার?' দরজা বন্ধ করতে করতে বললাম আমি, 'কোনও প্রফেশনাল কল?' ওকে দেখে খুব ভাল লাগছে আমার। 'এ হপ্তায় একটা অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করলাম।'

'ভালই তো,' হেসে মাথা ঘোরাল ক্যাথি। ওর শরীর এখনও আগের মতই। ক্যাথির ফিগার সত্যি দেখার মত, ভারী নিতম্ব, সুডৌল বুক, সরু কোমর।

'না,' আমার ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল ক্যাথি। জবাব দিল প্রশ্নের—'ঠিক প্রফেশনাল কল নয়।'

চশমা খুলে ওটা আলোর সামনে পরীক্ষা করতে করতে বললাম, 'আমি সারাদিনই মদ খাই। সবাই জানে, বিশেষ করে অপারেশনের দিনে।'

আমার হাত থেকে চশমাটা প্রায় খসে পড়তে যাচ্ছিল। কারণ ফোঁপাচ্ছে ক্যাথি, শ্বাস টানার মত শব্দ করছে। হঠাৎ চোখ ভরে গেল জলে, চট করে ঘুরে দাঁড়াল ও। কাঁধ কুঁজো হয়ে আছে, মুখে চলে এল হাত। 'আমি—আমি—' ওর গলায় রা ফুটছে না।

আমি নরম গলায় বললাম, 'বসো।' আমার ডেস্কের চামড়ার চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল ক্যাথি। আমি ওয়াশরুমে গেলাম, ওর জন্য ধীরেসুস্থে একটা ড্রিঙ্ক বানালাম। তারপর ফিরে এলাম।

কাচমোড়া টেবিলে রাখলাম মদের গ্লাস।

ক্যাথির মুখোমুখি বসলাম স্যুইভেল চেয়ারে হেলান দিয়ে। ক্যাথি আমার দিকে চোখ তুলে চাইল। ইশারা করলাম গ্লাসটা নিতে। নিজের গ্লাসে চুমুক দিলাম। ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। ওকে ধাতস্থ হয়ে ওঠার সময় দিলাম। এই প্রথমবারের মত ভাল করে লক্ষ করলাম ওকে। আগের মতই রয়েছে ক্যাথি। চমৎকার সুশ্রী মুখ, সেই বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, তবে চশমাজোড়া সামান্য লালচে লাগছে। ঢেউ খেলানো চুল কেটে ছোট করে ফেলেছে ক্যাথি। কেশরাজি আগের মতই চকচকে, এবং বাদামি, ঘন। অবশ্য ওর চুল ঢেউখেলানো ছিল কিনা মনে পড়ছে না। ও বদলে গেছে। ও আর এখন অষ্টাদশী নয়, পঁচিশ চলছে। যদিও ওকে আগের মতই লাগছে আমার। হাইস্কুলে পড়া সেই তরুণী ক্যাথি। ওর চেয়ে কয়েক ক্লাস ওপরে পড়তাম আমি।

'তোমাকে দেখে ভাল লাগছে, ক্যাথি,' ওর গ্লাসের সঙ্গে নিজের গ্লাসটা ঠেকিয়ে বললাম আমি হাসিমুখে। তারপর চোখ নামিয়ে গ্লাসে চুমুক দিলাম। সমস্যাটা কী নিয়ে, শোনার আগে ওকে সহজ করে তোলার চেষ্টা করছি।

'তোমাকে দেখে আমারও ভাল লাগছে, রায়হান।' বুক ভরে শ্বাস নিল ক্যাথি, হাতে গ্লাস নিয়ে হেলান দিল চেয়ারে। 'আমাকে একবার আমন্ত্রণ করেছিলে মনে আছে? পার্টি বা এরকম কোথাও যাচ্ছিলাম। তোমার কপালে কয়েকটা কথা লেখা ছিল।'

ঘটনাটা মনে আছে আমার। তবু তাকিয়ে রইলাম প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে।

'তোমার কপালে লিখে রেখেছিলে: RM loves KR। লাল কালি কিংবা লিপস্টিক দিয়ে লেখা ছিল কথাগুলো। তুমি বলেছিলে ওই লেখা মুছবে না। আমি রাগারাগি করার পরে মুছে ফেললে।'

হাসলাম আমি। 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে।' একটা কথা মনে পড়ে গেল। 'ক্যাথি তোমার ডিভোর্সের কথা শুনেছি। আমি দুঃখিত।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাথি। 'ধন্যবাদ, রায়হান। তোমার স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির কথাও আমার কানে এসেছে। আমিও দুঃখিত।'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'ধরে নাও দুজনে এখন একই নৌকার যাত্রী।'

'হ্যাঁ,' কাজের কথায় চলে এল ও। 'রায়হান, আমি শীলার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।' শীলা ওর কাজিন।

'ওর কী হয়েছে?'

'জানি না।' ক্যাথি আমার দিকে তাকিয়ে ইতস্তত গলায় যোগ করল। 'ওর–এটাকে তুমি ডিল্যুশন বা ভ্রান্তি বলতে পারো। তুমি ওর চাচাকে তো চেনোই–ইরা চাচা?'

'হ্যাঁ।'

'রায়হান, শীলার ধারণা ইরা ওর চাচা নয়।'

'মানে?' গ্লাসে চুমুক দিলাম আমি। 'শীলার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার কোনও সম্পর্ক নেই?'

'না, না,' অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ক্যাথি। 'ও বলছে–' শ্রাগ করার ভঙ্গিতে এক কাঁধ উঁচু হলো। 'ওই লোকটা নকল কেউ বা কিছু। ইরা চাচা সেজে রয়েছে।'

ক্যাথির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালাম। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। শীলাকে ওর চাচা-চাচি বড় করেছেন। 'ও নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছে না?'

'না। বলছে লোকটা অবিকল তার ইরা চাচার মত দেখতে। তার মত কথা বলে, একই রকম আচার-আচরণ–সবকিছু। কিন্তু শীলার দৃঢ় বিশ্বাস এ লোক তার ইরা চাচা নয়। রায়হান, আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি!' আবার চোখে জল চলে এল ক্যাথির।

'ওটা খাও,' বিড়বিড় করলাম আমি। ইশারায় গ্লাসটা দেখালাম। নিজের গ্লাস থেকে বড় একটা ঢোক গিললাম। চেয়ারে হেলান দিয়ে চেয়ে রইলাম ছাদের দিকে। বিষয়টা নিয়ে ভাবছি। শীলা বুদ্ধিমতী, তাকে ধোঁকা দেওয়া সহজ নয়। ওর বয়স পঁয়ত্রিশের কোঠায়। লাল টুকটুকে গাল, বেঁটে, মোটা। চেহারা মোটেই সুন্দর নয়। এজন্যই বিয়ে হয়নি। যদিও আমার ধারণা ও স্ত্রী এবং মা হিসেবে খুব ভাল হবে। শহরে একটা বইয়ের দোকান আছে ওর। বই ভাড়া দেয়। আর আছে

গ্রিটিংকার্ডের দোকান। শুভেচ্ছা কার্ড বিক্রি করে। ভালই চলে দোকানদুটো। খেয়ে পরে দিব্যি আছে শীলা যা ছোট একটি শহরে খুব সহজ ব্যাপার নয়।

আমি ক্যাথির দিকে তাকালাম। 'তুমি আমাকে কী করতে বলো?'

'রাতে একবার ওখানে এসো, রায়হান।' ডেস্কে ঝুঁকল ও, কণ্ঠে অনুনয়। 'পারলে এখনই চলো। আরেকটু পর রাত হয়ে যাবে। তুমি ইরা চাচাকে দেখো, তাঁর সঙ্গে কথা বলো। তুমি তো অনেক দিন ধরে তাঁকে চেনো।'

নাকের ডগায় চশমা নেমে এল আমার। চশমার আড়াল দিয়ে তাকালাম ক্যাথির দিকে। 'তুমি আসলে কী বলতে চাইছ, কেট? তুমিও ভাবছ উনি ইরা চাচা নন?'

ঝলসে উঠল ক্যাথি, 'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি।' ঠোঁট কামড়াতে লাগল ও, ডানে-বাঁয়ে অসহায়ের মত মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'আমি জানি না, রায়হান। আমি জানি না। অবশ্যই উনি ইরা চাচা। অবশ্যই তিনি তা। তবে...শীলা এত জোর দিয়ে বলল।' হাত মোচড়াতে লাগল ক্যাথি। 'এরকম ওকে কখনও করতে দেখিনি আগে। রায়হান, আমি বুঝতে পারছি না ওখানে এসব কী ঘটছে।'

সিধে হলাম আমি। ডেস্ক ঘুরে ক্যাথির চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ালাম। 'ঠিক আছে, চলো যাই। দেখে আসি কী ঘটছে।' নরম গলায় বললাম আমি। 'টেক ইট ইজি, কেট।' ওর কাঁধে একটা হাত রাখলাম। পাতলা পোশাকের নীচে ওর কাঁধ গোল এবং উষ্ণ। হাত সরিয়ে নিলাম। 'যা-ই ঘটুক তার পেছনে কারণ একটা অবশ্যই থাকতে হবে। আমরা কারণটা খুঁজে বের করে সমস্যার সমাধান করব, চলো।'

ঘুরলাম আমি। ডেস্কের পাশে ক্লজিট খুলে বের করলাম জ্যাকেট। টেলিফোনের অ্যানসারিং মেশিনে ম্যাসেজ দিয়ে রাখলাম: আমি এখন বেরুচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি বললাম। তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম ইরা চাচার বাড়ির উদ্দেশে।

গাড়ি নিয়ে লাইব্রেরিতে চলে এলাম। শহরের বাইরে এলাকাটা। মোড় নিলাম রিকার্ডো রোডে। বেশ চওড়া আঁকাবাঁকা রাস্তা। ইরা

চাচাকে দেখতে পেলাম তাঁর বাড়ির সামনের বাগানে। গাড়ির গতি কমালাম। উনি আমাদের দেখে হাসলেন। 'ইভনিং, ক্যাথি। হাই, রায়হান।'

আমরা হাত নাড়লাম। নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। ক্যাথি বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। ইরা চাচার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে কথা বলল হাসিমুখে। আমি লন ধরে এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে। 'ইভনিং, মি. লেন্‌জ।'

'কাজকর্ম কেমন চলছে, রায়হান? আজ ক'জনের পটল তোলালে?' বেশ একটা মশকরা করেছেন এমন ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি।

'খুব বেশি না,' জবাবে আমিও হাসলাম। দাঁড়ালাম তাঁর পাশে। তাকালাম তাঁর দিকে। মাত্র দু'হাত দূরে তিনি।

আলো এখনও যথেষ্ট উজ্জ্বল। কী দেখব বা কাকে দেখব ভাবছিলাম। কিন্তু যিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি অবশ্যই ইরা চাচা। সেই একই মি. লেন্‌জ যাকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি। এ লোককে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় খবরের কাগজ পৌঁছে দিতাম। আগের মতই দেখতে তিনি। তবে পার্থক্য একটাই—পনেরো বছরের এই ব্যবধানে তাঁর চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। বিশালদেহী ইরা চাচা, ছয় ফুটের উপরে লম্বা, চকচকে ধূর্ত চোখ, হাস্যোজ্জ্বল, যথার্থ একজন ভাল বুড়োমানুষ। আর আমার সামনে ইরা চাচাই দাঁড়িয়ে আছেন, অন্য কেউ নয়। শীলার কথা ভেবে ভয় লাগল আমার।

স্থানীয় রাজনীতি, আবহাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কথা বললাম আমরা। তাঁর মুখের প্রতিটি ভাঁজ বা রেখা লক্ষ করছি। মনোযোগ দিয়ে শুনছি প্রতিটি কথা, লক্ষ করছি গলার স্বরের ওঠানামা, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি। ব্যাপারটা তাঁর নজর এড়াল না। 'তোমাকে কেমন যেন চিন্তিত লাগছে, রায়হান। কেমন অস্থির!'

হেসে কাঁধ ঝাঁকালাম। 'কাজের চাপ। অন্য কিছু না। বাড়িতেও কাজ নিয়ে যেতে হয়।'

'এটা কখনও কোরো না, বাপ। আমি এ কাজ জীবনেও করিনি।

বাসায় সবসময় মুক্ত মনে ফিরেছি। এত কাজ করে তো আর প্রেসিডেন্ট হতে পারবে না।' মুচকি হাসলেন তিনি। 'তবে প্রেসিডেন্ট মারা গেছেন। আর আমি বেঁচে আছি এখনও।'

ধ্যাৎ, এ ইরা চাচাই। তাঁর চুল, মুখের প্রতিটি রেখা, প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ, নড়াচড়া, চিন্তাভাবনা সবকিছু আমার আগের ইরা চাচার সঙ্গে মিলে যায়। এ নকল হতে পারে না। নিজেকে বোকা-বোকা লাগল। ক্যাথি আর শীলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। বসল বারান্দার দোলনায়। ওদের উদ্দেশে হাত নাড়লাম। পা বাড়ালাম ওদিকে।

দুই

ক্যাথির সঙ্গে বারান্দার দোলনায় বসে আছে শীলা। আমাকে দেখে হাসল। শান্ত গলায় বলল, 'তুমি এসেছ। আমি খুশি হয়েছি, রায়হান।'

'হ্যালো শীলা, নাইস টু সি ইউ।' বারান্দার প্রশস্ত রেলিঙে ওদের মুখোমুখি বসলাম আমি। পিলারে হেলান দিলাম। শীলা প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। তারপর তাকাল তার চাচার দিকে। বাগান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি আবার। 'তো?' জিজ্ঞেস করল সে।

ইরা চাচাকে আমিও দেখলাম একনজর। তারপর তাকালাম শীলার দিকে। 'উনি তোমার ইরা চাচাই, শীলা। তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

মাথা ঝাঁকাল শীলা। যেন এরকম জবাবই আশা করছিল। 'উনি আমার চাচা নন,' বিড়বিড় করল সে, তবে শান্ত গলায়–তর্কের ভঙ্গিতে নয়, যেন একটা সত্য ব্যাপারে জোর দিচ্ছে।

'বেশ,' বললাম আমি। 'একবারে অল্প করে হজম করা যাক। কারণ তোমাকে বোকা বানানো খুব কঠিন। তুমি চাচার সঙ্গে বহুবছর ধরে আছ। তুমি কী করে বুঝলে শীলা, উনি তোমার ইরা চাচা নন? তাঁকে তোমার অন্যকিছু মনে হওয়ার কারণ কী?'

একমুহূর্তের জন্য গলা চড়ল শীলার, আতঙ্কিত শোনাল। 'কারণ

উনি ইরা চাচা নন!' পরমুহূর্তে শান্ত করল নিজেকে, ঝুঁকে এল আমার দিকে। 'রায়হান, চেহারা দেখে তুমি কোনও পার্থক্য ধরতে পারবে না। কেট যখন বলল তুমি এখানে আছ–ভাবলাম কাজটা তুমি পারবে। কোন-না-কোন পার্থক্য তোমার চোখে ধরা পড়বেই। কিন্তু তুমি পারোনি। কারণ চোখে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। ওনাকে দ্যাখো।'

একসঙ্গে সবাই তাকালাম লনের দিকে, ইরা চাচা অলস ভঙ্গিতে আগাছা কিংবা নুড়িতে লাথি মারছেন। তাঁর প্রতিটি নড়াচড়া, অঙ্গভঙ্গি অবিকল ইরা চাচার মত। শীলার গাল এখনও লালচে, তবে গোলাকার চেহারায় ফুটে আছে উদ্বেগ। আমার দিকে তীক্ষ্ণ, স্থির চোখে তাকিয়ে আছে সে। 'আমি আজকের দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম,' ফিসফিস করল সে। 'অপেক্ষা করছিলাম কখন সে চুল কেটে আসবে। অবশেষে সে এল।' আবার আমার দিকে ঝুঁকল শীলা, চোখ জোড়া বিস্ফারিত, কণ্ঠ পরিণত হয়েছে হিসহিসে ফিসফিসানিতে। 'ইরা চাচার ঘাড়ের পেছনে ছোট একটা দাগ আছে। গরম পানি পড়ে ঝলসে গিয়েছিল চামড়া। তোমার বাবা ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করে দেন। তুমি এমনিতে দাগটা দেখতে পাবে না।' ফিসফিস করল ও, 'তবে চুল কাটলে দাগটা দেখা যায়। আজ আমি এ মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আজ সে চুল কেটেছে–'

সোজা হয়ে বসলাম আমি। উত্তেজিত। 'আর দেখলে দাগটা নেই? তুমি বলতে চাইছ–'

'না!' রাগ রাগ শোনাল শীলার কণ্ঠ, জ্বলে উঠেছে চোখ। 'ওটা আছে–দাগটা–অবিকল ইরা চাচার মত।'

একমুহূর্ত মুখে রা জোগাল না। জুতোর ডগার দিকে স্থির দৃষ্টি আমার, ক্যাথির দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছে না, একমুহূর্ত শীলার দিকেও চাইতে পারলাম না। তারপর মাথা তুললাম আমি, সোজা ওর চোখে চোখ রাখলাম। 'শোনো, শীলা। উনি ইরা চাচা। তুমি বুঝতে পারছ না তা? তুমি যা-ই ভাব না কেন, তিনি–'

মাথা নাড়াল শীলা । 'না, ওই লোক আমার ইরা চাচা নয়।'

এক মুহূর্তের জন্য কথার খেই হারিয়ে ফেললাম। কী বলব বুঝতে পারছি না। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'এলিডা চাচি কই?'

'উনি উপরে। আস্তে কথা বলো। লোকটা যেন শুনতে না পায়।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে ভাবছি আমি। 'ওই লোকের অভ্যাসগুলোর কথা বলো শীলা, আচার-আচরণ?'

'সব ইরা চাচার মত!'

উচিত হলো না তবু হারিয়ে ফেললাম ধৈর্য। 'তা হলে দু'জনের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? কোনও পার্থক্য যদি না-ই থাকে তা হলে তুমি কী করে বলো'—নিজেকে শান্ত করলাম, 'শীলা, তোমার স্মৃতি কী বলে? এমন কিছু স্মৃতি নিশ্চয় আছে যার কথা কেবল তুমি আর ইরা চাচাই জানো।'

মেঝেতে পা দিয়ে ধাক্কা দিল শীলা, মৃদু দোল খেতে লাগল দোলনায়। তাকাল ইরা চাচার দিকে। তিনি একটা গাছের দিকে তাকিয়ে আছেন। হয়তো ভাবছেন গাছটার ডালপালা ছেঁটে ফেলার দরকার আছে কিনা। 'আমি তাও পরীক্ষা করে দেখেছি।' মৃদু গলায় বলল শীলা। 'শৈশবের স্মৃতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি আমি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। যেন বুঝতে পেরেছে এসবের কোনও মানে হয় না। আমাকে বোঝাতে পারবে না। 'একবার, কয়েক বছর আগে, ইরা চাচা আমাকে হার্ডওয়্যারের একটা দোকানে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে ছোট একটা দরজা ছিল, ফ্রেমে বসানো, কাউন্টারের উপর, তালা বা এ-ধরনের কিছু একটা বিক্রির বিজ্ঞাপন ছিল ওটা। দরজার কবজা ছিল, ছিল খুদে একটা হাতল এবং পিতলের খুদে একটা কড়া। আমি জিনিসটা কিনতে চেয়েছিলাম। আমাকে কিনে দেওয়া হয়নি বলে কান্নাকাটিও করেছিলাম। এ লোকের সেসব কথা মনে আছে। আমি কী বলেছিলাম, বিক্রেতা কী বলেছিল, ইরা চাচা কী বলেছিলেন। এমনকী আমি যেসব কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম তাও সে মনে করিয়ে দিয়েছে—শনিবারের এক শেষ বিকেলে, আমাকে চাচা ম্যাটিনি শো-তে সিনেমা দেখিয়েছিলেন। চাচা আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে একখণ্ড মেঘ দেখান আমাকে। অবিকল খরগোশের মত দেখতে। এ লোকের তা

মনে আছে। সবকিছু। ইরা চাচার যেমন মনে থাকত।'

আমি একজন সাধারণ ডাক্তার, মনোবিজ্ঞানী নই। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। তাকিয়ে আছি নিজের আঙুলের দিকে। শুনছি দোলনা দোলার মৃদু ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ।

তারপর আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাইলাম আমি। বললাম, 'দ্যাখো শীলা, আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমার কাজই মানুষের সমস্যায় তাকে সাহায্য করা। এটাও একটা সমস্যা, কাজেই এর সমাধান দরকার। আর তুমি জানো আমি তোমাকে সাহায্য করব। এখন আমার কথা শোনো। আমি আশা করি না কিংবা তোমাকে বলছিও না যে এটা একটা ভুল এবং সে ব্যাপারটা স্বীকার করার জন্য যে উনি আসলেই ইরা চাচা। উনি তোমার ইরা চাচা নন, এ ভাবনাটা তুমি এখনই মাথা থেকে দূর করে দিতে পারবে সে আশাও আমি করি না। তবে আমি চাই তুমি বুঝতে চেষ্টা করো উনি তোমার চাচা। তুমি যা-ই ভাবো না কেন, সমস্যা তুমি নিজেই নিজের ভেতরে সৃষ্টি করেছ। দুজন মানুষের চেহারা পুরোপুরি একরকম হওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার। গল্প-উপন্যাস-সিনেমায় যদিও এরকম বহু দেখা যায়, তবে বাস্তবে তা সম্ভব নয়। এমনকী যমজ বাচ্চাদেরকেও তাদের বাবা-মা আলাদাভাবে শনাক্ত করতে পারে। তোমার ইরা চাচাকে একমুহূর্তের বেশি নকল করা কারও পক্ষেই সম্ভব না। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করো, শীলা। বিষয়টা মাথার ভিতর ঢোকাও। তা হলেই ভিতরের সমস্যাটা ধরতে পারবে। তারপর এর সমাধান করা সম্ভব হবে।' বারান্দার খিলানে হেলান দিলাম আবার–তীর ছুঁড়ে দিয়েছি–ওটা ঠিক জায়গায় লেগেছে কি না তা জানার অপেক্ষা করছি।

দোলনায় মৃদু দুলছে শীলা, মেঝেতে ছন্দায়িত ভঙ্গিতে ছুঁয়ে যাচ্ছে পা। ভাবছে। তারপর–বারান্দায় অন্যমনস্ক চোখ–ঠোঁট কামড়াল। ডানে-বামে মাথা নাড়ল। না।

'শোনো, শীলা,' তীব্র বেগে কথাগুলো বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে। ওর চোখে চোখ রাখলাম। 'উনি নকল হলে তোমার এলিডা চাচির কাছে ধরা খেয়ে যেতেন। এ কথাটা বুঝতে পারছ না কেন?

তাঁকে বোকা বানানো সম্ভব নয়। উনি কী বলেছেন? এসব নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছ?'

আবার মাথা নাড়ল শীলা। ফাঁকা চোখ বারান্দায়।

'কেন বলোনি?'

ধীরে ধীরে আমার দিকে তাকাল শীলা। একমুহূর্ত দৃষ্টি স্থির থাকল চোখে, তারপর ভরে উঠল জলে, ফোলা গাল বেয়ে ঝরতে লাগল। 'কারণ–রায়হান, সেও আমার এলিডা চাচি নয়।' মুখ হাঁ হয়ে গেল ওর এক সেকেণ্ডের জন্য, নির্জলা আতঙ্ক দেখতে পেলাম চোখে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'হাঁ ঈশ্বর, রায়হান, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? বলো, আমাকে বলো, রায়হান। আমার সত্যি কী হয়েছে জানতেই হবে।' ক্যাথি শীলার হাত ধরে থাকল। ওর চেহারায় যন্ত্রণার ছাপ সুস্পষ্ট। চাচাতো বোনের বেদনায় বেদনার্ত।

আমি শীলার দিকে তাকিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে হাসলাম। 'না,' বললাম দৃঢ় গলায়। 'তুমি পাগল হয়ে যাওনি।' হাসিটা মুখে ধরে রেখে একটা হাত বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে। দোলনার কিনারে রাখা হাতে হাত রাখলাম। 'আজকাল এত সহজে পাগল হওয়া যায় না, শীলা।

গলার স্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করল ক্যাথি, 'আমি শুনেছি অনেকে নিজেকে পাগল বলে ভাবতে থাকে। তাই বলে সে নিশ্চয় পাগল হয়ে যায় না।'

'কথাটা ঠিক,' সায় দিলাম আমি। 'তবে শীলা, তোমার এমন কিছু হয়নি যে মনোবিজ্ঞানীর কাছে যেতে হবে। অনেকেই উল্টোপাল্টা অনেক কিছু ভাবে। তাতে কী এসে যায়?'

'তোমরা আসলে ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না,' ইরা চাচার দিকে স্থির চোখ শীলার। কণ্ঠ নিষ্প্রভ। ক্যাথির হাতে একটা চাপ দিয়ে নিজের হাত সরিয়ে নিল সে। ঘুরল আমার দিকে। এখন আর কাঁদছে না। গলার স্বর শান্ত এবং দৃঢ়।

'রায়হান, লোকটার চেহারা, কথা বলার ঢঙ, আচরণ, স্মৃতিচারণ সবকিছুই ইরা চাচার মত। এগুলো অবশ্য সবই বাইরের। তবে ভেতরে সে আলাদা। তার প্রতিক্রিয়াগুলো–' বিরতি দিল শীলা, সঠিক শব্দ

হাতড়াচ্ছে। –'আবেগহীন। সে অতীতের কথা মনে করে, হাসে এবং বলে, 'তুমি খুব কিউট ছিলে, শীলা, আর বুদ্ধিমতী,'–যেভাবে ইরা চাচা বলতেন। কিন্তু ওর মধ্যে কিছু–একটার অভাব রয়েছে। একই জিনিস লক্ষ করেছি এলিডা চাচির মধ্যেও।' থামল শীলা। আবার ফাঁকা দেখাল চাউনি, চেহারায় উদ্বেগ। শুরু করল আবার, 'ইরা চাচা আমার কাছে বাবার মত ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই। উনি যখন আমার ছেলেবেলা নিয়ে কথা বলতেন চেহারায় সবসময় অদ্ভুত একটা আবেগ ফুটত। রায়হান, সে আবেগ এ লোকটার মধ্যে একেবারেই নেই। আমি ব্যাপারটা টের পাই। বুঝতে পারি যন্ত্রচালিতের মত কথা বলছে সে। অভিনয় করছে। ইরা চাচার স্মৃতি সে ধারণ করে আছে। সেটাই মুখস্থবিদ্যার মত বলে যাচ্ছে। কিন্তু আবেগের ছিটেফোঁটাও থাকছে না তাতে। শুধুই ভান করছে সে। কথা বলার ভঙ্গি, শব্দচয়ন, গলার স্বর সবকিছুই আমার চাচার মত–তবে আবেগ-অনুভূতি শূন্য।'

দৃঢ় এবং কর্তৃত্বসুলভ শোনাল শীলার কণ্ঠ, 'রায়হান–স্মৃতিশক্তি, আচার-আচরণ, সম্ভব-অসম্ভব যত কিছুই তুমি করো না কেন আমি জানি ওই লোক আমার ইরা চাচা নয়।'

আমার আর কিছু বলার নেই। শীলাও জানে সে-কথা। সে দোলনা ছেড়ে সিধে হলো। হাসছে। বলল, 'এ নিয়ে আর কথা নয়,' লনের দিকে মাথা ঝাঁকাল– 'ওই লোক সন্দেহ করবে।'

ও কীসের ইঙ্গিত করছে বুঝতে পারলাম না। 'কী সন্দেহ করবে?'

'সন্দেহ করবে আমরা কী নিয়ে এত কথা বলছি,' ধৈর্য নিয়ে বলল শীলা। 'তুমি এসেছ। আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছ। ধন্যবাদ। আমি চাই না আমাকে নিয়ে তুমি দুশ্চিন্তা করো।' ক্যাথির দিকে ফিরল, 'তুমিও আমাকে নিয়ে চিন্তা করবে না।' মুচকি হাসল–'আমি খুব কঠিন মেয়ে। তোমরা দুজনেই তা জানো। আমি ঠিক থাকব। তুমি যদি মনোবিজ্ঞানীর কাছে আমাকে নিয়ে যেতে চাও, রায়হান। আমি রাজি আছি।'

মাথা দোলালাম, বললাম স্যান রাফায়েলে ডক্টর জন কোয়েলসের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করব, এ লাইনে সে-ই সেরা। সকালে ওকে ফোন

করব বললাম। বললাম ও যেন ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে। দুশ্চিন্তা করতে মানা করলাম। হাসল শীলা। একটা হাত রাখল আমার কাঁধে। নারীকে ভুল বুঝলে সে যখন পুরুষকে ক্ষমা করে দেয় সেভাবে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে আমার কাঁধে হাত রেখেছে ও। ক্যাথিকে ধন্যবাদ দিল তাকে দেখতে আসার জন্য। বলল আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে। ক্যাথিকে বললাম ওকে আমি বাড়ি পৌঁছে দেব।

গাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম দুজনে। ইরা চাচার পাশ দিয়ে আসার সময় বললাম, 'গুড নাইট, মি. লেন্‌জ।'

'গুড নাইট, রায়হান। আবার এসো।' ক্যাথির দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। তবে কথা বললেন আমার সঙ্গে। 'ক্যাথি আবার ফিরে এসেছে। খুব ভাল লাগছে, না?' চোখ টিপলেন তিনি।

'অবশ্যই,' হাসলাম আমি। ক্যাথি বিড়বিড় করে শুভরাত্রি বলল।

গাড়িতে উঠে ক্যাথিকে জিজ্ঞেস করলাম ও ডিনার করবে কি না। কিন্তু সোজা বাড়ি ফিরে যেতে চাইল ক্যাথি। এতে অবাক হলাম না মোটেই।

আমার বাড়ি থেকে তিন ব্লক দূরে ক্যাথির বাসা। সাদা রঙের বেশ বড় একটি বাড়ি। ওখানে ক্যাথির বাবার জন্ম। ফুটপাতের ধার ঘেঁষে গাড়ি থামালাম আমি। ক্যাথি জিজ্ঞেস করল, 'রায়হান–তোমার কী মনে হয়–ও ঠিক থাকবে?'

ইতস্তত করলাম আমি, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিলাম, 'জানি না। ডিপ্লোমা অনুযায়ী আমি একজন ডাক্তার। তবে শীলার সমস্যাটা ঠিক বুঝতে পারছি না। মনোবিজ্ঞান নিয়ে বকবক চালিয়ে যেতে পারি বটে তবে সত্যি কথা হলো এটা আমার লাইন নয়। জন কোয়েলসের লাইন।'

'সে কি শীলাকে সত্যি সাহায্য করতে পারবে?'

'হ্যাঁ, কেউ যদি সাহায্য করতে পারে তো জনিই পারবে।' যদিও আমি জানি না সত্যি সে সাহায্য করতে পারবে কি না।

ক্যাথির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে এল কথাটা, 'কাল রাতে?' অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকাল। ক্যাথি এখনও

ভাবছে বোনের কথা। বলল, 'হ্যাঁ, ৮-টার সময়?' আমি বললাম, 'বেশ। আমি তোমাকে ফোন করব।' আমাদের কথা শুনে মনে হতে পারে অনেকদিন ধরে একসঙ্গে চলাফেরা করছি আমরা। তবে অতীতটাকে বর্তমানে তুলে আনতে একটুও কষ্ট হলো না আমাদের। গাড়িতে ফিরতে ফিরতে নিজেকে অনেক রিল্যাক্স লাগল। মনটা শান্তিতে পূর্ণ।

আমার কথা শুনে আমাকে হৃদয়হীন মনে হতে পারে। আপনারা ভাবতে পারেন আমার এখন শীলার কথা ভাবা উচিত। অথচ ভাবছি কি না ক্যাথিকে নিয়ে। তবে এটা ঠিক আমার মন এখন পড়ে আছে অন্য কোথাও। তবে একজন ডাক্তার শেখে, কারণ তাকে শিখতে হয়। রোগীর জন্য সে দুশ্চিন্তা করে না। দুশ্চিন্তা যদি সুফল বয়ে আনতে পারে তা হলে সে দুশ্চিন্তা করে। নইলে মনের শান্ত প্রকোষ্ঠে পড়ে থাকে সকল দুশ্চিন্তা। আপনার রোগী মারা যেতে পারে, তারপর আপনি ফিরে যাবেন অফিসে। পরবর্তী কাজ করতে হবে পূর্ণ মনোযোগে।

ডেভস ডিনারে কোনার দিকের ছোট একটা টেবিলে বসে রাতের খাবারটা সেরে নিলাম। রেস্টুরেন্টে লোক নেই বললেই চলে। কেন নেই ভাবলাম। খেয়েদেয়ে বাড়ি ফিরলাম। রাতের পোশাক পরে একটা পেপারব্যাক রহস্যসাহিত্য তুলে নিলাম হাতে। আশা করলাম ফোন বেজে উঠে বিরক্ত করবে না আমাকে।

তিন

পরদিন সকালে অফিসে গিয়ে দেখি এক রোগী অপেক্ষা করছে আমার জন্য। ছোটখাটো গড়নের চল্লিশোর্ধ্ব এক মহিলা আমার ডেস্কের সামনে গদিমোড়া চেয়ারে বসা। কোলে রাখা পার্সের ওপর জড়ো করে রাখা হাত। বলল সে একশ' ভাগ নিশ্চিত তার স্বামী তার আসল স্বামী

নয়। মহিলা শান্ত গলায় জানাল নকল লোকটার চেহারা, কথা বলার ঢঙ, আচার-আচরণ অবিকল তার স্বামীর মত। আঠারো বছরের দাম্পত্যজীবন চলছে তাদের। মহিলা খুব ভাল বুঝতে পারছে এ লোক তার স্বামী নয়। শীলার সেই গল্প আবার, তবে বিস্তারিত বর্ণনা ছাড়া। মহিলা চলে যাওয়ার পর জন কোয়েলসেকে ফোন করে দুটো অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করলাম।

সংক্ষেপে বলি: ওই সপ্তাহের মঙ্গলবারেই আমি জনের কাছে আরও পাঁচজন রোগী পাঠালাম। এদের একজন তরুণ, বুদ্ধিমান এক আইনজীবী। সে বলল তার সঙ্গে বিবাহিত যে বোনটি থাকে সে আসলে তার বোন নয়। যদিও মহিলার স্বামী তা মনে করে না। স্কুলপড়ুয়া তিন কন্যার এক মা আমার অফিসে হাজির হয়ে অশ্রুসজল চোখে বলল তার মেয়েরা স্কুলের ইংরেজির শিক্ষককে জাল বলায় ক্লাসের সবাই নাকি তাদেরকে নিয়ে মশকরা করেছে। নয় বছরের এক বাচ্চা এল তার নানির সঙ্গে। নানি নাতি আর মেয়ের সঙ্গে থাকেন। নানি বললেন, নাতি বলছে তার মা নাকি তার আসল মা নয়। আর এটা আবিষ্কার করে নাতির মৃগীরোগীর মত দশা হয়েছে।

মেরিন জেনারেল হাসপাতালে স্টাফদের বৈঠক ছিল। আমি বৈঠকে হাজির হয়ে গেলাম। জন কোয়েলস অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। হাসপাতালে পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করছি, লাইনে দাঁড়ানো একটা গাড়ি থেকে কে যেন ডাকল আমার নাম ধরে। গাড়ি থেকে নামলাম। তাকালাম ওদিকে। গাড়ির সামনের সিটে বসে আছে জন, সঙ্গে মেরিনের আরেকজন সাইকিয়াট্রিস্ট ড. মাইকেল। পেছনের আসনে বসা ম্যাট চিশম, মিলভ্যালিতে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী এক ডাক্তার। জন তার দিকের দরজা খুলে রেখেছে। পা বেরিয়ে রয়েছে বাইরে, হাঁটুর ওপর ভর দেওয়া কনুই, ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। জন বেশ সুদর্শন, বুদ্ধিমান। ফুটবল খেলোয়াড়দের মত চেহারা। মাইকেল এবং ম্যাটের বয়স বেশি, ওদের চেহারাতেই ডাক্তার ডাক্তার একটা ভাব আছে।

'মিলভ্যালিতে এসব ঘটছে কী?' আমাকে জিজ্ঞেস করল জন। ম্যাটের দিকে তাকাল সে। বুঝতে পারলাম ম্যাটও জানে ব্যাপারটা।

'নতুন একটা শখের আমদানি হয়েছে,' খোলা দরজায় হাত রেখে বললাম আমি। 'নকল লোকে ভরে আছে শহর।'

'এরকম সংক্রামক স্নায়বিক রোগ জীবনে দেখিনি আমি,' বলল জন, 'এ লোকগুলোকে দিয়ে করবটা কী? ঠিক বলিনি, চার্লি?' ঘাড় ঘুরিয়ে মাইকেলের দিকে তাকাল। মাইকেল হুইলের পেছনে বসেছে। সামান্য ভুরু কোঁচকাল। 'অস্বাভাবিক কতগুলো কেস,' বিচক্ষণের ভঙ্গিতে বলল সে। 'রায়হান, কেসগুলো আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে,' চোখ সরু করে বলল জন। 'তুমি তো ওদের কথা জানোই। ওই লেন্‌জ মহিলার কথাই ধরো। এর মধ্যে কোনও ডিল্যুশন আছে বলব না আমি। মহিলাকে খুব ভালভাবে পরীক্ষা করেছি আমি। পাগলামির কোনও চিহ্ন পাইনি। ওই মহিলা নিশ্চিত তার চাচা, তার আসল চাচা নয়। 'কিন্তু ব্যাপারটা তো অসম্ভব।' কৌতূহলের দৃষ্টিতে আমকে দেখল জন। 'কিন্তু ব্যাপারটা আরও অসম্ভব এ-কারণে যে মিলভ্যালিতে ন'জন মানুষ একই সঙ্গে একই ধরনের ডিল্যুশনের শিকার হচ্ছে, তাই না, চার্লি?'

জবাবে কিছু বলল না চার্লি। একমুহূর্ত চুপ হয়ে রইল সবাই। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যাট চিশম। 'বিকেলে আমার কাছে আরেক রোগী এসেছে। পঞ্চাশের কোঠায় বয়স, অনেকদিন ধরেই সে আমার রোগী। তার পঁচিশ বছরের একটা মেয়ে আছে। ওই লোক এখন বলছে ওই মেয়ে নাকি তার কন্যা নয়। একই কেস।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। সামনের আসনে বসা দুজনকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের কাছে ওই লোককে পাঠিয়ে দেব?'

কেউ কোন জবাব দিল না। তারপর জন বলল, 'জানি না, যা ইচ্ছে করো। এ লোক অন্যদের মত হলে আমি কোনও সাহায্য করতে পারব না। হয়তো চার্লি পারবে।

মাইকেল বলল, 'আমার কাছে লোকটাকে পাঠিয়ে দিও। দেখি কী করতে পারি। তবে জনি ঠিকই বলেছে, এগুলো সাধারণ ডিল্যুশন কেস নয়।'

'কিংবা অন্য কিছুও নয়,' বলল জন।

ভেতরে যাওয়ার সময় হয়েছে। ওরা গাড়ি থেকে নামল। সবাই মিলে হাসপাতালে ঢুকলাম। গতানুগতিক মিটিং। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের নীরস বক্তৃতা শুনতে হলো। এর চেয়ে ক্যাথির সঙ্গে গল্প করলেও ভাল হত। কিংবা বাড়ি বসে টিভি দেখলেও কেটে যেত সময়। মিটিং শেষে জনির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললাম আমার গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। অবশ্য বলার মত তেমন কিছু ছিলও না। অবশেষে জন বলল, 'আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো, রায়হান। এ-বিষয়টা নিয়ে কাজ করতে হবে।' বললাম যোগাযোগ রাখব। গাড়িতে চড়ে বসলাম। রওনা হলাম বাড়ির দিকে।

গত সপ্তায় প্রতি রাতেই ক্যাথির সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। তার মানে এই নয় যে, আমাদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ওর সঙ্গে সন্ধেটা কাটাতে ভাল লাগে আমার। বুধবার রাতে ওকে ফোন করলাম। বললাম সিনেমা দেখতে যাব।

'তোমাকে আজ দারুণ লাগছে,' গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললাম ক্যাথিকে। ধূসর-রঙা সুট পরেছে ও, কাঁধের একদিকে ফুলের কারুকাজ।

'ধন্যবাদ,' গাড়িতে ঢুকল ক্যাথি, মুচকি হাসল আমার দিকে তাকিয়ে। 'তোমার সঙ্গে যখন থাকি ভাল লাগে আমার, রায়হান।' বলল সে। 'অন্য যে কারও চেয়ে তোমার সঙ্গে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। হয়তো দুজনেই ডিভোর্সি বলে।'

মাথা ঝাঁকালাম আমি। স্টার্ট দিলাম গাড়ি। চলে এলাম সিনেমা হলে। বক্স অফিস থেকে টিকেট কেনার সময় বিক্রেতা মেয়েটা বলল, 'ধন্যবাদ, ডক্টর। জেরির সঙ্গে একটু দেখা করেন।' জেরি প্রেক্ষাগৃহের ম্যানেজার। মেয়েটার এ কথা বলার মানে আমার কোনও রোগীর জরুরি ফোন এলে জেরি খবরটা পৌঁছে দেবে আমাকে। লবি থেকে পপকর্ন কিনলাম। তারপর প্রেক্ষাগৃহে ঢুকলাম।

ছবির নাম 'টাইম অ্যাণ্ড এগেইন'। সায়েন্স ফিকশন ধরনের ছবি। এক লোক অতীতে চলে যায়। ছবি অর্ধেকটা দেখা হয়েছে এমন সময় ম্যানেজার জেরি মনট্রোস ইঙ্গিত করল আমাকে বাইরে আসার জন্য।

লবিতে চলে এলাম দুজনে। পপকর্নের দোকানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলেন রিদওয়ান শরিফ। ক্ষমাপ্রার্থনার হাসি মুখে। 'দুঃখিত, রায়হান,' বললেন তিনি। ক্যাথির দিকে তাকিয়ে বিব্রত একটা ভঙ্গি করলেন। 'তোমাদের ছবি দেখার মজাটা নষ্ট করে দিলাম।'

'ঠিক আছে। কী হয়েছে, শরিফ ভাই?'

জবাব দিলেন না তিনি । সামনের দরজার দিকে পা বাড়ালেন। বুঝতে পারলাম লবিতে দাঁড়িয়ে কথা বলতে চাইছেন না। বাইরে চলে এলাম আমরা। 'কেউ অসুস্থ হয়নি, রায়হান। এটা ঠিক ইমার্জেন্সি কি না বুঝতে পারছি না। তবে তোমার সঙ্গে কথা বলাটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল। আমার বাসায় চলো।'

আমি শরিফকে পছন্দ করি। উনি একজন লেখক। দীর্ঘ দিন ধরে আছেন এ দেশে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পণ্ডিত রবি শংকর ও জর্জ হ্যারিসন ম্যাডিসন স্কোয়ারে যে কনসার্ট করেছিলেন সে আয়োজনে বড় একটি ভূমিকা ছিল শরিফের। লেখেনও দারুণ। আমি বললাম, 'তেমন ইমার্জেন্সি না হলে কাল সকালেও কথা বলা যেতে পারে।' ক্যাথির দিকে ইঙ্গিত করে মাথা দোলালাম। 'তা ছাড়া সন্ধ্যাটা আজ শুধু আমার একার নয়। ভাল কথা, তোমরা বোধহয় একে অপরকে চেনো, তাই না?'

ক্যাথি হেসে বলল, 'আমি শরিফ ভাইয়ের লেখার ভক্ত।' শুনে খুশি হলেন শরিফ। 'তুমি আমার বই পড়ো জানতাম না। তবে তোমার বাবা আমার লেখা পছন্দ করেন।'

একটু বিরতি দিয়ে কী যেন ভাবলেন একমুহূর্ত। ক্যাথির দিক থেকে চোখ সরিয়ে তাকালেন আমার দিকে। 'ওকে নিয়েই চলো। অবশ্য ও যদি যেতে রাজি হয়। ক্যাথি গেলে ভালই হবে। আমার বউয়ের সাহায্য হবে।' বিব্রত ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি। 'তবে ক্যাথি যা দেখবে তা ওর পছন্দ নাও হতে পরে। যদিও আমার ধারণা সিনেমার চেয়েও রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখতে পাবে তোমরা।'

ক্যাথির দিকে তাকালাম আমি। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সে। বললাম, 'আমার গাড়িতে চলো। যেতে যেতে কথা বলব। ফেরার পথে

তোমার গাড়িটা নেবে।'

তিনজনে সামনের আসনে বসলাম। মিলভ্যালির উপকণ্ঠে থাকেন শরিফ। যাওয়ার পথে একটি কথাও বললেন না। নিশ্চয় কোন কারণ আছে। সরু মুখ শরিফের, মাথার চুল প্রায় সব পেকে গেছে। বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ একজন মানুষ। জানেন কখন কী সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

আমরা সাদা-কালো রঙের সিটি লিমিটের সাইন পার হয়েছি, শরিফ সামনে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'কাঁচা রাস্তাটার বামে মোড় নাও, রায়হান। তোমার নিশ্চয় মনে আছে পাহাড়ের ওপরে সবুজ বাড়িটা।'

মাথা ঝাঁকালাম আমি, এগোলাম রাস্তার দিকে।

শরিফ বললেন, 'এক মিনিটের জন্য গাড়িটা থামাবে, রায়হান? তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

রাস্তার ধারে থামালাম গাড়ি, ইঞ্জিন চালু রইল। ঘুরলাম ওর দিকে।

গভীর দম নিলেন শরিফ। বললেন, 'রায়হান, ডাক্তারকে কিছু কিছু ব্যাপারে রোগীর রিপোর্ট লিখতে হয়, না?' প্রশ্নের চেয়ে বিবৃতির মত শোনাল কথাটা। তাই শুধু মাথা দোলালাম।

'যেমন সংক্রামক কোনও রোগ,' বলে চললেন শরিফ। 'গুলির আঘাতে সৃষ্টি হওয়া ক্ষত কিংবা লাশ।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। 'এসব বিষয়ে তোমাকে সব সময় রিপোর্ট করতে হয়?'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'এটা আসলে পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। আপনি আসলে কী বলতে চাইছেন, শরিফ ভাই?'

'এখনই বলতে পারব না। আগে প্রশ্নটার জবাব চাই।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন লেখক, কী যেন ভাবছেন। তারপর আমার দিকে তাকালেন। 'তুমি হয়তো এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। ধরো একটা কেসের কথা, বা যে-কোনও কেসগুলোর ক্ষতই ধরো, তোমাকে কি ব্যাপারটা রিপোর্ট করতে হবে? যদি রিপোর্ট না করো সেক্ষেত্রে কি তুমি ঝামেলায় পড়তে পারো? তোমার লাইসেন্স কি বাতিল হয়ে যেতে

পারে? তুমি এমন কোনও পরিস্থিতির কথা কি ভাবতে পারো যেখানে তোমার নাম, খ্যাতি, নীতিবোধ, লাইসেন্স সব নিয়ে জুয়া খেলতে হবে যদি তুমি ঘটনার রিপোর্ট না দাও?'

আবার কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'আমি জানি না, শরিফ ভাই। তবে অনুমান করতে পারি। অনুমান করতে পারি এরকম কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে, যদি সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় আমার কাছে, আমি হয়তো আইন-কানুনের কথা ভুলে যাব।' ওঁর রহস্য করার ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার। 'আমি বুঝতে পারছি না, আপনি আসলে কী বলতে চাইছেন। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে ধোঁয়াশা ঠেকছে। আপনার বাড়িতে যদি রিপোর্ট করার মত কোনও ঘটনা ঘটে থাকে সেক্ষেত্রে আমি হয়তো রিপোর্ট করব।'

হাসলেন শরিফ ভাই। 'ঠিক আছে। তবে আমার মনে হয় না এ ব্যাপারটা তুমি রিপোর্ট করতে চাইবে।' বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'চলো এগোই।'

আবার গাড়ি চালাতে শুরু করলাম। হেডলাইটের আলোয় একটা কাঠামো দেখতে পেলাম। একশো গজ দূরে। হেঁটে আসছে আমাদের দিকে, এক মহিলা, পরনে অ্যাপ্রন। বুকের ওপর জড়ো করে রাখা হাত। মহিলাকে চিনতে পারলাম। ফিওনা। শরিফ ভাইয়ের বউ। ফিওনার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। সে গৃহবধূ।

ধীরগতিতে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে গেলাম তার দিকে, থামালাম পাশে। ফিওনা বলল, 'হ্যালো, রায়হান।' খোলা জানালা দিয়ে তাকাল স্বামীর দিকে। 'ওখানে আমার একা থাকতে ভয় করছিল, শরিফ। আর টিকতে না পেরে চলে এসেছি, দুঃখিত।'

মাথা দোলালেন শরিফ। 'তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুনো উচিত ছিল আমার। কাজটা বোকার মত হয়ে গেছে।'

গাড়ির দরজা খুলে দিলাম। ফিওনা ঢুকল ভেতরে। বসল ব্যাকসিটে। শরিফ ভাই ওর বউয়ের সঙ্গে ক্যাথির পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি বাড়ির দিকে গাড়ি ছোটালাম।

চার

রিদওয়ান শরিফের সবুজ রঙের বাড়িটি পাহাড়ের একপাশে। গ্যারেজ বেজমেন্টের একটা অংশ। গ্যারেজ খালি। দরজা খোলা। শরিফ গ্যারেজে গাড়ি নিয়ে ঢোকার ইঙ্গিত দিলেন। গাড়ি ঢোকালাম ভেতরে। তারপর নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। শরিফ একটা বাতি জ্বেলে দিলেন। বন্ধ করলেন গ্যারেজের দরজা। তারপর বেজমেন্ট লাগোয়া একটা দরজা খুললেন। ইশারা করলেন সামনে বাড়তে।

আমরা সাধারণ চেহারার একটা বেজমেন্টে ঢুকলাম। পুরোনো আমলের কাপড় ধোয়ার টাব, একটা ওয়াশিং মেশিন, কাঠের একটা টেবিল, কতগুলো খবরের কাগজ গাদা করা মেঝের ওপর, দেয়াল-ঘেঁষা কয়েকটি কার্ডবোর্ডের কার্টন আর অনেকগুলো ব্যবহৃত রঙের ক্যান। শরিফ ভাই আমাদের পাশ কাটিয়ে ঘরের আরেকটা দরজার দিকে এগোলেন। থামলেন। দরজার হাতলে হাত রেখে ঘুরলেন আমাদের দিকে। ওই ঘরে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড চমৎকার একটি বিলিয়ার্ড টেবিল আছে আমি জানি। শরিফ ভাই বলেছেন বলগুলো সরিয়ে রেখে বহুবার তিনি ওটা লেখার টেবিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ক্যাথির দিকে তাকালেন তিনি, চাইলেন স্ত্রীর দিকে। বললেন, 'নিশ্বাস বন্ধ করে রাখো।' দরজা খুললেন তিনি। ঢুকলেন ভেতরে। মাথার ওপরের বাতি জ্বাললেন চেইন টেনে। আমরা ওর পেছন পেছন ঢুকলাম ঘরে।

বিলিয়ার্ড টেবিলের উপরে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঝলমল করছে টেবিল। বাতিটা নীচে টেনে নামানো যাতে খেলার সময় আলো চোখে না পড়ে। ছাদটা অন্ধকার। বাতির আলোয় টেবিলটা আলোকিত, তবে ঘরের বাকি অংশ প্রায় অন্ধকার। ক্যাথির চেহারা পরিষ্কার দেখতে পারছি না আমি, ওকে আঁতকে উঠতে শুনলাম। সবুজ বিলিয়ার্ড টেবিলের ওপর রাবারের চাদর দিয়ে যে-জিনিসটা মুড়ে

রেখেছেন শরিফ তা নিঃসন্দেহে মানুষের শরীর। ঘুরলাম শরিফ ভাইয়ের দিকে । উনি বললেন, 'চাদরটা সরাও।'

অস্বস্তিবোধ করলাম। ভয়ও যে লাগছে না তা নয়। তবে এত রহস্য আমার সহ্য হয় না। রাবারের চাদরটা খামচে ধরলাম, টান মেরে ফেলে দিলাম টেবিলের এককোণে। টেবিলে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে এক নগ্ন পুরুষ। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা হবে সম্ভবত–শুয়ে থাকা অবস্থায় একজন মানুষের উচ্চতা বোঝা মুশকিল। গায়ের রঙ ফর্সা, ঝকঝকে আলোয় বিবর্ণ লাগল ত্বক। অবাস্তব এবং নাটুকে মনে হলো। আবার একই সঙ্গে বাস্তবও। হালকা পাতলা গড়ন। ১৪০ পাউণ্ড হবে ওজন। পেশিবহুল শরীর। বয়স বোঝা গেল না। কারণ দেখে বুড়ো মনে হয় না। চোখজোড়া খোলা, স্থির দৃষ্টি মাথার ওপরের আলোর দিকে। কালো, অত্যন্ত স্বচ্ছ চোখ। সারা গায়ে কোন ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়ল না। মৃত্যুর পরিষ্কার কোনও কারণ বুঝতে পারলাম না। ক্যাথির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি, ওর হাত ধরে ঘুরলাম শরিফ ভাইয়ের দিকে, 'তো?'

মাথা নাড়লেন শরিফ। কোনও মন্তব্য করতে রাজি নন। 'ভাল করে দ্যাখো। পরীক্ষা করো। অদ্ভুত কিছু দেখতে পাচ্ছ কি?'

টেবিলে শোয়ানো লাশটির কাছে ফিরে এলাম আবার। অস্বস্তিবোধটা বাড়ল আরও। ব্যাপারটা ভাল্লাগছে না; এ লাশটার মধ্যে অদ্ভুত কিছু একটা আছে যা আমি ঠিক ধরতে পারছি না। এজন্য রাগও হলো। 'কাম অন, শরিফ ভাই।' ওর দিকে তাকালাম আবার। 'আমি লাশ ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না। রহস্য করা বাদ দিন তো। ব্যাপার কী?'

আবার মাথা নাড়লেন তিনি, অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললেন, 'রায়হান, টেক ইট ইজি, প্লিজ। আমি আমার ধারণা ভুল কি না তা তোমাকে বলতে চাই না। আমি তোমাকে প্রভাবিত করতে চাই না। কিছু দেখার থাকলে নিজে আগে দেখে নাও। আর যদি দেখার কিছু না থাকে, যদি পুরোটাই হয় আমার কল্পনা, আমি তাও জানতে চাই। আমাকে সাহায্য করো, রায়হান।' নরম গলা ওর।

‘ওটাকে ভাল করে একটু দ্যাখো।’

লাশটা পরীক্ষা করলাম আমি, টেবিলটার চারপাশে ধীরগতিতে চক্কর দিলাম, নানা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলাম ওটাকে। শরিফ ভাই, ক্যাথি এবং ফিওনা থাকল আমার সঙ্গে, ওরাও ঘুরে ঘুরে দেখছে লাশ। অবশেষে বললাম, ‘ওটার মধ্যে সত্যি অদ্ভুত কিছু একটা আছে। আপনি কল্পনা করছেন না। আর যদি কল্পনা করে থাকেন তা হলে আমিও করছি।’ ঝাড়া আধামিনিট টেবিলের ওপর শোয়ানো জিনিসটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম আমি। এরকম শরীর খুব একটা দেখা যায় না। জ্যান্ত কিংবা মৃত। আমার দেখা কয়েকজন যক্ষ্মারোগীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে–প্রায় সারাটা জীবন স্যানিটারিয়ামে কাটাতে হয়েছে তাদেরকে। ওদের সবার ওপর এক এক করে চোখ বুলালাম আমি। ‘আপনাদের শরীরে কোথাও-না-কোথাও কিছু কাটাছেঁড়ার দাগ আছে। একেবারে নিদাগ শরীর খুব কমই হয়। তবে স্যানিটারিয়ামের রোগীদের শরীরে এরকম দাগ থাকে না। কারণ তাদের কোন কাজে ব্যবহার করা হয় না। এ লাশটাকে দেখে তেমনটিই মনে হচ্ছে আমার।’ ম্লান, নিশ্চল শরীরটার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলাম। ‘তবে এ যক্ষ্মারোগী নয়। এর শরীর সুগঠিত, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী সে। পেশিবহুল। তবে এ লোক কখনও ফুটবল বা হকি খেলেনি; কখনও সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে যায়নি, শরীরের হাড়গোড় ভাঙেনি কখনও। একে দেখে মনে হচ্ছে...একে কোনও কাজে ব্যবহার করা হয়নি। আপনি তো তাই বলতে চাইছেন?’

মাথা দোলালেন শরিফ। ‘হ্যাঁ। আর কিছু?’

‘কেট, তুমি ঠিক আছ তো?’ টেবিলের ওপাশে দাঁড়ানো মেয়েটার দিকে তাকালাম আমি।

‘হ্যাঁ,’ নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথা দোলাল ক্যাথি।

‘মুখটা,’ বললাম আমি। মোমের মত সাদা মুখ। স্থির, স্বচ্ছ চোখ। ‘এটাকে অপরিণতও বলা যাবে না।’ কীভাবে বলব কথাটা বুঝতে পারছি না। ‘হাড়গুলো চমৎকার; প্রাপ্তবয়স্ক একটা মুখ। কিন্তু একে দেখাচ্ছে–’ সঠিক শব্দটা খুঁজে পেতে ব্যর্থ

হলাম–'অস্পষ্ট। একে দেখাচ্ছে–'

বাধা দিলেন শরিফ। গলার স্বর তীক্ষ্ণ। মৃদু হাসি ঠোঁটে।

'তুমি কখনও মেডেল বানাতে দেখেছ?'

'মেডেল?'

'হ্যাঁ। স্কুল-কলেজে ভাল রেজাল্ট করলে যে মেডেল দেওয়া হয়।'

'না।'

'শক্ত ধাতু দিয়ে বানানো হয় এগুলো,' ব্যাখ্যা করতে লাগলেন শরিফ ভাই। 'দুটো ইমপ্রেশন তৈরি করে ওরা।' বুঝতে পারছি না কেন হঠাৎ মেডেল নিয়ে মেতে উঠলেন তিনি। 'ওরা একটা ডাইতে প্রথম ইমপ্রেশনটা তৈরি করে, ব্লাঙ্ক মেডেলটাকে রাফ একটা শেড দেয়। তারপর দুই নম্বর ডাই দিয়ে নকশা তৈরি করে। দ্বিতীয় ডাইতে বিস্তারিত কাজ থাকে। ভাল একটা মেডেলে তুমি সূক্ষ্ম লাইনগুলো দেখতে পাবে। ওরা কাজটা ওভাবে করে কারণ দ্বিতীয় ডাই দিয়ে ধাতু নরম করা যায় না। রাফ শেড দিতে হবে এক নম্বর ডাই দিয়ে।' বিরতি দিলেন তিনি। আমার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে তাকালেন ক্যাথির দিকে। লক্ষ করলেন আমরা ওঁর কথা শুনছি কি না।

'তো?' অধৈর্য শোনাল আমার কণ্ঠ।

'মেডেল সাধারণত একটা চেহারার আকৃতি দেখায়। এক নম্বর ডাই'র দিকে তাকালে দেখবে চেহারাটা সম্পূর্ণ নয়, যদিও সবই আছে ওখানে। তবে বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন নেই,' আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন শরিফ। 'রায়হান, চেহারা বা মুখটা এ রকমই। সব আছে ওখানে; ঠোঁট, নাক, চোখ, ত্বক এবং তার নীচে হাড়ের কাঠামো। কিন্তু কোনও রেখা বা ভাঁজ নেই। নেই বিস্তারিত কিছু, নেই বৈশিষ্ট্যসূচক কোনও চিহ্ন। ওটা অগঠিত একটা জিনিস। ওটাকে দ্যাখো!' ওঁর গলার স্বর এক ধাপ চড়ল। 'এটা একটা ব্ল্যাঙ্ক বা ফাঁকা মুখের মত। শেষ চিহ্নগুলো ওখানে পড়ার অপেক্ষায় আছে।'

উনি ঠিকই বলেছেন। এরকম চেহারা জীবনে দেখিনি আমি। কোমল, তুলতুলে জিনিস নয় এটা। তবে এটা আকারহীন, চিহ্নহীন একটা জিনিস। ঠিক মুখ বলা যাবে না এটাকে। এতে জীবনের

চিহ্নমাত্রও নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এ কে?'

'জানি না,' দোরগোড়ায় হেঁটে গেলেন শরিফ। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করলেন। সিঁড়ির নীচে ছোট একটা ক্লজিট। প্লাইউড দিয়ে মোড়ানো। ঘরের অর্ধেকটা বোঝাই নানা হাবিজাবিতে; কাবার্ড বাক্সে আছে জামাকাপড়, অকেজো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, পুরোনো একটা ভ্যাকুম ক্লিনার, একটা ইস্তিরি, কয়েকটা বাতি এরকম আরও কিছু জিনিস। 'ও ঘরের দরজা আমরা বলতে গেলে খুলিই না। কিছু পুরোনো বইপত্রও আছে। একে ওই ঘরে পেয়েছি আমি। একটা রেফারেন্স বই খুঁজতে ঢুকেছিলাম ঘরে। ওকে দেখতে পেলাম। কার্টনের ওপর শুয়ে আছে। ঠিক এভাবে। নগ্ন। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। লাফ দিয়ে পিছু হঠতে গিয়ে মাথায় দারুণ চোট পাই।' খুলিতে হাত বুলালেন শরিফ ভাই। 'দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। পরে আবার সাহস করে ভিতরে ঢুকি। ওকে টানতে টানতে নিয়ে আসি। ভেবেছিলাম বেঁচে আছে। রিগর মার্টিসের প্রভাব কতক্ষণ থাকে, রায়হান?'

'আট থেকে দশ ঘণ্টা।'

'ওকে ছুঁয়ে দ্যাখো,' বললেন তিনি।

টেবিলে শোয়া লাশটার কব্জি ধরলাম। নরম। ঠাণ্ডাও লাগল না।

'কোনও রিগর মার্টিস নেই,' বললেন শরিফ। 'ঠিক?'

'ঠিক,' বললাম আমি। 'তবে রিগর মার্টিস স্থির নয়। কিছু ক্ষেত্রে—' বলতে গিয়ে থেমে গেলাম আমি। বলে কী লাভ?

'ইচ্ছে করলে ওর শরীর উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করে দেখতে পারো,' বললেন তিনি। 'তবে ওর পিঠেও কোনও দাগ নেই, চুলেও তাই। কী কারণে মরল বোঝার কোনও উপায় নেই।'

ইতস্তত করলাম আমি। বৈধভাবে এ শরীর ছোঁয়ার অধিকার আমার নেই।' আমি রাবারের চাদরটা টেনে নিলাম, ছুঁড়ে দিলাম লাশের গায়ে। অর্ধেক শরীর ঢাকা পড়ল তাতে। 'এবার কোথায় যেতে হবে?' বললাম আমি। 'দোতলায়?'

'হ্যাঁ,' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মাথা দোলালেন শরিফ। সবাই বেরিয়ে

এলে চেইন টেনে এ ঘরের বাতি নিভিয়ে দিলেন।

দোতলায় লিভিংরুমে গেলাম আমরা। ফিওনা আমাদেরকে বসতে বলল। তারপর বাতি জ্বালল। অ্যাসট্রে রাখল যথাস্থানে। এরপর ঢুকল রান্নাঘরে। অ্যাপ্রন ছেড়ে শাড়ি পরল। বড় একটা আরামকেদারায় বসল। আমি আর ক্যাথি বসেছি গদি আঁটা সোফায়। শরিফ জানালার ধারের কাঠের রকিং চেয়ারটা দখল করেছেন। ওঁর লিভিংরুমের সামনে দেয়ালের প্রায় পুরোটা কাচে মোড়া। পাহাড়ের ফাঁকে ছড়িয়ে থাকা গোটা শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। চমৎকার একটি ঘর।

'ড্রিঙ্ক নাকি অন্য কিছু নেবে?' জিজ্ঞেস করলেন শরিফ ভাই।

মাথা নাড়ল ক্যাথি। আমি বললাম, 'না, ধন্যবাদ। বরং আপনি যা বলতে চাইছেন শুরু করে দিন।'

স্ত্রীর দিকে একবার তাকালেন শরিফ। সে মাথা নাড়ল। শরিফ বললেন, 'রায়হান, তোমাকে ডেকে এনেছি কারণ তুমি একজন ডাক্তার। তা ছাড়া তুমি বাস্তবের মোকাবেলা করতেও জানো।' আমি কিছু না বলে শুধু কাঁধ ঝাঁকালাম।

'নীচতলার শরীরটা নিয়ে কিছু বলবে তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন উনি।

আমি বসে বসে কোটের বোতাম নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলাম। কী জবাব দেব ঠিক করে ফেলেছি।

'কিছু কথা বলার আছে আমার। এর কোনও অর্থ নেই জানি। তবে শরীরটার অটোপসি করতে চাই আমি। আমি কী দেখতে পাব জানো?' শরিফ, ফিওনা এবং ক্যাথির দিকে তাকালাম এক এক করে। কেউ কোনও জবাব দিল না। চুপচাপ বসে রইল। 'আমার ধারণা মৃত্যুর কোনও কারণ খুঁজে পাব না আমি। আমার ধারণা শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক আছে দেখতে পাব।'

ওদেরকে কিছুক্ষণ ভাবার সময় দিলাম। তারপর বললাম, 'তবে এখানেই শেষ নয়। আমার ধারণা ওটার পেট কাটার পরে ভেতরে কিছুই দেখতে পাব না। খাবারের একটা কণাও নয়, হজম হওয়া বা হজম না-হওয়া কিছুই থাকবে না ওখানে। নবজাতক শিশুর মত খালি

থাকবে পেট। অন্ত্র কাটার পরেও একই ঘটনা ঘটবে। ভিতরে কোনোরকম বর্জ্য থাকবে না। একেবারেই কিছু না। কেন?' ওদের ওপর চোখ বুলালাম আবার। 'কারণ নীচতলার শরীরটার কখনও মৃত্যু হয়েছে বলে বিশ্বাস করি না আমি। মৃত্যুর কোনও কারণ নেই। কারণ মৃত্যু ঘটেনি ওটার। মৃত্যু ঘটেনি কারণ ওটা কখনও জীবিত ছিল না।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে গদি-মোড়া সোফায় বসে পড়লাম। 'এই হলো আমার বক্তব্য। আর কিছু শুনতে চান?'

'না,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন শরিফ ভাই। দুই নারী নীরবে লক্ষ করছে আমাদেরকে। 'যথেষ্ট শুনেছি। ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া দরকার ছিল আমার।'

'কেট,' আমি তাকালাম ওর দিকে–'তোমার কী মনে হয়?'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল ক্যাথি, কোঁচকানো ভুরু। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'আমি–স্তম্ভিত। আমার এখন ড্রিঙ্কটা দরকার।'

হেসে ফেললাম আমরা। চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেলেন শরিফ ভাই, ফিওনা বলল, 'আমি নিয়ে আসি।' সিধে হলো ও। 'সবার জন্য আনব তো?' আমরা সবাই হ্যাঁ বললাম।

আমরা ওর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। জায়গা বদল করলাম। জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকলাম বাইরে। ফিরল ফিওনা। সবার হাতে একটা করে গ্লাস ধরিয়ে দিল। শরিফ বললেন, 'আমি যা ভাবছি ফিওনারও সেরকমই ধারণা। ওই জিনিসটার ব্যাপারে আমার অনুভূতির কথা জানাইনি ওকে। জিনিসটা ওকে দেখতে দিয়েছি। ওর অভিমত আমার সঙ্গে মিলে গেছে। ও-ই মেডেলের সঙ্গে জিনিসটার তুলনা করেছে। ওয়াশিংটনে একবার মেডেল বানাতে দেখেছি আমরা।' ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লেন। মাথা নাড়লেন। 'সারাদিন বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছি আমরা। তারপর ঠিক করলাম তোমার কাছে যাব।'

'এটার ব্যাপারে আর কাউকে বলেছেন?'

'না।'

'পুলিশকে জানাননি কেন?'

'জানি না।' আমার দিকে তাকালেন শরিফ ভাই। মুচকি হাসি

ঠোঁটের কোণে। 'তুমি ওদেরকে বলবে?'

'না।'

'কেন না?'

আমিও হাসলাম। 'জানি না। তবে জানাব না।'

'হুঁ,' সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন শরিফ। আমরা ড্রিঙ্ক শেষ করতে লাগলাম দীর্ঘ সময় নিয়ে। শরিফ গ্লাসের বরফে অলস ভঙ্গিতে ঝাঁকি দিলেন, মিষ্টি রিনিঝিনি শব্দ তুলল। ওদিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে পুলিশে এ-মুহূর্তে ব্যাপারটা জানাবার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে আমাদের। তা ছাড়া পুলিশ করবেইটা বা কী? এটা তো শুধু একটা শরীর নয়।' কাঁধ ঝাঁকালেন, চেহারা গম্ভীর,–'ভয়ঙ্কর কিছু। কিন্তু–ঠিক জানি না এটা কী–', গ্লাস থেকে মুখ তুললেন, একে একে তাকালেন সবার দিকে। 'আমি শুধু জানি আমাদের কোনোরকম ভুল করা চলবে না। কোনও ভুল করে বসলে ভয়ানক কিছু একটা ঘটবে।'

আমি বললাম, 'যেমন?'

'বলতে পারব না আমি,' জানালার দিকে তাকালেন শরিফ একমুহূর্তের জন্য। তারপর চাইলেন আমাদের দিকে। মৃদু হাসলেন। 'আমার সাংঘাতিক ইচ্ছে করছে...ইচ্ছে করছে সরাসরি হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলি। কিংবা সেনাবাহিনী, এফবিআই অথবা নৌবাহিনীপ্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করি।' ব্যাপারটা কল্পনা করে তৃপ্তির হাসি ফুটল মুখে। তারপর ম্লান হয়ে এল হাসি। 'রায়হান আমার একজনকে দরকার–এমন কেউ যে একদম গোড়া থেকে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারবে। আমি চাই সে যা করা উচিত তা করবে। কোনোরকম ভুল করবে না। তবে এটা পুলিশের কাজ নয়। এটা–' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি, কথাটা পুনরাবৃত্তি হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে বিরতি দিলেন।

'আমি বুঝতে পারছি,' বললাম আমি। 'আমিও আপনার সঙ্গে একমত। কাজটা ঠিকমত করতে হবে।' একটু বিরতি দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'শরিফ ভাই, আপনার উচ্চতা কত?'

'পাঁচ ফুট সাত। কেন?'

'নীচের লোকটা কতটুকু লম্বা বলে মনে হয়?' আমার দিকে একমুহূর্ত চেয়ে রইলেন শরিফ, তারপর বললেন–

'পাঁচ ফুট সাত।'

'আপনার ওজন কত?'

'একশো চল্লিশ,' মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'নীচের ওটারও একই সমান ওজন। তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। ওটার সঙ্গে আমার উচ্চতা এবং ওজন মিলে যায়। যদিও চেহারাটা আমার মত নয়।'

'কিংবা অন্য কারও মত নয়। আপনার কাছে কালির প্যাড আছে?'

স্ত্রীর দিকে ঘুরলেন শরিফ ভাই। 'আছে?'

'কী?'

'কালির প্যাড। রাবার স্ট্যাম্পে যে জিনিস ব্যবহার করো।'

'হ্যাঁ।' সিধে হলো ফিওনা। ঘরের কোনার ডেস্কের সামনে গেল। 'ওখানে একটা থাকার কথা।' একটা কালির প্যাড পেয়ে গেল ও। শরিফ প্যাডটা ওর হাত থেকে নিলেন। আরেকটা দেরাজ খুললেন। বের করলেন একখণ্ড সাদা কাগজ।

ডেস্কের দিকে পা বাড়ালাম আমি। ক্যাথিও। শরিফ ডানহাতের পাঁচ আঙুলে কালি মেখে নিলেন। আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন হাতটা। আমি সাদা কাগজে সাবধানে ওঁর হাতের ছাপ নিলাম। তারপর স্ট্যাম্প প্যাড এবং কাগজ নিয়ে দরজার দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইলাম, 'মেয়েরা যাবে?'

পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ক্যাথি ও ফিওনা। বিলিয়ার্ড টেবিলে আবার ফিরে যেতে মন চাইছে না। আবার এখানে থাকতেও ইচ্ছে করছে না। ক্যাথি বলল, 'যাব।' ফিওনা মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল।

নীচে নেমে বিলিয়ার্ড টেবিলের ওপরের আলোটা জ্বেলে দিলেন শরিফ। মৃদু দুলল ওটা, আমি হাত বাড়িয়ে স্থির করলাম শেড। আমার আঙুল কাঁপছে। শেডটা এখনও অল্প দুলছে। টেবিলের কিনারে আলোর

ছটা পৌঁছাল, সেখান থেকে পিছলে এল লাশটার ফোলা চোখে। মনে হলো লাশটা যেন নড়ে উঠল। আমি কাঁপা হাতে শেডের কাঁপুনি থামালাম। মুখটার দিকে তাকালাম না। ওটার হাতের পাঁচ আঙুলে ভাল করে মেখে নিলাম কালি। তারপর শরিফের হাতের ছাপ নেওয়া কাগজটা। টেবিলের চওড়া কিনারায়, লাশটার ডানহাতের পাশে রাখলাম। হাতটা শূন্যে তুললাম, সাদা কাগজে প্রতিটি আঙুলের ছাপ নিলাম, শরিফের হাতের ছাপের ঠিক নীচে। তারপর কাগজ থেকে সরিয়ে নিলাম হাত।

ছাপ দেখে গুঙিয়ে উঠল ক্যাথি। বমিবমি ভাব হলো আমার। কাগজে আঙুলের কোনও ছাপই পড়েনি। শুধু পাঁচটা কালো বৃত্ত ছাড়া। আঙুল থেকে ভাল করে কালি মুছে নিয়ে ঝুঁকলাম আমরা। আলোয় ভাল করে লক্ষ করছি। শিশুর মসৃণ গালের মত আঙুলের গাঁট। ফিওনা বিড়বিড় করল, 'শরিফ, আমার শরীর খারাপ লাগছে।' ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল, চট করে ওকে ধরে ফেললেন শরিফ। দোতলায় নিয়ে গেলেন।

আবার লিভিংরুমে এসে বসলাম আমরা। শরিফকে বললাম, 'আপনি ঠিকই বলেছেন ওটা ব্লাঙ্ক, অসমাপ্ত একটা কাজ। চূড়ান্ত ইমপ্রেশন এখনও বাকি।'

মাথা দোলালেন শরিফ। 'এখন কী করব আমরা? কোনও বুদ্ধি আসছে না মাথায়?'

'হুঁ,' একমুহূর্ত ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। 'বুদ্ধি নয়। পরামর্শ বলতে পারেন। পরামর্শটা আপনি কাজে না-লাগাতেও পারেন। কেউ আপনাকে দোষ দেবে না। বিশেষ করে আমি তো নয়ই।'

'কী সেটা?'

'আবারও বলছি এটা কিন্তু স্রেফ একটা পরামর্শ,' গদি-মোড়া সোফার সামনের দিকে ঝুঁকলাম আমি । ফিরলাম ফিওনার দিকে। 'যদি মনে হয় পরামর্শটা গ্রহণযোগ্য নয়, গ্রহণ কোরো না।' আবার তাকালাম শরিফের দিকে। 'ওটা যেখানে আছে সেখানেই থাকুক। আজ রাতে নাক ডেকে ঘুমাব। আমি আপনাকে ঘুমের ওষুধ দেব।'

তাকালাম ফিওনার দিকে। 'তবে তুমি জেগে থাকবে। একমুহূর্তের জন্যও ঘুমানো চলবে না। পারলে একঘণ্টা পরপর নীচে যাবে। দেখে আসবে ওটার কী অবস্থা। কোনোরকম পরিবর্তন চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে উপরে। শরিফ ভাইকে ডেকে তুলবে ঘুম থেকে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে–সোজা চলে আসবে আমার বাসায়।'

শরিফ ভাই তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, 'তুমি যদি ব্যাপারটা সহ্য করতে না-পারো তা হলে এক্ষুনি "না" বলে দাও।'

ঠোঁট কামড়াল ফিওনা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কার্পেটের দিকে। তারপর মুখ তুলল। প্রথম চাইল আমার দিকে, তারপর স্বামীর দিকে। 'ওটা... কীরকম দেখাবে? মানে যদি পরিবর্তন শুরু হয়?'

কেউ জবাব দিল না। কার্পেটে ফিরে এল ফিওনার চোখ, আবার কামড়াচ্ছে ঠোঁট। তবে প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করল না। 'শরিফ কি সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে জাগবে?' আমার দিকে তাকাল ও। 'ওকে যে-কোনও সময় ঘুম থেকে তুলতে পারব আমি?'

'হ্যাঁ। মুখে একটা চড় কষালেই জেগে উঠবেন শরিফ ভাই। এখন শোনো, ভাবি। যদি কিছু নাও ঘটে অথচ ব্যাপারটা তুমি সহ্য করতে পারছ না, তবু ওকে জাগিয়ে দিও। এ বাড়িতে থাকতে ভয় লাগলে আমার ওখানে চলে এসো।'

মাথা ঝাঁকাল ফিওনা। আবার তাকাল কার্পেটের দিকে। অবশেষে বলল, 'মনে হয় থাকতে পারব,' শরিফের দিকে চাইল ও, কপালে ভাঁজ। 'ওকে যেহেতু যে-কোনও সময় জাগিয়ে তোলা যাবে, মনে হয় একা থাকতে ভয় লাগবে না আমার।'

'আমরা ওর সঙ্গে থাকতে পারি না?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথি। কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'জানি না আমি। তবে মনে হয় না-থাকাই উচিত। এতে কতদূর কী কাজ হবে বুঝতে পারছি না। তবে আমার মন বলছে এ-বাড়িতে শুধু শরিফ ভাইদেরই থাকা উচিত।'

শরিফ ভাই সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন। স্ত্রীর দিকে

তাকিয়ে বললেন, 'আমরা চেষ্টা করব।'

আমরা আরও অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। তবে কথা বললাম কমই। রাত বারোটার দিকে, শহরের বেশিরভাগ আলো নিভে যেতে। ক্যাথি আর আমি সিধে হলাম চলে যাওয়ার জন্য। শরিফ দম্পতি এল আমাদের সঙ্গে শরিফ ভাইয়ের গাড়িটা নিয়ে যেতে। সিনেমা হল-এর পার্কিং লটে ওটা পার্ক করা। ওরা গাড়িতে চড়ার আগে আমি ফিওনাকে শেষবারের মত মনে করিয়ে দিলাম শরিফকে কখন ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে হবে। শরিফকে সেকোনাল ট্যাবলেট দিলাম। বললাম একটা বড়ি খেলেই ঘুম এসে যাবে। ওরা শুভরাত্রি বলল। চড়ে বসল গাড়িতে। মৃদু হাসলেন শরিফ। ফিওনা কিছু বলল না। ওর মুখ শুকনো। হাত নেড়ে বিদায় জানালাম আমরা। চলে গেল ওরা।

খালি রাস্তা ধরে বাড়ির দিকে ছুটলাম আমরা। ক্যাথি মৃদু গলায় বলল, 'এর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে, না, বায়হান? শীলার ঘটনার সঙ্গে এটার?'

ওর দিকে চট করে তাকালাম একবার। উইণ্ডশিল্ড দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ক্যাথি। 'তোমার কী মনে হয়?' স্বাভাবিক গলায় জানতে চাইলাম। 'এ দুয়ের মধ্যে কোনও সর্ম্পক আছে?'

'হ্যাঁ,' আমার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল ক্যাথি। এক মুহূর্ত পরে যোগ করল, 'শীলার মত আরও ঘটনা আছে কি?'

'আছে দু'একটা,' অ্যাসফল্টের রাস্তায় হেডলাইটের আলোয় চোখ রেখে বললাম আমি। আড়চোখে তাকালাম ওর দিকে। প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইছি।

তবে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না ক্যাথি। কোনও মন্তব্যও করল না। ওর বাড়ির রাস্তা ধরলাম। ওর বাড়ির সামনে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড় করালাম গাড়ি। এখনও উইণ্ডশিল্ডে তাকিয়ে আছে ক্যাথি, বলল, 'রায়হান, ভেবেছিলাম ছবি দেখার পর কথাটা বলব তোমাকে।'

গভীর দম নিল। 'গতকাল সকাল থেকে,' আস্তে আস্তে শুরু করল ও, গলার স্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করল, 'আমার মনে হচ্ছে,'–কথাটা শেষ করল আতঙ্কিত কণ্ঠে–'আমার বাবা আদৌ আমার বাবা নয়।'

বাড়ির অন্ধকার বারান্দার দিকে ভীত চোখে একবার তাকিয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল ক্যাথি। কাঁদতে শুরু করল।

পাঁচ

ক্রন্দনরত নারীদের কীভাবে সান্ত্বনা দিতে হয় জানি না আমি। তবে বইয়ে পড়েছি নারী কাঁদতে থাকলে পুরুষ তাকে জড়িয়ে ধরে রাখে। নারীকে তার ইচ্ছেমত কাঁদতে দেয়। আমিও ক্যাথিকের জড়িয়ে ধরে রইলাম। ওকে কাঁদতে দিলাম। বুঝতে পারছি না এ ছাড়া কী করব বা বলব। শরিফের বেজমেন্টে কিছুক্ষণ আগে যা দেখে এসেছি এখন যদি ক্যাথির ধারণা হয় ওর বাবা নকল, আসল বাবা নয়, ওর সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করার মানে হয় না।

ক্যাথির বাড়ির সামনের নির্জন রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে রেখেছি আমি। ওকে জড়িয়ে ধরা। ওর মুখ আমার বুকে। ওর জন্য টেনশন হচ্ছে আমার, আতঙ্ক বোধ করছি। তবে একই সঙ্গে ক্যাথির উষ্ণ স্পর্শ ভালও লাগছে।

কান্না থেমে গিয়ে যখন ঘনঘন নাক টানার শব্দে পরিণত হলো, আমি বললাম, 'আজ রাতটা আমার ওখানে থাকবে?'

'না,' উঠে বসল ক্যাথি। মাথা নিচু করা। ফলে মুখ দেখতে পাচ্ছি না। পার্স হাতড়াতে শুরু করল। 'আমি ভয় পাইনি, রায়হান।' শান্ত গলায় বলল ও। 'দুশ্চিন্তায় আছি।' রুমাল বের করে জলের দাগ মুছতে লাগল। 'বাবা অসুস্থ' বলে চলল ও–'যদিও সে আমার আসল বাবা নয়–তবু এ সময়ে আমি অন্য কোথাও যেতে চাই না।' আমার দিকে তাকাল ও, হাসল। হঠাৎ ঝুঁকে এল সামনে, চুমু খেলো আমার মুখে। উষ্ণ চুমু। তারপর গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল। 'শুভ রাত্রি, রায়হান। সকালে ফোন কোরো।' ইটের রাস্তা ধরে বাড়ির অন্ধকার বারান্দার দিকে পা বাড়াল দ্রুত।

ওকে যেতে দেখলাম আমি। তাকিয়ে রইলাম চমৎকার দেহসৌষ্ঠবের দিকে। কর্কশ নুড়ি পাথরে জুতোর ঘষায় কড়মড় শব্দ হচ্ছে। শুনলাম হালকা পায়ে সিঁড়ি বাইল ও, দেখলাম বারান্দার আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পর সামনের দরজা খুলল, ওর পেছনে বন্ধ হয়ে গেল। আমি বসে বসে ওর সঙ্গে কাটানো সন্ধের কথা ভাবলাম। ক্যাথি নিঃসন্দেহে চমৎকার একটি মেয়ে। ওকে নিয়ে সেক্সের চিন্তাও এল মনে। মাথা ঝেড়ে দূর করে দিলাম ভাবনাটা। মুচকি হেসে চালু করলাম গাড়ির ইঞ্জিন। মাত্র বিয়েটা ভেঙেছে আমার। এখনই সিরিয়াস কিছুতে জড়ানো ঠিক হবে না। মোড় ঘোরার সময় একবার তাকালাম ক্যাথির বাড়ির দিকে। তারার আলোয় সাদা বড় বাড়িটা ফ্যাকাসে দেখাল। ওর কথা অবশ্য মন থেকে দূর করে দিতে পারলাম সহজেই। নিঝুম শহরের রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে শরিফ-দম্পতির কথা ভাবতে লাগলাম।

শরিফ ভাই এখন ঘুমাচ্ছেন সন্দেহ নেই। ফিওনা হয়তো লিভিংরুমে বসে রাতের শহরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হয়তো আমার গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখছে। যদিও জানে না এ গাড়িতে আমি আছি। কল্পনায় দেখলাম কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে ফিওনা, ওর পায়ের ঠিক নীচের বিলিয়ার্ড রুমের আতঙ্ক নিয়ে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করছে। শক্তি সঞ্চয় করছে ওখানে যাওয়ার জন্য। ওকে আলো জ্বালতে হবে। তারপর চোখ নামিয়ে দেখতে হবে সবুজ টেবিলের ওপর শোয়ানো মোমের মত সাদা জিনিসটাকে।

ঘন্টা দুই পরে ফোন বাজল। বিছানার বাতি তখনও নেভাইনি। বই পড়ছিলাম। শীঘ্রি ঘুম আসবে আশাও করিনি। ফোনের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে ঘড়িতে আটকে গেল চোখ। রাত ৩-টা।

'হ্যালো,' বললাম আমি। শুনতে পেলাম অপরপ্রান্তে রিসিভার ক্রেডলে ঠকাশ করে বাড়ি খেল। 'হ্যালো,' বললাম আবার। টুনটুন শব্দ ভেসে এল। তারপর আর কোনও সাড়া নেই। লাইন ডেড। আমি নামিয়ে রাখলাম ফোন।

বিছানার কোণে বসে ফোনের চোদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করতে লাগলাম

আমি। ফোনের যন্ত্রণায় আর বাঁচি না। যখন-তখন ফোন আসে। ঘুমাতে দেয় না। যখন একা থাকতে চাই, মহিলারা ফোন করে বিরক্ত করে। নিজের চিন্তায় বুঁদ হয়ে আছি, ক্রিরিরিং শব্দে বেজে ওঠে মূর্তিমান যন্ত্রণা, ছিঁড়ে দেয় ভাবনার সুতো। বাতি নিভিয়ে দিলাম। ঘুম আসছে, বারান্দার সিঁড়িতে পায়ের শব্দে ভেঙে গেল চটকা। বেজে উঠল ডোর-বেল। নিস্তব্ধ রাতে অস্বাভাবিক জোরে শোনাল। সামনের দরজার কাচে কেউ অসহিষ্ণুভাবে টোকা দিচ্ছে।

শরিফ দম্পতি। ফিওনার চোখ বিস্ফারিত, মুখটা কাগজের মত সাদা, মুখে রা নেই। শরিফের চোখ অস্বাভাবিক শান্ত। ওদেরকে ভেতরে আসতে বললাম আমি। ফিওনাকে প্রায় বয়ে নিয়ে এলাম সিঁড়ি বেয়ে। ঢুকলাম গেস্টরুমে। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে একটা কম্বল টেনে দিলাম গায়ে। শিরায় সোডিয়াম অ্যামিটাল পুশ করলাম।

বিছানার কিনারায় বসলেন শরিফ ভাই। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন স্ত্রীর দিকে। কুড়ি মিনিটের মত। ফিওনার হাত ধরে রাখলেন নিজের মুঠোয়। স্থির দৃষ্টি মুখে। আমি ঘরের বড় আরামকেদারায় বসে আছি। অবশেষে আমার দিকে মুখ তুলে চাইলেন শরিফ ভাই। আমি স্বাভাবিক গলায় বললাম, 'ভাবি অনেকক্ষণ ঘুমাবে, শরিফ ভাই। সকাল ৮টা-৯টা পর্যন্ত। ঘুম থেকে জেগে উঠবে খিদে নিয়ে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আমার কথা শুনে সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন শরিফ। আরও অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন স্ত্রীর দিকে। তারপর সিধে হলেন, পা বাড়ালেন দরজার দিকে। আমি ওর পেছন পেছন এগোলাম।

আমার লিভিংরুমটা বেশ বড়। ধূসর রঙের কার্পেটে মোড়া মেঝে। কাঠের কাজগুলো সাদা রঙের, আসবাবগুলো নীল। বাবা-মা পঞ্চাশের দশকে এগুলো কিনেছেন। বেশ সাজানো গোছানো ঘর। ড্রিঙ্ক হাতে লিভিংরুমে বসলাম আমরা। গ্লাসে বারকয়েক চুমুক দিলেন শরিফ মেঝেতে চোখ রেখে। তারপর কথা বলতে শুরু করলেন। 'ফিওনা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। আমার শার্ট খামচে ধরে ঝাঁকাচ্ছিল। জামাকাপড় পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। এত জোরে

মুখে চড় মারে যে আমার দাঁত নড়ে যায়–' শরিফ ভুরু কুঁচকে তাকালেন, সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করলেন শব্দ–'গোঙাচ্ছিল ও আমার নাম ধরে ডেকে, শরিফ...শরিফ...শরিফ...'

দৃশ্যটা মনে পড়তে মাথা নাড়লেন শরিফ ভাই, বারকয়েক নীচের ঠোঁট কামড়ালেন, তারপর মস্ত চুমুক দিলেন ড্রিঙ্কের গ্লাসে। 'ঘুম ভেঙে গেল আমার। ওকে মৃগী রোগীর মত লাগছিল। কিছুই বলছিল না। স্রেফ বিস্ফারিত, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আমার দিকে। তারপর ঝড়ের বেগে ঘুরল, এক ছুটে ফোন তুলল, তোমার নম্বরে ডায়াল করল। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষায় থাকল, তারপর আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে ঠাস করে রেখে দিল ফোন, কাঁদতে শুরু করল–খুব আস্তে, যেন কেউ শুনে ফেলবে ওর কান্না–বলল ওকে ওখান থেকে নিয়ে যেতে।'

আবার মাথা নাড়লেন শরিফ। তিরতির করে কাঁপল গালের পেশি। আমি কোনোকিছু না-ভেবেই ওর হাত চেপে ধরে বেজমেণ্টের সিঁড়ি বেয়ে গ্যারেজের দিকে এগোলাম। তখন আমার সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল ফিওনা। হাত ছুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল, ধাক্কা দিল আমার কাঁধে। ওকে ভয়ংকর লাগছিল। ছেড়ে না দিলে নখ দিয়ে আমার মুখ চিরে দিত ও। আমরা সদর দরজা খুলে বেরুলাম। সিঁড়ি বেয়ে নামছি, ফিওনা একছুটে সামনে চলে গেল। গ্যারেজের ধারে এল না। দাঁড়িয়ে রইল রাস্তায়। বাড়িটির কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চাইছিল ও । আমি গাড়ি বের করলাম।

ড্রিঙ্কের গ্লাসে আরেকটা চুমুক দিলেন শরিফ ভাই। লিভিংরুমের জানালা দিয়ে কালো রাত দেখছেন। 'আমি ঠিক জানি না ও কী দেখেছে, রায়হান–' আমার দিকে ঝুঁকে এলেন–'তবে অনুমান করতে পারি। তুমিও পারবে। তবে নিজে গিয়ে কিছু দেখার সুযোগ পাইনি। ফিওনাকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে আসাটাই জরুরি ছিল। নীচে কী দেখেছে কিছুই বলেনি আমাকে ও। গাড়িতে বসে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বারবার কেঁপে উঠছিল আর বলছিল, "শরিফ, ওহ, শরিফ, শরিফ, শরিফ।" আমার দিকে গম্ভীর চেহারা নিয়ে তাকালেন শরিফ।

'আমরা একটা ব্যাপার প্রমাণ করেছি, রায়হান।' বললেন তিনি। 'এক্সপেরিমেন্টে কাজ হয়েছে বলেই আমার ধারণা। এখন কী?'

আমি বিড়বিড় করলাম, 'ওটাকে আমার আরেকবার দেখতে হবে।'

'আমিও দেখব। তবে এ মুহূর্তে ফিওনাকে একা রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। ও জেগে উঠে আমাকে খুঁজবে। আমার সাড়া না-পেয়ে যদি দেখে বাড়িতে কেউ নেই–স্রেফ পাগল হয়ে যাবে মেয়েটা।'

আমি কিছু বললাম না। এটা সম্ভব–যে কারও জীবনে ঘটতে পারে এমন ঘটনা। আমি একাই গাড়ি নিয়ে শরিফ ভাইয়ের বাসায় যাব ভাবলাম। কল্পনায় দেখলাম খালি বাড়িটার পাশে গাড়ি থামিয়েছি আমি, বেরিয়ে এসেছি দরজা খুলে, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি। তারপর তাকিয়েছি খোলা গ্যারেজের দিকে, ধীর কদমে এগোচ্ছি আঁধারে ঢাকা বেজমেন্টের দিকে, দেয়ালে হাতড়ে বেড়াচ্ছি বাতির সুইচ। নিজেকে কল্পনা করলাম নিকষ কালো আঁধারে ঢাকা বিলিয়ার্ড রুমে, এগোচ্ছি টেবিলের দিকে, জানি ওখানে কী শুয়ে আছে। ক্রমে ওটার কাছে যাচ্ছি, হাত তুলেছি ওটার স্পর্শ পাবার জন্য। তবে মনে-মনে আশা করছি টেবিল ছোঁবে আমার হাত; ঠাণ্ডা, মরা চামড়ার স্পর্শ পাব না। কল্পনা করলাম টেবিলে ধাক্কা খেয়েছি আমি, অবশেষে মাথার ওপরের আলোটা খুঁজে পেয়েছি, ওটা ঘুরিয়ে নিয়েছি, চোখ নামালাম ওটার দিকে–যেটার ভয়ে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল ফিওনা। মনে মনে লজ্জা পেলাম আমি নিজে যা করতে চাইনি সে-কাজই করিয়েছি ফিওনাকে দিয়ে। আমি একা রাতের বেলা ও-বাড়িতে যেতে চাই না।

হঠাৎ রেগে উঠলাম নিজের ওপর। সেইসঙ্গে মনকেও বোঝালাম এখন ওখানে যাওয়ার উপযুক্ত সময় নয়। রাগটা ঝাড়লাম শরিফ ভাইয়ের ওপর। ঝট করে দাঁড়িয়ে গেলাম। কটমট করে তাকালাম তাঁর দিকে। 'শুনুন, আমরা ওটাকে নিয়ে যা-ই করি না কেন, কাজটা শুরু করতে হবে এখনই। আপনি কী বলেন? মাথায় কোনও বুদ্ধি খেলছে? আমরা কী করব, ফর গডস শেক!' রাগে গাঁকগাঁক করে উঠলাম আমি।

'আমি জানি না,' ধীরে ধীরে বললেন শরিফ। 'তবে সাবধানে এগোতে হবে আমাদেরকে। নিশ্চিত হতে হবে যে আমরা ঠিক

কাজটাই করছি...'

'আপনি একথা বলেছেন! আজ সন্ধ্যার সময়ই একথা বলছেন আপনি। আমি আপনার সঙ্গে একমত। একমত আপনার সঙ্গে। কিন্তু কী নিয়ে? সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সারাটা জীবন অপেক্ষা করতে পারব না।' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি শরিফের দিকে। তারপর জোর করে শান্ত করলাম নিজেকে। চোখ টিপলাম শরিফের দিকে তাকিয়ে বোঝাতে যে ঠিক আছি আমি। নীচে নেমে এলাম ফোন করতে। ডায়াল করলাম একটা নম্বরে।

রিং বাজতে লাগল। মুচকি হাসি ফুটল আমার ঠোঁটে। এত রাতে ড. জন কোয়েলসকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলব ভাবতে বেশ আনন্দ লাগছে আমার। ও নিশ্চয় মনে-মনে আমার চোদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করবে।

'হ্যালো, জনি?' ও প্রান্তে সাড়া পেতে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ।'

'শোনো,' কণ্ঠে অনুনয় ফোটালাম। 'ঘুমাচ্ছিলে নাকি?'

খ্যাঁকখ্যাঁক করে উঠল জন। 'না। ফুটবল খেলছিলাম। কী জন্য ফোন করেছ বলো?'

'শোনো, জনি,' সিরিয়াস গলায় বললাম এবার। 'একটা ঘটনা ঘটেছে। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। যত দ্রুত সম্ভব আমার এখানে চলে এসো। খুব জরুরি।'

জন খুব দ্রুত চিন্তা করে, সিদ্ধান্তও নিতে পারে চটজলদি। ওকে কোনোকিছু দ্বিতীয়বার ব্যাখ্যা করতে হয় না। একমুহূর্ত নীরব থাকল সে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। আসছি আমি।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম একটা। ঘরের কোণে আমার চেয়ারের পাশে চলে এলাম। মদের গ্লাসে চুমুক দিলাম আবার। যে-কোনও জরুরি ব্যাপারে জনকে আমার পাশে সবার আগে চাইব আমি। ও আসছে। শরিফ ভাইকে কী যেন বলার জন্য মুখ খুলেছি, হঠাৎ ঠাণ্ডা ঘাম ফুটল কপালে। অনেকক্ষণ চলৎশক্তিহীন রোগীর মত দাঁড়িয়ে রইলাম ওখানে। একটা কথা মনে পড়তে ভয়ে শরীরের ভেতরটা জমে গেছে হঠাৎ।

এ-বিষয়টা নিয়ে আরও আগে ভাবা উচিত ছিল আমার। কিন্তু ব্যাপারটা একদমই মাথায় আসেনি। আতঙ্কিত আমি বুঝতে পারছি একটা সেকেণ্ডও নষ্ট করার মত সময় নেই হাতে। পায়ে ইলাস্টিকের চপ্পল, একছুটে হলঘরে চলে এলাম। চেয়ারে রাখা হালকা টপ কোটটা নিলাম, গায়ে জড়াতে জড়াতে পা বাড়ালাম সদর দরজার দিকে। আমার মাথায় এখন একটাই চিন্তা—ছুটতে হবে। আমি শরিফের চিন্তা দূর করে দিলাম মাথা থেকে, ভুলে গেলাম জন আসছে, তীর বেগে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। লন ধরে ছুটছি। ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়-করানো আমার গাড়ি। দরজায় হাত রাখতেই মনে পড়ল গাড়ির চাবি ফেলে এসেছি দোতলায়। এখন চাবি আনার সময় নেই। ছুটতে শুরু করলাম আমি। যত দ্রুত সম্ভব দৌড়ে চলেছি। জানি না কেন, মনে হলো ফুটপাত আমার গতিরোধ করতে চাইছে, পা চেপে ধরছে। ফুটপাত ছেড়ে লনের ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটলাম। মিলভ্যালির অন্ধকার, নির্জন রাস্তায় পাগলের মত দৌড়াচ্ছি আমি।

প্রথম দুটো ব্লকে জীবনের চিহ্নমাত্র নেই। রাস্তার পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলো নীরব এবং খালি। শুধু পেভমেণ্টে আমার চপ্পলের থপথপ আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলছে। আর আমার ঘনঘন নিশ্বাসের শব্দ। ঠিক সামনে, দুমুখো রাস্তার সংযোগস্থলের পেভমেণ্ট আলোকিত হয়ে উঠল। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুটো আলোকবিন্দু। একটা গাড়ি আসছে হেডলাইট জ্বেলে। আমার মাথা কাজ করছে না, আমি কিছু ভাবতে পারছি না, সোজা আলোর ধারাদুটোর দিকে ছুটে গেলাম। কিচ্‌চ্‌ করে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলল ব্রেক, পেভমেণ্টে রাবার ঘষা খাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম, বাম্পারের ক্রোমের কিনারা আমার কোটে বাড়ি খেল। 'কুত্তার বাচ্চা!' ভয় আর রাগ নিয়ে বলে উঠল একটা পুরুষকণ্ঠ। 'চোখের মাথা খেয়েছিস ব্যাটা!' লোকটা আরও গালাগাল দিল। তবে তার কণ্ঠ ক্রমে ম্লান হয়ে এল। আমি তাকে পেছনে ফেলে ছুটে চলেছি অন্ধকারের মধ্যে।

ছয়

ক্যাথির বাড়ির সামনে যখন পৌঁছলাম, চোখে কিছুই ঠাহর হচ্ছিল না। পাঁজরের গায়ে প্রচণ্ড জোরে পিটছে হৃৎপিণ্ড, চোখের পেছনে এসে যেন জমা হয়েছে সমস্ত রক্ত, ঝাপসা করে তুলেছে দৃষ্টি। ফোঁসফোঁস শব্দে নিশ্বাস ফেলছি আমি। ক্যাথির বাড়ির বেজমেন্টের প্রতিটি জানালায় ভেতরের দিকে সর্বশক্তি দিয়ে ধাক্কা দিলাম। সবগুলো জানালা বন্ধ। বাড়িটার চারপাশে একবার চক্কর দিলাম। শেষে কোটের কিনারায় হাত পেঁচিয়ে নিলাম। জানালার কাচে ঠেকিয়ে ধাক্কা দিতে লাগলাম। ক্রমে বাড়িয়ে চললাম চাপ। হঠাৎ মট্ করে ভেঙে গেল কাচ। একটুকরো পড়ল ভেতরের দিকে, ড্রপ্ খেয়ে ঝনঝন শব্দে ভাঙল। আরেক খণ্ড ভাঙা কাচ ভেতরের দিকে ঝুলে রয়েছে। আমি সাবধানে টুকরোগুলো সরালাম। প্রশস্ত হলো জানালার গর্ত। ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিলাম হাত। ছিটকিনি টেনে খুলে ফেললাম জানালা। প্রথমে পা গলিয়ে দিলাম জানালার ভেতরে, তারপর গোটা শরীর। পিছলে নেমে এলাম মেঝেতে। কোটের পকেট হাতড়ে বের করে নিলাম ফাউন্টেন পেন আকারের ফ্ল্যাশলাইট। বেজমেন্টের মেঝেতে দাঁড়িয়ে জ্বেলে দিলাম সুইচ।

সরু আলোর রেখাটা প্রশস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। হাত দুই সামনে কিছুই চোখে পড়ল না। ধীরে ধীরে ফ্ল্যাশলাইট ঘোরালাম পরিচিত বেজমেন্টের চারপাশে। চোখে পড়ল গাদা-করা খবরের কাগজ, সিমেন্টের দেয়ালে হেলান দেওয়া জং-ধরা একটা স্ক্রিন ডোর, রংজ্বলা কাঠের টেবিল, পুরোনো একটা সিঙ্ক এবং কতকগুলো ছড়ানো-ছিটানো পাইপ। ছয় বাই ছয় মাপের পিলারের গায়ে ধুলোপড়া একটা ছবি দেখতে পেলাম। ক্যাথির হাইস্কুল জীবনের গ্রুপফটো। আতঙ্ক বোধ করলাম। সময় চলে যাচ্ছে দ্রুত। আমি যা খুঁজতে এসেছি তা

এখানে দেখতে পাব কি না জানি না। আর দেখা পেলেও ততক্ষণে খুব বেশি দেরি না হয়ে যায় ভেবে শিরশির করছে গা।

পুরোনো ট্রাঙ্কটা দিয়ে কাজ শুরু করলাম। তালা মারা নেই। ট্রাঙ্কের ডালা উল্টে ভেতরে পুরোনো কাপড়চোপড় ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না। ডাঁই করা খবরের কাগজের মধ্যেও কিছু নেই। স্ক্রিনডোরের পেছনে কিংবা পুরোনো বুককেসেও কিছু পেলাম না। তাকে শুকনো কাদা লাগানো কতকগুলো ফ্লাওয়ার পট। কাঠের একটা বেঞ্চি চোখে পড়ল যন্ত্রপাতিসহ। বেঞ্চির নীচে কতকগুলো তক্তা। যতটা নিঃশব্দে সম্ভব তক্তাগুলো টেনে সরালাম একপাশে। তবু একেবারে শব্দহীনভাবে করা গেল না কাজটা। বেঞ্চির নীচে তক্তা ছাড়া কিছু নেই। ছাদের আড়া লক্ষ্য করে টর্চ মারলাম। আড়ায় ধুলো আর মাকড়সার জাল, শুধু। সময় চলে যাচ্ছে। আমি গোটা বেজমেন্ট খুঁজতে শুরু করলাম। জানি না ঠিক কোথায় খুঁজব। জানালার দিকে তাকালাম একবার ভয়ে ভয়ে। ভোর না হয়ে যায়!

হঠাৎ লম্বা কতকগুলো কাবার্ড চোখে পড়ল। একদিকের দেয়ালের শেষ মাথা ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে ওগুলো। ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত ঠেকে আছে কাবার্ড। ফ্ল্যাশলাইটের আবছা আলোয় প্রথমে ওগুলোকে দেয়াল ভেবেছি। তাই ওদিকে তেমন খেয়াল করিনি। এবার ডাবল ডোরের প্রথম কপাট জোড়া খুললাম। তাকের মধ্যে ক্যানভর্তি নানা জিনিস। পরের কাবার্ডের দরজাও খুললাম। ওই তাকগুলো খালি, ধুলোয় ভরা। তবে মেঝে থেকে ইঞ্চিখানেক একটা তাকের ওপর দেখতে পেলাম ওটাকে।

বর্ণহীন পাইন কাঠের তাকের ওপর চিৎ হয়ে আছে ওটা। চোখ খোলা, বাহুজোড়া নিস্তেজ ভঙ্গিতে পড়ে আছে শরীরের পাশে। আমি ওটার পাশে বসলাম হাঁটু মুড়ে। এখন বুঝতে পারছি ফিওনা কেন আমার ঘরের বিছানায় আতঙ্ক নিয়ে ঘুমাচ্ছে। চোখ বুজে ফেললাম। নিজেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছি প্রাণপণে। আবার মেললাম চোখ, মনে জোর আনলাম জোর করে।

একবার আমার এক বন্ধু তার ডার্করুমে বসে ছবি কীভাবে

ডেভেলপ করতে হয় দেখিয়েছিল। খালি একখণ্ড কাগজ সে সলুশনে চুবিয়ে মৃদু নাড়ছিল। ডেভেলপিং রুমে মৃদু লাল আলো জ্বলছিল। তারপর বর্ণহীন ফ্লুইডের নীচে থেকে ছবিটি আকার পেতে শুরু করে–অস্পষ্ট এবং আবছাভাবে–তবে কী ফুটে উঠছে বোঝা যাচ্ছিল। আর ধুলোভরা তাকের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা এই জিনিসটাও, আমার ফ্ল্যাশলাইটের ম্লান কমলা আলোয় দেখতে পাচ্ছি, অস্পষ্ট, অপরিণত কাঠামো নিয়ে ক্যাথি রেনল্ডসের চেহারা ধারণ করছে।

এটার চুলও ক্যাথির মত বাদামি এবং ঢেউ-খেলানো, কপাল ফুঁড়ে বেরুচ্ছে কেশরাজি। ত্বকের নীচে ফুটে উঠছে হাড়ের কাঠামো; গালের হাড়, থুতনি এবং আকৃতি পেতে চলেছে চোখের চারপাশ। নাকটা সরু, ডগার দিকে খানিকটা প্রশস্ত, এক ইঞ্চির ভগ্নাংশ পরিমাণ নাকটা ছড়িয়ে গেলেই হুবহু ক্যাথির নাক হয়ে উঠবে। ঠোঁটজোড়া প্রায় ক্যাথির টসটসে অধরের আকৃতি পেতে চলেছে–এবং ভয়ংকর ব্যাপার–সুন্দর একখানা মুখের আকার পাচ্ছে। ঠোঁটের দুকোণে ছোট্ট, প্রায় অদৃশ্য একজোড়া খাঁজ যা গত কয়েক বছর ধরে দেখছি ক্যাথির মুখে।

মায়ের পেটে কয়েক সপ্তার আগে শিশুর ত্বক এবং হাড়ের গঠনও নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠা সম্ভব নয়। অথচ ঠাণ্ডা কংক্রিটের মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে মাংস এবং হাড়ের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছি তার রূপান্তর মাত্র শুরু হয়েছে ঘণ্টাকয়েক আগে। বুঝতে পারছি আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রূপান্তর প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটবে।

আমি এরকম ভয়ংকর চোখ জীবনেও দেখিনি। মাত্র একবার ওদিকে তাকিয়েই চোখ বুজে ফেলাম। চোখজোড়া প্রায় ক্যাথির মতই ডাগর ডাগর। তবে ঠিক একই রকম আকারের নয়–যদিও সেরকম আকৃতিই পেতে চলেছে। নীল চোখের দৃষ্টি ফাঁকা। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে তা আর ফাঁকা থাকবে না। হয়ে উঠবে ক্যাথি রেনল্ডসের চোখ। গুঙিয়ে উঠলাম আমি। ঝুঁকে এলাম আরও সামনে।

জিনিসটার কব্জির ঠিক ওপরে, বাম হাতে একটা দাগ। ক্যাথির

হাতেও এরকম দাগ আছে। এটার বাম নিতম্বে একটা আঁচিল, ডান হাঁটুর নীচে পেন্সিলের সরু রেখার মত একটা দাগ। যদিও দেখিনি তবু আমার ধারণা ক্যাথির শরীরেও ঠিক এরকম দাগ নিশ্চয় আছে।

ওখানে, তাকের ওপর শুয়ে আছে ক্যাথি রেনল্ডস–অসমাপ্ত। শুয়ে আছে একটা...অসমাপ্ত স্কেচ যা নিখুঁত, দাগহীন একটা ছবিতে পরিণত হবে। কাজ শুরু হয়ে গেছে, তবে এখনও শেষ হয়নি। কিংবা এভাবেও বলা যায়ঃ ম্লান কমলা আলোয় শুয়ে আছে একটা অস্পষ্ট মুখ, আবছা দেখাচ্ছে পানির নীচে তবে চেহারাটা অন্তত চেনা যায়।

মাথায় ঝাঁকি দিলাম একটা, চোখ সরিয়ে নিলাম অন্যদিকে। ভয় আর উত্তেজনা নিয়ে সিধে হলাম। আড়ষ্ট হয়ে আছে পা। কদম ফেলতে গিয়ে টলে উঠলাম।

তারপর দ্রুত ছুটলাম বেজমেন্টের সিঁড়ির দিকে। একতলার দরজা খোলার চেষ্টা করলাম। বন্ধ। কিচেনে ঢুকে পড়লাম। নিস্তব্ধ ডাইনিংরুম পার হয়ে ঢুকলাম লিভিংরুমে। সাদা রেইলিঙের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। একেকবারে দু'ধাপ পার হয়ে চলে এলাম ওপর তলার হলওয়েতে।

একসারি দরজা। সবগুলোই সম্ভবত বন্ধ। তবু আশায় বুক বেঁধে দ্বিতীয় দরজার হাতল চেপে ধরলাম। মোচড় দিলাম। একটুও শব্দ না করে ইঞ্চি কয়েক খুলে ফেললাম কপাটটা। উঁকি দিলাম। একটা ডাবল বেডে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে কে যেন। আমি মুখের একপাশে টর্চ মারলাম। ক্যাথির বাবা। তিনি নড়ে উঠলেন। কী যেন বিড়বিড় করলেন। চট করে নিভিয়ে দিলাম আলো। নিঃশব্দে বন্ধ করলাম দরজা।

পরের দরজার হাতল চেপে ধরলাম এবার। ইচ্ছে করল লাথি মেরে খুলে ফেলি কপাট। প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে জাগিয়ে তুলি গোটা বাড়ি। ধৈর্যে কুলাল না। ধাক্কা মেরে খুলে ফেললাম দরজা। দ্রুত টর্চ ফেললাম ঘরে। দেখতে পেলাম ক্যাথিকে। ঘুমিয়ে আছে বিছানায়। বেজমেন্টে যে-জিনিসটাকে ফেলে এসেছি তার চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত। লম্বা দুই পা ফেলে চলে এলাম বিছানার পাশে। চেপে ধরলাম

ক্যাথির কাঁধ। গুটিয়ে উঠল ও। তবে ভাঙল না ঘুম। কাঁধের নীচে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। তুললাম বিছানা থেকে। বিছানায় এখন বসে থাকার ভঙ্গিতে রয়েছে ক্যাথি। মাথাটা ঝুলছে আমার হাতের ওপর। ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল।

আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলাম না। মুখে ছোট্ট টর্চটা গুঁজে নিয়ে ক্যাথির গা থেকে হালকা কম্বলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। একটা হাত চালিয়ে দিলাম ওর হাঁটুর নীচে। পাঁজাকোলা করে ধরলাম ওকে। তারপর কাঁধে তুলে নিলাম। একহাতে ক্যাথিকে জড়িয়ে ধরে রেখে অন্যহাতে নিলাম টর্চ। টলতে টলতে পা বাড়ালাম হলঘরে। পা টিপে টিপে এগোচ্ছি—জানি না ইতিমধ্যে কতটা শব্দ করে ফেলেছি। সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম। তারপর দরজা খুলে খালি রাস্তায়।

আমার কাঁধের ওপর ঝুলছে ক্যাথি। ওকে নিয়ে হাঁটতে লাগলাম আমি। কিছুটা রাস্তা যাওয়ার পর মাথা তুলল ও, চোখ এখনও বোজা। আমার গলা জড়িয়ে ধরল। তারপর চাইল চোখ মেলে।

আমি হাঁটতে হাঁটতে তাকালাম ওর দিকে। ঘুম-ঘুম চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে ক্যাথি। কয়েকবার পিটপিট করল চোখ। তারপর ঘুম-জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হচ্ছে, রায়হান?'

'পরে বলব,' ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম আমি। 'কেমন লাগছে তোমার?'

'ঠিক আছি, রায়হান। তবে বড্ড ক্লান্ত।' মাথা ঘুরিয়ে চারপাশটা একবার দেখে নিল ও। 'রায়হান, এসব কী ঘটছে?' আমার দিকে তাকাল, হাসিতে বিস্ময়। 'তুমি কি আমাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছ? তোমার বাড়ি বা অন্য কোথাও?' নীচে তাকাতে দেখতে পেল আমার পরনের বোতাম খোলা কোট এবং পাজামা।

'রায়হান,' ঠাট্টা করল ক্যাথি। 'আর বুঝি তর সইল না? অন্তত ভদ্রলোকের মত আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারতে আসলে কী করতে চাইছ তুমি?'

ওর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসলাম, 'আগে বাড়ি যাই। তারপর সব বলব।' ওর ভুরু কুঁচকে উঠছে দেখে আমার মুখের হাসি

প্রশস্ত হলো। 'ভয় নেই। তোমার কোনও ক্ষতি হয়নি। জন কোয়েলস আছে ওখানে। শরিফ দম্পতিও।'

ক্যাথি আমার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। শিউরে উঠল। বাতাস ঠাণ্ডা। ওর পরনে নাইলনের নাইট গাউন। আমাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ও, চোখ বোজা। 'খুব খারাপ,' বিড়বিড় করছে ক্যাথি। 'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অ্যাডভেঞ্চার, আমার বিছানা থেকে আমাকে তুলে এনেছে পাজামা-পরা এক সুদর্শন পুরুষ। রাস্তা দিয়ে আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে যেন আমি এক বন্দি নারী। এরপর সে আমাকে প্রস্তাব দেবে।' চোখ খুলল ও, মুচকি হাসল আমার দিকে তাকিয়ে।

আমার হাত ব্যথায় টনটন করছে। পিঠে মনে হচ্ছে ভোঁতা ছুরি বসিয়ে দিয়েছে কেউ। প্রতিটি কদম ফেলার সময় ঝনঝন করে উঠছে শরীর প্রচণ্ড ব্যথায়। তবে ক্যাথির শরীরের উষ্ণতাও উপভোগ করছি, অস্বীকার করব না।

জন আমার বাসায় চলে এসেছে। ওর গাড়ি দেখতে পেলাম আমারটার পাশে দাঁড় করানো। বারান্দায় ক্যাথিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলাম। নিজে সিধে হয়ে থাকতে পারব কিনা ভেবে সন্দেহ হলো। আমার টপকোটটা ওকে দিলাম। যদিও এটা আরও আগেই দেয়া উচিত ছিল। কোটটা পরল ক্যাথি, বোতাম লাগাল। হাসল। আমরা ঘরে ঢুকলাম। জন এবং শরিফ ভাই বসে আছে লিভিংরুমে।

আমাদেরকে দেখে বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল ওদের। ক্যাথি হাসল। 'হাই' বলল। আমি স্বাভাবিক আচরণই করলাম। ওদের বিস্ময়টুকু উপভোগ করছি। ক্যাথিকে বললাম নাইট গাউন ছেড়ে আমার জামাকাপড় পরে নিতে। ও শীতে কাঁপছে। বললাম আলমারিতে একজোড়া জিনস পাবে। সাদা শার্ট, উলের মোজাও আছে ওখানে। মাথা ঝাঁকিয়ে দোতলায় চলে গেল ক্যাথি।

আমি লিভিংরুমে, খালি একটা চেয়ার দখল করলাম। জন আর শরিফের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মাঝে মাঝে খুব একা লাগে। তখন একজন সঙ্গীর দরকার হয়।'

জন আমার দিকে উদ্বেগ নিয়ে তাকাল। 'সেই একই ঘটনা, না?' দোতলার দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওকে বাড়িতেই পেলে?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। তারপর সিরিয়াস হলাম। 'বেজমেন্টে।'

'বেশ,' উঠে পড়ল জন–'আমি ওদেরকে দেখতে চাই। ওদের যে-কোনও একজনকে। হয় ক্যাথির বাসায় নয়তো শরিফ সাহেবের বাড়িতে।'

মাথা ঝাঁকালাম। 'দেখবে। শরিফ সাহেবের বাড়িতে যাওয়াই ভাল। ক্যাথির বাসায় ওর বাবা আছেন। আমি গায়ে কিছু চাপিয়ে আসছি।'

দোতলায় আমার বেডরুমে চলে এলাম। প্যান্ট, মোজা, শার্ট আর পুরোনো নীল সুয়েটার পরে নিলাম। ক্যাথি বাথরুমে পোশাক বদলাচ্ছে, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বললাম। যা যা ঘটেছে বর্ণনা করলাম সংক্ষেপে। জানালাম শরিফদের বাড়িতে কী ঘটেছে। ক্যাথির বেজমেন্টে কী দেখেছি।

ভয় পাচ্ছিলাম ক্যাথি ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারবে কিনা। কিন্তু ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবে নিল সে। দুজনেই পোশাক পরেছি। হলঘরে পা বাড়ালাম। ক্যাথি আমার দিকে তাকিয়ে উষ্ণ হাসি উপহার দিল। ওকে চমৎকার লাগছে দেখতে। সাদা উলের মোজা, কলার-খোলা হাতা গোটানো শার্টে ছুটি কাটাতে যাওয়া বিজ্ঞাপনচিত্রের তরুণীর মত দেখাচ্ছে।

আমার নীল জিনস প্যান্টটা খাটো হয়ে গেছে অনেক আগে। ক্যাথির উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে গেছে। 'আমরা শরিফ ভাইয়ের বাসায় যাব,' বললাম আমি। 'তুমি যাবে?' যেতে চাইলে মানা করব।

মাথা নাড়ল ক্যাথি। 'না, ফিওনা ভাবির সঙ্গে কারও থাকা দরকার। তোমরা যাও।' ঘুরল ও, ফিওনার ঘরের দিকে পা বাড়াল। আমি নেমে এলাম নীচে।

আমার গাড়িটা নিলাম। সবাই বসলাম সামনের সিটে। কিছুক্ষণ পর শরিফ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কী মনে হচ্ছে, জন?'

মাথা নাড়ল জন, ফাঁকা চোখ ড্যাশবোর্ডের দিকে। 'জানি না। এ

মুহূর্তে কিছুই বলতে পারব না।' পুবের আকাশে তাকালাম। রাস্তা অন্ধকার, তবে আকাশে ভোর হওয়ার ইঙ্গিত, সামান্য আলোর আভাও যেন দেখতে পেলাম।

শরিফ ভাইকে বাড়ির রাস্তায় এসে লো-গিয়ার দিলাম গাড়িতে। ওর বাড়ির সবগুলো আলো জ্বলছে। বোঝা গেল ওরা বাড়ি থেকে আসার সময় আলো নেভাতে সাহস পায়নি। খোলা গ্যারেজের সামনে পার্ক করলাম গাড়ি। নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। ফর্সা হতে শুরু করেছে প্রকৃতি। গাছের কালো কালো রেখাগুলো পরিষ্কার হয়ে উঠছে। শরিফের বাড়ির আলো ম্লান দেখাল ভোরের প্রথম আভায়।

আমরা কেউ কোনও কথা বললাম না। শরিফ ভাই আগে আগে চললেন। বেজমেন্টে চলে এলাম। বিলিয়ার্ড রুমের আধখোলা দরজাটা সাত-আট হাত সামনে। আলো জ্বলছে। শরিফ ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল দরজা।

ঝট করে দাঁড়িয়ে গেলেন উনি। তাল সামলাতে না পেরে ওর সঙ্গে ধাক্কা খেল জন। ধীরগতিতে এগোলেন শরিফ ভাই। জন আর আমি তাঁর পেছনে। টেবিলে কেউ নেই। টেবিলের কিনারে এবং পাশে ধূসর, ঘন একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত ছাদ থেকে খসে পড়েছে।

মুখ হাঁ করে টেবিলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন শরিফ ভাই। তারপর পাঁই করে ঘুরলেন জনের দিকে, প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'এটা এখানে ছিল। টেবিলের ওপর। মি. জন, এটা ছিল।'

জন হেসে মাথা ঝাঁকাল। 'আমি আপনার কথা বিশ্বাস করছি, মি. শরিফ। আপনারা সবাই ওটাকে দেখেছেন।' কাঁধ ঝাঁকাল। 'কেউ ওটাকে নিয়ে গেছে। কিছু একটা রহস্য আছে এর মধ্যে। বাইরে চলো। তোমাদেরকে একটা কথা বলব।'

সাত

রিদওয়ান শরিফের বাড়ির সামনের রাস্তার ধারে, ঘাসের ওপর পা মেলে বসলাম আমরা। চোখ উপত্যকার দিকে। বাড়ির ছাদগুলো এখনও ধূসর, বর্ণহীন। তবে জানালার কাচে হালকা কমলা রঙের ছোঁয়া, প্রথম ভোরের আলো ফুটছে। কমলা রঙের আলো ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, সূর্য দিগন্তরেখায় একটু একটু করে মাথা তুলছে, সেইসঙ্গে আলোর আভা বাড়ছে। এখানে-ওখানে দু-একটা বাড়ির চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুতে দেখলাম।

নীচের খেলনা আকারের বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে আপনমনে বিড়বিড় করলেন শরিফ ভাই, 'শহরে ওই জিনিসগুলো এ-মুহূর্তে কতগুলো আছে কে জানে? লুকিয়ে আছে কোথাও-না-কোথাও।'

হাসল জন। 'নেই। কেউ কোথাও লুকিয়ে নেই।' আমরা ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাতে মুচকি হাসল সে।

'শোনো,' শান্ত গলা তার। 'তোমরা একটা রহস্য পেয়ে গেছ হাতে। কিন্তু ওই শরীরটা কার ছিল? ওটা এখন কোথায়?' ওর বামদিকে বসেছি আমরা। জন মুখ ঘুরিয়ে এক পলক দেখল আমাদেরকে। তারপর যোগ করল, 'তবে এ রহস্য অসাধারণ কিছু নয়। খুনটুনের ব্যাপার হতে পারে। আমি ঠিক জানি না। তবে যা-ই হোক ওটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ নিয়ে আর কিছু কল্পনা করতে যেয়ো না।'

আপত্তি করে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, বাধা দিল জন।

'আমার কথা শোনো।' কনুই ভর করা হাঁটুতে, শহরের দিকে চোখ রেখে বলল, 'মানুষের মন বড় বিচিত্র জিনিস। এর রহস্য কখনও ভেদ করা যাবে বলে আমার মনে হয় না। সাব-অ্যাটোমিক পার্টিকল থেকে ইউনিভার্স–সব-কিছুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যায়–তবে মানুষের মন নয়।'

নীচের শহরের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে ইঙ্গিত করল জন। ভোরের সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছে শহর। 'মিলভ্যালিতে দিন দশেক আগে একজন একটা ডিল্যুশন সৃষ্টি করেছে। সে বলছে তার পরিবারের একজন সদস্য আসল নয়, নকল। এরকম ডিল্যুশনের ঘটনা মাঝে মধ্যে ঘটে। প্রতিটি সাইকিয়াট্রিস্টকেই এ ডিল্যুশনের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। কীভাবে ব্যাপারটা সামাল দিতে হয় তাও তার জানা।'

জন আমার গাড়ির সামনের চাকায় হেলান দিল। হাসল আমাদের দিকে তাকিয়ে। 'তবে গত সপ্তায় আমি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম। কারণ সাধারণ কোনও ডিল্যুশনের ঘটনা ছিল না ওটা। শহরের কমপক্ষে দশ-বারোজন একই সঙ্গে একইরকম ডিল্যুশনের শিকার হয়েছে। আমার ডাক্তারি জীবনে এ-ধরনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে।' অন্যমনস্কভাবে মুখে একটা হাত রাখল জন। 'তবে পরে একটা বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে ওই ডিল্যুশনের ঘটনার একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাই আমি। তোমরা "ম্যাটুন ম্যানিয়াকের" নাম শুনেছ?'

আমরা মাথা নেড়ে জানালাম শুনিনি।

'বেশ,' বলল জন। 'ম্যাটুন ইলিনয়ের একটা শহর। হাজার বিশেক লোকের বাস। ওখানে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যার বর্ণনা সাইকোলজির টেক্সট বইতে তোমরা পাবে।

'১৯৪৪ সালের ২ সেপ্টেম্বরে গভীর রাতে এক মহিলা ফোন করল পুলিশে। বলল কেউ তার প্রতিবেশীকে বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে হত্যা করতে চাইছে। এই প্রতিবেশী এক মহিলা, মাঝরাতে ঘুম থেকে জেগে ওঠে সে। তার স্বামী তখন রাতের শিফটে এক কারখানায়। অদ্ভুত, মিষ্টি সুবাসের তবে বমি ওঠা একটা গ্যাসের গন্ধ নাকে লাগে মহিলার। সে বিছানা ছেড়ে উঠতে যায়, তবে পা নাড়াতে পারছিল না। কোনোমতে হামাগুড়ি দিয়ে সে ফোন ধরে এবং প্রতিবেশীকে ফোন করে। প্রতিবেশী পুলিশে খবর দেয়।

খবর পেয়ে পুলিশ আসে। তাদের কর্তব্যকর্মগুলো সম্পাদন করে। দরজা খোলা দেখতে পায় তারা। হয়তো খোলা দরজা দিয়ে কেউ ভেতরে ঢুকেছিল। তবে বাড়ির আশপাশে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দুই দিন বাদে আবার রাতে একটা ফোন পেল পুলিশ। আবার এক মহিলা ফোন করেছে। ভয়ার্ত স্বরে জানাল কেউ তাকে বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে হত্যার চেষ্টা করছে। সেই রাতে আরও অন্তত দশ-বারোজন মহিলার ওপর একই রকম হামলা হলো। ঘুমিয়ে ছিল তারা। জেগে ওঠে মিষ্টি তবে বমি-ঠেলে-ওঠা একটা গন্ধে। গ্যাসটা তাদেরকে প্রায় চলৎশক্তিহীন করে দিচ্ছিল।'

একটা আগাছা তুলে নিল জন, ডগা থেকে পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, 'এক রাতে এক মহিলা দেখতে পেল এক লোককে। বেডরুমের খোলা জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিল সে, কীটনাশক ওষুধের মত কিছু একটা স্প্রে করছিল ঘরে। গ্যাসের গন্ধে চিৎকার করে উঠল মহিলা। দৌড় দিল লোকটা। তবে জানালার সামনে দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় তার চেহারা পরিষ্কার দেখতে পেল মহিলা। লম্বা, রোগা-পাতলা, মাথায় কালো টুপি।

'স্টেট পুলিশ ডাকা হলো। কারণ ওই একই রাতে আরও সাতজন মহিলাকে গ্যাসের হামলা করা হয়। তারা প্যারালাইজড হয়ে যায়। শহর থেকেও একই খবর আসতে থাকে। বেশিরভাগ খবর ছাপা হয় শিকাগোর সংবাদপত্রে। ওদের ফাইল ঘাঁটলে খবরগুলো পাবে। ১৯৪৪ সালের রাতের বেলা ইলিনয়ের ম্যাটুনে শটগান হাতে পাহারা দিতে থাকে পুলিশ, পড়শীরা জোট বেঁধে পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছিল যে-যার পাড়া আর মহল্লা। তবে হামলা ছিল অব্যাহত। আর ম্যানিয়াক ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।

'এক রাতের ঘটনা। সে রাতে জনা-আটেক স্টেট-পুলিশ গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে। সেইসঙ্গে একটি মোবাইল রেডিও ইউনিট। এক ডাক্তার স্থানীর মেথোডিস্ট হাসপাতালে রোগীর জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। পুলিশ যথারীতি এক মহিলার ফোন পেল। ভয়ে

কথা বলতে পারছিল না সে। উন্মাদ লোকটা তাকে গ্যাস মেরেছে। এক মিনিটের মধ্যে পুলিশ গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেল মহিলার বাড়িতে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। ডাক্তার পরীক্ষা করলেন।' হাসল জন। 'কিন্তু তার কোনও সমস্যা দেখতে পেলেন না ডাক্তার। কিছু না। তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আবার একটা ফোন এলো পুলিশের কাছে। দ্বিতীয় মহিলাকেও নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে। তারও কোনও সমস্যা নেই—পরীক্ষার পর ঘোষণা করলেন ডাক্তার। এরকম ঘটতে লাগল সারারাত ধরে। একের-পর-এক ফোন এল, সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদেরকে পাঠানো হলো হাসপাতালে এবং কারও কোনও সমস্যা না-থাকায় প্রত্যেককে ফেরত পাঠানো হলো বাড়িতে।'

বেশ অনেকক্ষণ আমাদের চেহারা পরখ করল জন, তারপর বলল, 'ম্যাটুনে ওই রাতের পরে আর কিছু ঘটেনি। আতঙ্কেরও সমাপ্তি ঘটে ওখানেই। কোনও ম্যানিয়াকের সন্ধ্যান পাওয়া যায়নি ম্যাটুনে, ছিলও না কেউ।' বিস্মিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সে। 'গণহিস্টিরিয়া, অটো-সাজেশন, যা-খুশি বলো—ওটাই ঘটেছিল ম্যাটুনে। কেন? কীভাবে?' কাঁধ ঝাঁকাল জন। 'আমি জানি না। আমরা এর একটা নাম দিই। তবে ব্যাপারটাকে ঠিক বুঝতে পারি না। শুধু এটুকুই জানি এসব সত্যি ঘটে।'

জনের কথা যে আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি, চেহারা দেখেই বুঝে ফেলল সে। আমার দিকে ঘুরল। ধৈর্য নিয়ে বলল, 'রায়হান, তুমি মেডিকেলে নিশ্চয় ড্যান্সিং সিকনেসের ঘটনার কথা পড়েছ। একশো বছর আগে গোটা ইউরোপে একযোগে ঘটে এ ঘটনা।' শরিফ ভাইয়ের দিকে তাকাল সে। 'অদ্ভুত একটা ঘটনা। বিশ্বাস হতে চায় না। প্রথমে একজন, তারপর আরেকজন, তারপর প্রতিটি নারী-পুরুষ এবং শিশুর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল নাচের উন্মাদনা। ক্লান্তিতে ঢলে না পড়া পর্যন্ত তারা নেচেই চলছিল। গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এই নৃত্য-উন্মাদনা। এনসাইক্লোপিডিয়াতেও এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যদ্দূর মনে পড়ে পুরো একটা গ্রীষ্ম জুড়ে চলছিল এ উন্মাদনা। তারপর থেমে যায় হঠাৎ করেই। লোকজনও বিস্মিত হয়ে ভাবছিল কী ধরনের পাগলামিতে

পেয়ে বসেছিল তাদেরকে।' বিরতি দিল জন। লক্ষ করল আমাদেরকে, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'তো বুঝতেই পারছ। এসব ঘটনা চোখে না-দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করা কঠিন। চোখে দেখার পরেও বিশ্বাস হতে চায় না।'

'আর মিলভ্যালিতে এরকমটিই ঘটেছে,'–শহরের দিকে তাকাল জন। 'খবরটা প্রথমে গোপনে ছড়িয়েছে। এ নিয়ে ম্যাটুনের মত ফিসফিসানি চলেছে। কেউ কেউ বিশ্বাস করেছে তার স্বামী, বোন, চাচা কিংবা চাচি আসল নয়, নকল। একটা অদ্ভুত, উত্তেজনাকর খবর। খবরটা ছড়াতে থাকে এবং এরকম ডিল্যুশনে ভুগতে থাকে অনেকে, প্রায় প্রতিদিন ডিল্যুশনের শিকার হতে থাকে তারা। সালেম উইচহাণ্ট, ইউএফও–এসবই মানুষের মনগড়া কল্পনা। অনেক মানুষ একা থাকতে পছন্দ করে। আর তখন তাদেরকে এ-ধরনের ডিল্যুশন বা বিভ্রান্তিতে পেয়ে বসে।'

ডানে-বামে মাথা নাড়লেন শরিফ ভাই। মেনে নিতে পারেননি ব্যাখ্যা। জন মৃদু গলায় বলল, 'শরীরটা বাস্তব ছিল এটাই আপনাকে ভাবিয়ে তুলেছে, তাই না, মি. শরিফ?' মাথা দোলালেন শরিফ ভাই। জন বলল, 'হ্যাঁ, ওটা বাস্তব ছিল, তোমরা সবাই তাই দেখেছ। কিন্তু বাস্তবতা ওটুকুই। শরিফ সাহেব, মাসখানেক আগে যদি শরীরটা দেখতেন আপনি, আপনার কাছে ব্যাপারটা খুব রহস্যময় তবে সেইসঙ্গে স্বাভাবিকও মনে হত। ফিওনা, ক্যাথি এবং রায়হানের কাছেও তাই।' আমার দিকে ঝুঁকল সে, তবে তীক্ষ্ণচোখ শরিফের দিকে। 'ধরো, ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে ইলিনয়ের ম্যাটুনে এক লোক রাতের বেলা হাতে স্প্রেগান নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাকে তখন কেউ দেখলে ভাবত লোকটা ঝোপঝাড়ে কীটনাশক ছিটাতে যাচ্ছে। কিন্তু একমাস পরে, সেপ্টেম্বরে ওই লোককে স্প্রেগান হাতে দেখলে সে কিছু ব্যাখ্যা করার আগেই আতঙ্কিত মানুষের গুলি খেয়ে তার খুলি উড়ে যেত।'

নরম গলায় জন যোগ করল, 'শরিফ সাহেব, আপনি একটা শরীর দেখেছেন। আপনার মত প্রায় লম্বা, কাঠামোও প্রায় একই রকম।

অবশ্য এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আপনি বাঙালিদের গড় উচ্চতার মানুষ। মুখটাকে আপনার ভোঁতা, নিদাগ এবং ফাঁকা মনে হয়েছে। আর–' কাঁধ ঝাঁকাল সে–'আপনি একজন লেখক, কল্পনার বেসাতি করাই আপনার কাজ। আর আপনি মিলভ্যালির ডিল্যুশনের প্রভাব থেকে মুক্ত নন। রায়হান, ফিওনা, ক্যাথি এবং আমিও তাই হতাম যদি এখানে থাকতাম। আপনার মন দুটো রহস্যের মধ্যে উপসংহার খুঁজেছে। মানুষের মন সবসময় কারণ এবং প্রভাব খুঁজে বেড়ায়। নীরস জীবনে আমরা অদ্ভুত এবং রোমাঞ্চকর কিছু ঘটতে দেখলে তা লুফে নিই।'

'শুনুন, জন, ফিওনা আসলে যা দেখেছে–'

'উনি যা দেখতে চেয়েছেন তা-ই দেখেছেন। উনি যদি তা না-দেখতেন তাতেই বরং আমি অবাক হতাম। আপনারা দু'জনে ওকে ভয় দেখিয়েছেন। উনি ভয় পেয়েছেন। আর ভয়টা পাবার জন্য উনি প্রস্তুত ছিলেন।'

আমি কিছু বলতে যাচ্ছি, ঠাট্টার ভঙ্গিতে হাসল জন। 'তুমি কিছুই দ্যাখোনি, রায়হান। স্রেফ পুরোনো একটা গোল করে মোড়ানো কম্বল ছাড়া। কিংবা কতগুলো কাপড়ের স্তূপ। ওই সময় তুমি প্রচণ্ড ক্লান্ত এবং উত্তেজিত ছিলে, কিছু একটা দেখার প্রত্যাশাও ছিল তোমার মধ্যে। পুরোনো একটা পাইপও হতে পারে ওটা।' আমি কথা বলার জন্য মুখ খুলব; হাত তুলে থামিয়ে দিল জন। 'ঠিক আছে, তুমি ওটা দেখেছ। পরিষ্কার দেখেছ এবং তার খুঁটিনাটি বর্ণনাও দিয়েছ। তবে তুমি যা দেখেছ আসলে তোমার মন যা দেখতে চেয়েছে তা-ই দেখেছ।' ভুরু কোঁচকাল ও। 'তুমি একজন ডাক্তার, রায়হান। তুমি জানো এসব কীভাবে ঘটে।'

জন ঠিকই বলেছে। এসব ঘটনা কীভাবে ঘটে আমি জানি। মেডিকেল কলেজের ক্লাস করছি একদিন, মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনছি মনোযোগ দিয়ে। এমন সময় দড়াম করে খুলে গেল ক্লাসরুমের দরজা। দুইলোক ভিতরে ঢুকে পড়ল হাতাহাতি করতে করতে। একজন পকেট থেকে একটা কলা বের করে অপরজনের দিকে

তাক করে ধরে চিৎকার করে উঠল, 'ঢিসুম!' অপরজন পকেট থেকে একটা আমেরিকান পতাকা বের করে প্রথম জনের মুখের ওপর জোরে জোরে নাড়ল, তারপর দুজনেই এক ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অধ্যাপক বললেন, 'এটা একটা সাজানো ঘটনা। তোমরা সবাই কাগজ-কলম নাও। একটু আগে কে কী দেখলে তার বর্ণনা দেবে। তারপর তোমাদের ছুটি।'

পরদিন তিনি আমাদের লেখাগুলো জোরে জোরে পড়ে শোনালেন। মোট কুড়িজন উপস্থিত ছিলাম আগের দিনের ক্লাসে। কারও সঙ্গে কারও বর্ণনা মিলল না। কেউ লিখেছে তারা তিনজন মানুষ দেখেছে, কোন ছাত্র চারজনের কথা লিখল, এক মেয়ে লিখল সে পাঁচজনকে দেখেছে। কেউ লিখল লোকগুলো শ্বেতাঙ্গ ছিল, কেউ তাদেরকে কৃষ্ণাঙ্গ বানিয়ে ছাড়ল। আবার কেউ বলল তারা দেখেছে লোকগুলো ছিল পুবদেশীয়। আবার কেউ লিখল ওরা পুরুষ ছিল না, ছিল নারী। এক ছাত্র লিখল সে দেখেছে এক লোক ছুরি খেয়েছে, ফিনকি দিয়ে তার রক্ত ছুটছিল, সে রুমাল দিয়ে চেপে ধরেছিল ক্ষত। রক্তে দ্রুত ভিজে যায় রুমাল। তবে মেঝেতে রক্তের দাগ দেখতে না পেয়ে সে যারপরনাই অবাক হয়ে যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ কলা কিংবা আমেরিকান পতাকার কথা উল্লেখও করেনি। আকস্মিক সংক্ষিপ্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ওই জিনিস দুটি আমাদের মন ছুঁতে পারেনি, তাই আমরা ওগুলোর কথা লিখতে ভুলেই গিয়েছিলাম। তার বদলে ছুরি, বন্দুক, রক্তমাখা রুমাল ইত্যাদির কথা লিখেছি। তবে শুধু আমাদের মনে একা এর ব্যাখ্যা খুঁজেছি।

জনের কথাই হয়তো ঠিক। যুক্তি দিয়ে চিন্তা করলে তেমনটিই মনে হয়। তবে আবেগ দিয়ে ভাবলে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। আমাদের চেহারায় তেমন ভাবই ফুটে উঠতে দেখল বোধহয় জন। তাই সিধে হলো সে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল আমাদের দিকে। 'তোমরা প্রমাণ চাও? ঠিক আছে। দেব প্রমাণ। রায়হান, ক্যাথির বাড়ি যাও। তবে মনটাকে শান্ত করে। ওর বেজমেন্টের তাকে কাউকে দেখতে পাবে না। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বললাম। শরিফ সাহেবের

বেজমেন্টে একটি মাত্র শরীর ছিল। ও থেকেই এতকিছুর উৎপত্তি। আরও প্রমাণ চাও? মিলভ্যালির এই ডিলুশনের অবসান ঘটবে। যেভাবে ঘটেছিল ম্যাটুনে, যেভাবে পরিসমাপ্তি হয়েছিল ইউরোপে। যেভাবে সাধারণত এসব ঘটনার শুরু হয়, শেষও হয় সেভাবে। তোমার কাছে যারা এসেছিল, রায়হান–শীলা লেন্জ এবং অন্যরা–ওরা আবার আসবে। কেউ কেউ লজ্জায় পড়ে তোমার সামনে ঘেঁষতে চাইবে না। তবে ওদেরকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবে ওদের মধ্যে সেই বিভ্রান্তিটা আর নেই। ওরা বলবে ওরা জানে না ব্যাপারটা কীভাবে তাদের মাথায় ঢুকেছিল। এ-ধরনের পাগলামির কেস তুমি আর পাবে না। সে গ্যারান্টিও দিলাম।'

মুচকি হাসল জন। আকাশের দিকে তাকাল একবার। আকাশ এখন নীল এবং পরিষ্কার। বলল, 'খিদে পেয়েছে। নাস্তা খাব।' শরিফ ভাই হাসলেন ওর দিকে তাকিয়ে । সিধে হলেন। সেইসঙ্গে আমিও। 'আমারও,' বললাম আমি। 'আমার বাড়িতে চলো। দেখি মহিলারা আমাদের জন্য কী ব্যবস্থা করেছে।' শরিফ কিছু না বলে বাড়িতে ঢুকলেন। এক এক করে নেভালেন বাতি। বন্ধ করলেন দরজা। ফিরে এলেন কার্ডবোর্ডের বাদামি রঙের ফোল্ডার বগলে চেপে। ফোল্ডারটা অ্যাকর্ডিয়ন টাইপের, কয়েকটা ভাগে ভাগ করা। সবগুলো ফুলে আছে কাগজের নানা প্যাকেটে। 'এর মধ্যে নোট, রেফারেন্সসহ নানা জিনিস আছে,' ব্যাখ্যা করলেন শরিফ ভাই। 'আমার কাছে এর মূল্য অনেক। তাই যেখানে যাই এটাকে সঙ্গে নিয়ে যাই।' আমরা গাড়িতে চড়লাম। ছুটে চললাম শহরের দিকে।

ক্যাথির বাড়ির ফুটপাতের সামনে গাড়ি থামালাম। মোটর চালু রেখেই বেরিয়ে এলাম দরজা খুলে। মাত্র ভোর হয়েছে। নতুন দিনের আলোয় ধবধব করছে রাস্তা। তবে একটা প্রাণীও চোখে পড়ল না। আমি দৃঢ় পায়ে হেঁটে গেলাম বেজমেন্টের দিকে। ঘাসে পা ফেলছি বলে শব্দ হলো না কোনও। বেজমেন্টের ভাঙা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে তাকালাম। চোখে পড়ল না কাউকে। কারও কোনও সাড়া শব্দও নেই। জানালা খুলে দ্রুত ঢুকে পড়লাম ভিতরে।

কংক্রিটের মেঝেতে এগোলাম পা টিপে টিপে। বেজমেন্টে আলো আছে, তবে বড্ড নীরব। আমি শান্ত আছি তবে দুশ্চিন্তাও হচ্ছে। কারও কাছে ধরা পড়তে চাই না।

কাবার্ডের দরজা আধখোলা রেখে গিয়েছিলাম। তেমনই আছে। আমি পুরোপুরি মেলে ধরলাম কপাট। তাকালাম নীচের তাকে। বেজমেন্টের কাছের জানালা দিয়ে আলো আসছে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাক শূন্য। দেয়ালের সঙ্গে লাগোয়া সবগুলো শেলফের দরজা খুললাম। খাবারের ক্যান, খালি ফলের জার, পুরোনো খবরের কাগজ, যন্ত্রপাতি ছাড়া কিছু দেখতে পেলাম না। নীচের খালি তাকে ধূসর রঙের ঘন ধুলো। বেজমেন্টের তাকে এরকম ধুলো থাকেই।

এখানে আর একমুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছে না আমার। কাবার্ডের দরজা বন্ধ করলাম। তারপর জানালা বেয়ে নেমে পড়লাম লন-এ। ক্যাথির বাবা ভাঙা জানালা দেখলে কী বলবেন জানি না। তবে এর ব্যাখ্যা আমি দিতেও যাচ্ছি না।

ফুটপাত থেকে গাড়ি সরাতে সরাতে জনের উদ্দেশে মুচকি হাসলাম। 'তুমি ঠিকই বলেছ।' শরিফ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে শুধু কাঁধ ঝাঁকালাম।

আট

ভয়, আতঙ্ক, শোক কিংবা খুশির অনুভূতি মানুষের মনে খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। রাতটা কেটে যাওয়ার পর সকালে বেশ জম্পেশ নাস্তা সারলাম আমরা। সূর্যের আলো আমাদের ভয় দূর করে দিল। ভোরের উষ্ণ হলুদ আলোয় উদ্ভাসিত হলো খোলা জানালা আর রান্নাঘরের দরজা। আমরা বাড়ি পৌঁছে দেখি ফিওনা আগেই উঠে পড়েছে, রান্নাঘরের টেবিলে বসে কফি খাচ্ছে ক্যাথির সঙ্গে। আমাদেরকে দেখে উঠে দাঁড়াল ফিওনা। ওর দিকে ছুটে গেলেন শরিফ ভাই। দুজন

দুজনকে জড়িয়ে ধরে থাকলেন অনেকক্ষণ। শরিফ পাগলের মত চুমু খেলেন। তারপর এক কদম পিছু হঠলেন ফিওনাকে ভাল করে দেখতে। জন এবং আমিও তাকালাম ওর দিকে। ফিওনাকে এখনও ক্লান্ত লাগছে। চোখের নীচে কালি। তবে চাউনি শান্ত এবং স্বাভাবিক। স্বামীর কাঁধের ওপর দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসি উপহার দিল ফিওনা।

তারপর, যেন সংকেত দেওয়া হয়েছে, আমরা গল্প শুরু করে দিলাম। হাসলাম, ঠাট্টা-মশকরা করলাম। দুই নারী চুলো ধরাল, বাসনকোসন বের করল ফ্রিজ এবং কাবার্ড খুলে। আমরা পুরুষরা রান্নাঘরের টেবিলে মেতে রইলাম খোশগল্পে। ক্যাথি আমাদের কফি দিল। আমরা গতরাতের প্রসঙ্গ তুললাম না, আমাদেরকে কোনও প্রশ্নও করল না ওরা জিজ্ঞেস করা সমীচীন হবে না ভেবেই হয়তো।

স্টোভে সসেজ ভাজা হচ্ছে। ফিওনা একটা ফর্ক দিয়ে ওগুলো উল্টে দিচ্ছে। ক্যাথি একটা বাটিতে ডিম ফেটাতে লাগল। ধাতব চামচ চিনামাটির বাটিতে বাড়ি লেগে ছন্দায়িত ঠুনঠুন শব্দ তুলল। ফিওনা বলল, ওর চোখ হাসছে, 'আমি ভাবছিলাম শরিফের একটা ডুপ্লিকেট থাকলে বেশ হত। একজন সারা বাড়িতে একই রকম ভাবে ঘুরে বেড়াত। আমার কথা কানে তুলত না। লিখত। তবে অপরজনের হয়তো আমার সঙ্গে কথা বলার সময় হত, আমাকে বাসনকোসন ধোয়ার কাজে হাত লাগাত।'

ঠোঁটের কাছে কফির কাপ, হাসলেন শরিফ। ওঁকে খুশি-খুশি লাগছে বউ ভাল আছে দেখে। 'চেষ্টা করে দেখা যায়,' বললেন তিনি। 'মাঝে মাঝে আমিও ভাবি কোনও পবিবর্তন এলে আমার উন্নতি হবে কিনা। হয়তো নতুনজন লেখার ব্যর্থ চেষ্টা করে পাথরের দেয়ালে মাথা ঠোকার বদলে সত্যিই কিছু লিখতে পারবে।'

সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ক্যাথি। 'ডুপ্লিকেটে কিছু সুবিধা তো আছেই। আমার ভাবতে বেশ মজা লাগে আমার মত একজন নাইট গাউন পরে গোপনে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। আর অপরজন একাকী বিছানায় শুয়ে আছে।'

ডুপ্লিকেট থাকলে কী কী সুবিধে হত তা নিয়ে মজা করতে লাগলাম আমরা। জনও একজন নকল ড. কোয়েলস চায় যে রোগী দেখবে। এই ফাঁকে অপরজন টেনিস খেলতে যাবে। আমি বললাম ঘুমাবার জন্য একজন নকল রায়হান মর্তুজা পেলে মন্দ হত না।

খাবারটা চমৎকার। আমরা খেতে খেতে আড্ডা দিলাম। জন দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল তাকে এখন যেতে হবে। বাড়ি ফিরবে। আমি ওকে সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম। তারপর অন্যদের সঙ্গে যোগ দিলাম। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় কাপ কফি পান করছি।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ফিওনা আর ক্যাথিকে সংক্ষেপে জানালাম কী ঘটেছে, আমরা কী দেখেছি–এবং শরিফ ও ক্যাথির বেজমেন্টে কী দেখতে পাইনি। জন আমাদেরকে কী বলেছে তাও জানালাম।

আমি মনে-মনে যা ভেবেছিলাম প্রতিক্রিয়া তেমনই হলো। ঠোঁট চেপে বসে রইল ফিওনা, ডানে-বামে মাথা নাড়ছে। বিশ্বাস করতে পারছে না সে যা দেখেছে তা চোখের ভুল। ক্যাথি কোনও মন্তব্য করল না। তবে চাউনি দেখে বুঝতে পারলাম জনের ব্যাখ্যা সে মেনে নিয়েছে। ও ওর বাবার কথা ভাবছে, জানি আমি, টেবিলে আমার পাশে বসেছে ক্যাথি। প্রাণবন্ত।

সিধে হলেন শরিফ। হেঁটে গেলেন লিভিংরুমে। ফিরে এলেন বাড়ি থেকে নিয়ে আসা কার্ডবার্ডের ফোল্ডারটা। বসলেন। হাসিমুখে বললেন, 'আমি হলাম কাঠবেড়ালির মত,' অ্যাকর্ডিয়ন-ফোল্ডারের প্রতিটি খোপে উঁকি দিলেন। 'নানা জিনিস সংগ্রহ করে রাখি। তবে বিশেষ কোনও উদ্দেশে নয়। এর মধ্যে রয়েছে–' ফোল্ডারের একটা খোপে হাত বাড়ালেন। খবরের কাগজের একগাদা ক্লিপিং বের করলেন–'কিছু পেপার কাটিং। জনের সঙ্গে কথা বলার পর এগুলো এনেছি।' প্লেট সরিয়ে রেখে পেপার কাটিংগুলো টেবিলে রাখলেন। ডজনখানেক। কয়েকটা কাগজ হলুদ হয়ে গেছে। বোঝা যায় অনেক পুরোনো। কিছু নতুন, কোনটি আকারে খাটো, কোনোটির দৈর্ঘ্য বেশ লম্বা। স্তূপ

থেকে একটুকরো কাগজ বের করলেন শরিফ। হেডিঙে চোখ বুলিয়ে ঠেলে দিলেন আমার দিকে।

আমি ওটা হাতে তুলে নিলাম যাতে ক্যাথিও পড়তে পারে। হেডিঙে লেখাঃ **আলাবামায় ব্যাঙবৃষ্টি**। এক কলামের লেখা, ইঞ্চিকয়েক লম্বা। লিখেছে: 'চার হাজার নাগরিকের এ শহরের জেলেরা আজ সকালে মাছ ধরার প্রচুর টোপ পেয়ে গেছে। গতরাতে খুদে আকারের ব্যাঙবৃষ্টি হয়েছে শহরে। তবে ব্যাঙগুলো কোন্ প্রজাতির তা জানা যায়নি।' প্রতিবেদক লিখেছেন, পড়ে গেলাম আমি, আকাশ থেকে যেন বৃষ্টির মত ঝরতে থাকে ব্যাঙগুলো। বাড়িঘরের ছাদ এবং জানালা ভরে ওঠে।

ব্যাপারটায় খানিক কৌতুকের মিশেল দেওয়া, তবে কেন ব্যাঙবৃষ্টি হলো তার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

শরিফ ভাইয়ের দিকে তাকালাম। হাসলেন তিনি। 'বেশ মজার, তাই না?' বললেন, 'যদিও ব্যাঙ কোত্থেকে এল তার ব্যাখ্যা নেই।' আরেকটা ক্লিপিং এগিয়ে দিলেন তিনি।

আগুনে পুড়ে লোকের মৃত্যুঃ পোশাক অক্ষত

গল্পটা বলছে, আইডাহোর এক খামারবাড়িতে আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে এক লোক। তবে তার পরনের পোশাকের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি। বাড়ি থেকে কেউ ধোঁয়া বেরুতে দেখেনি, আগুনে অন্যকিছু পুড়ে যাওয়ার খবরও শোনা যায়নি। স্থানীয় করোনারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, লোকটাকে যেখানে দেখা গেছে তাতে তার ধারণা কমপক্ষে ২ হাজার ৮০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় তার শরীর পুড়ে গেছে।

আমি মৃদু হেসে ভুরু কুঁচকে শরিফের দিকে তাকালাম। আমাকে পেপার ক্লিপিংস দেখানোর অর্থ বুঝতে পারছি না। ফিওনাও তাকিয়ে আছে স্বামীর দিকে। সেও বুঝতে পারছে না এর মানে। আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন শরিফ। 'এরকম স্টোরি কয়েক ডজন আছে আমার কাছে। লোকে আগুনে পুড়ে মরেছে অথচ জামাকাপড়ের কোনও ক্ষতি হয়নি। এরকম অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনেছ কখনও?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এসব খবর আমাদেরকে শোনাচ্ছেন কেন, শরিফ ভাই?'

'কারণ আছে,' ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে সিধে হলেন শরিফ। 'আমি যেসব ক্লিপিংস জোগাড় করেছি, এরকম শতশত হাজার হাজার ঘটনা সারাবিশ্বে ঘটে চলেছে।' রান্নাঘরে পায়চারি শুরু করলেন। 'এসব ঘটনা একটা জিনিসই প্রমাণ করে এই অদ্ভুত ঘটনাগুলো সত্যি ঘটে, যখন তখন ঘটছে, এখানে সেখানে, সারা পৃথিবী জুড়ে। আর এসবের কোনও ব্যাখ্যাও নেই কেন ঘটছে।'

টোস্টারের সামনে এসে দাঁড়ালেন লেখক, একটুকরো টোস্ট তুলে নিলেন। কামড় বসালেন। ঘুরলেন আমাদের দিকে। 'তো আমার কথা হলো, রায়হান, সবকিছুর কি ব্যাখ্যা আছে? কিংবা এ ধরনের ঘটনা কি হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মত? অথবা অগ্রাহ্য করার মত? অথচ এরকম ঘটনা সবসময় ঘটেই চলেছে।' আবার পায়চারি শুরু করলেন তিনি। 'আমার ধারণা এসব স্বাভাবিক। বিজ্ঞান এর কী ব্যাখ্যা দেবে? বলবে এসব দৃষ্টিভ্রম, হিস্টিরিয়া, ম্যাস-হিপনোসিস কিংবা নিতান্তই কাকতালীয় ঘটনা। 'না–' হেসে মাথা নাড়লেন শরিফ ভাই। 'আমরা যা বুঝতে পারি না তা একমুহূর্তের জন্যও আমরা স্বীকার করতে চাই না। পৃথিবী যে গোল সে সত্য গ্রহণ করতে শত শত বছর সময় লেগেছে। আমরা আসলে নতুন কোনও ঘটনা বা প্রমাণের মুখোমুখি হতে চাই না। কারণ আমরা যা সম্ভব বলে ভেবে আছি তার বিপরীত কিছু ঘটলে সেসব হজম করা আমাদের জন্য মুশকিল হয়ে ওঠে।'

শরিফ মুচকি হেসে টেবিলে বসলেন আবার। টেবিল থেকে একটা ক্লিপিং তুলে নিলেন। 'এটা নিউ ইয়র্ক পোস্টের একটা লেখা। নিউ ইয়র্ক পোস্ট একটি জনপ্রিয় পত্রিকা। সারাদেশের মানুষ এ-খবরটি পড়েছে। আমিও। মুহূর্তের জন্য উত্তেজনা বোধ করেছি। তারপর আবার ভুলে গেছি। এরকম অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনা, যা আমাদের মনের সঙ্গে খাপ খায় না, ভুলে যাই আমরা। তবে আমার মত দুএকজন কৌতূহলী মানুষ এসব ঘটনা মনে রাখে। যদিও আমি মনে করি না এসব অবিশ্বাস্য আর সব ঘটনারই ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।'

আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন শরিফ ভাই, তারপর হাসি ফুটল মুখে। 'জন যা বলে গেল তা কি ঠিক? গত রাতে যা ঘটল তার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে সে। প্রায় ৯৯ ভাগ সন্তুষ্ট করার মত ব্যাখ্যা।' আমাদের এক পলক দেখলেন উনি, তারপর গলা নামিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'তবে একভাগ আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। আমার ভেতরের সন্দেহের বীজটা এখনও দূর হয়নি।'

শরিফ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি মনের মধ্যে। 'আঙুলের ছাপ।' বিড়বিড় করলাম আমি। শরিফ একমুহূর্তের জন্য ভুরু কোঁচকালেন। 'ফাঁকা আঙুলের ছাপ।' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'জনির ধারণা ওটা স্রেফ সাধারণ একটা শরীর। সাধারণ মানুষের নাকি কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকে না।'

চেয়ার থেকে সিধে হতে যাচ্ছে ফিওনা, টেবিলের ওপর ঠেকিয়েছে কনুই, গলা দিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল। 'আমি ওখানে ফিরে যেতে পারব না, শরিফ! ওই বাড়িতে আর ঢুকতে পারব না আমি!' ওর কণ্ঠ আরও চড়ল। 'আমি জানি ওখানে কী দেখেছি; ওটা তোমার চেহারায় রূপ নিচ্ছিল, শরিফ। তোমার মত হয়ে যাচ্ছিল ওটা!' শরিফ ভাই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন ওকে। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরছে ফিওনার। তারায় নির্জলা আতঙ্ক।

একটু পর কথা বলার শক্তি ফিরে পেলাম আমি। 'তা হলে যেয়ো না।' বললাম ফিওনাকে। 'এখানেই থাকো।' দুজনেই ঘুরে তাকাল আমার দিকে। আমি মৃদু হাসলাম। 'এ বাড়িটা অনেক বড়। যে-কোনও একটা ঘর পছন্দ করে নাও। থাকো। আপনার টাইপরাইটারটা নিয়ে আসুন, শরিফ ভাই। কাজে লেগে যান। তোমরা এখানে থাকলে ভালই লাগবে আমার। আমি এ-বাড়িতে একা-একা ভূতের মত ঘুরে বেড়াই। তোমরা থাকলে সঙ্গী পাব।'

আমার মুখে কী যেন খুঁজলেন শরিফ ভাই। 'ঠিক বলছ?'

'অবশ্যই।'

ফিওনার দিকে তাকালেন তিনি, সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সে। 'ঠিক আছে,' শরিফ বললেন আমাকে। 'এখানে ক'টা দিন

থাকতে মন্দ লাগবে না আশা করি। ধন্যবাদ রায়হান। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'তুমিও থাকো, কেট,' বললাম আমি। 'তোমাকেও অন্তত ক'টা দিনের জন্য থাকতে হবে শরিফ ভাইদের সঙ্গে।' ক্যাথির চেহারা ম্লান তবু হাসল সে। 'শরিফ ভাইদের সঙ্গে।' কথাটা পুনরাবৃত্তি করল। 'আর তুমি কোথায় থাকবে শুনি?'

আমার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'এখানেই। তবে আমাকে তুমি পাত্তা না দিলেও পারো।'

স্বামীর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল ফিওনা। ওর মুখেও হাসি ফুটেছে। 'আশা করি মজাই হবে, ক্যাথি।'

ক্যাথির চোখ নাচছে। 'কয়েকদিনের একটা পার্টির মত হবে আর কী।' আবার ভয় ফিরে এল চোখে। 'আমি বাবার কথা ভাবছি।'

'ওকে ফোন করো,' বললাম আমি। 'সত্যি কথাটাই খুলে বলো। বলো ফিওনা একটা ব্যাপার নিয়ে সাংঘাতিক আপসেট হয়ে পড়েছে। ক'টা দিনের জন্য এখানেই থাকছে সে। তোমাকে ওর প্রয়োজন।' মুচকি হাসলাম আমি। 'ইচ্ছে করলে বলতে পারো তোমাকে নিয়ে আমার কিছু পরিকল্পনা আছে যেগুলোকে অগ্রাহ্য করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।' দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালাম। 'কাজে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, বন্ধুরা। তোমরা থাকো।' আমি ওপরে চলে এলাম অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হতে।

বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেভ করছি আমি, ভয়ের চেয়ে অস্বস্তি কাজ করছে বেশি। নীচতলায় যে ঘটনা চাক্ষুষ করেছি তার স্মৃতি আমার মনের একটা অংশকে ভয়তাড়িত করে রেখেছে। শরিফের বেজমেন্টে যে শরীরটা দেখেছি তার হাতের আঙুলের ছাপ পড়ে না। জন যা-ই ব্যাখ্যা করুক না কেন মনকে এখন আর প্রবোধ দিতে পারছি না। তবে বিরক্তি এবং অস্বস্তিটা লাগছে ক্যাথির জন্য। আমি চাই না ক্যাথি এখানে থাকুক। ওর সঙ্গে আগে সপ্তায় একবার দেখা হত। এখন প্রতিদিন দেখা হবে। আর ও খুব আকর্ষণীয়া, সুন্দরী। কখন কী ঘটে যায় বলা যায় না।

দাড়ি কামাতে কামাতে আপনমনে নিজেকে বললাম আমি, ‘ওরে সুদর্শন হারামজাদা। তুই মেয়েদের বিয়ে করতে পারিস। কিন্তু সংসার টিকিয়ে রাখতে পারিস না। সমস্যা তো এটাই। তুই দুর্বল। মানসিকভাবে খুবই দুর্বল। নিরপত্তাহীনতায় ভোগো তুমি। বড়দের মত দায়িত্ব নিতে ভয় পাও।’ হাসলাম আমি। ‘তুমি একটা হাতুড়ে ডাক্তার। তবে ডন জুয়ানের মত আকর্ষণ করো মেয়েদেরকে।’

শরিফ ভাই আমার সঙ্গে শহরে এলেন স্থানীয় পুলিশ চিফ নিক গ্রিভেটের সঙ্গে কথা বলার জন্য। আমাদের দুজনের সঙ্গেই তার ভাল সখ্য। শরিফ একটা লাশ দেখেছেন। পরে ওটা অদৃশ্য হয়ে যায়। ব্যাপারটা পুলিশে জানানো দরকার। গাড়ি চালাতে চালাতে ঠিক করে নিলাম উনি শুধু ঘটনাগুলো বর্ণনা করবেন। আর কিছু না। রিপোর্ট করতে দেরি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব না। তাই সময়ের হিসেব বদলাতে হবে। শরিফ ভাই বলবেন গতকাল সকালে নয়, গত রাতে দেখেছেন লাশ।

তারপরও কিছু সমস্যা থেকে যায়। পুলিশ জানতে চাইবে গত রাতেই উনি কেন পুলিশে ফোন করেননি? ঠিক করলাম শরিফ বলবেন লাশ দেখে আতঙ্কিত এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে ফিওনা। তাঁর মাথায় তখন অন্য কিছু কাজ করছিল না। তিনি ডাক্তারের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন অর্থাৎ আমার কাছে এসেছেন। প্রচণ্ড শক পেয়েছে ফিওনা। এ-কারণে আমার বাড়িতে থাকছে ওরা। শরিফ বাড়ি গিয়েছিলেন কিছু কাপড়চোপড় নিয়ে আসতে। তখন দেখেন বেজমেন্টে লাশ নেই। গ্রিভেট কথাটা শুনে খানিক ঘোঁতঘোঁত করবে জানি। তবে শরিফকে কিছু বলতে পারবে না। হাসতে হাসতে শরিফ ভাইকে বললাম উনি যেন অন্যমনস্ক এবং নেশাগ্রস্তদের মত আচরণ করেন। গ্রিভেট ভাববে লেখকরা এরকমই হয়ে থাকে।

শরিফ ভাই আমার কথায় সায় দিলেন মাথা ঝাঁকিয়ে। ওঁর চেহারা হঠাৎ সিরিয়াস দেখাল। ‘গ্রিভেটের সঙ্গে কথা বলার সময় ফিঙ্গারপ্রিন্টের কথা একেবারেই তুলব না, তাই না?’

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। ‘হ্যাঁ, ফিঙ্গারপ্রিন্টের কথা তুলেছেন কী

মরেছেন। গ্রিভেট তখন আপনার পেট থেকে সমস্ত কথা বের করে আনবে।'

গাড়ি নিয়ে থানার সামনে চলে এলাম। শরিফ ভাই নামলেন গাড়ি থেকে। আমি হেসে ওঁর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লাম। তারপর নিজের গন্তব্যের উদ্দেশে ছোটালাম গাড়ি।

নয়

আমার অফিসের পাশে রাস্তায় যখন গাড়ি থামালাম, মুডটা ততক্ষণে নষ্ট হয়ে গেছে। দুশ্চিন্তা, সন্দেহ আর ভয়ের দোলাচলে দুলছে আমার মন। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে এগোলাম অফিসের দিকে। থ্রকমর্টন স্ট্রিটের চেহারা দেখে হতাশ বোধ করছি। ভোরের আলোতেও কেমন ম্লান আর বিবর্ণ লাগছে রাস্তাটা। একটা বাজে কাগজের ঝুড়ি উল্টে রয়েছে, রাস্তায় একটা বাতি ভাঙা। একটা দোকান দেখলাম খালি। ওটার জানালায় সাদা রং করা। তাতে লেখা: *ভাড়া হইবে*। এ দোকান কেউ ভাড়া নিতে আগ্রহী হবে বলে মনে হলো না। আমার ভবনের প্রবেশঘরের সামনে মদের ভাঙা একটা বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে। বিল্ডিঙের ধূসর পাথরের দেয়ালের নেমপ্লেট পালিশের অভাবে চকচকে ভাবটা হারিয়েছে। রাস্তার এদিক-ওদিক কোথাও একটা জ্যান্ত প্রাণী চোখে পড়ল না। অথচ এ সময় দোকানদাররা তাদের দোকান খুলে ঝাঁট দেয়। রাস্তাটাকে অদ্ভুতরকম পরিত্যক্ত লাগল। নিজেকে আমার ভিতরে ভিতরে যেরকম লাগছে সেরকম। আমি ভয় আর উৎকণ্ঠার একটা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছি। নিজেকে ভর্ৎসনা করলাম। রোগী দেখতে যাচ্ছি আমি। এসময় এসব ভাবা মোটেই ঠিক হচ্ছে না।

দোতলায় উঠে দেখি এক রোগিণী অপেক্ষা করছে আমার জন্য। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসেনি। অবশ্য আজ একটু তাড়াতাড়িই এসে পড়েছি অফিসে। তাই মহিলাকে ভেতরে আসতে বললাম। চল্লিশোর্ধ্ব

মহিলার নাম মিসেস সিলি। 'এক হপ্তা আগে আমার অফিসে বসে বলেছিল তার ধারণা, তার স্বামী আদৌ তার স্বামী নয়। এখন হাসছে মহিলা। স্বস্তি আর আনন্দের হাসি। বলল তার ভ্রান্তি কেটে গেছে। জানাল আমার পরামর্শ মত গত হপ্তায় সে ড. কোয়েলসের সঙ্গে দেখা করেছিল। তিনি তাকে তেমন সাহায্য করতে পারেননি। তবে গতকাল সন্ধ্যায় মহিলা হঠাৎ করেই বুঝতে পারে সে তার স্বামীর ব্যাপারে এতদিন ধরে যা ভেবে আসছিল তা আসলে ভুল।

'আমি লিভিংরুমে বসে বই পড়ছিলাম,' বলল মিসেস সিলি। পার্সের ওপর নার্ভাস ভঙ্গিতে হাত রাখা। 'হঠাৎ আলের দিকে চোখ তুলে চাইলাম। ঘরের কোনায় বসে টিভি দেখছিল ও। হাসিমুখে মাথা নাড়ল সে। আমি বুঝতে পারলাম ও আসলে আমার স্বামী। আমার আল। আমার সত্যিকারের স্বামী। ড. মর্তুজা-' ডেস্কের ওপাশ থেকে বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকাল মিসেস সিলি-'আমি ঠিক বলতে পারব না গত হপ্তায় আমার কী হয়েছিল। আমি সত্যি জানি না। নিজেকে এখন এমন বোকা-বোকা লাগছে। সত্যি!' চেয়ারে হেলান দিল সে। 'আমার মত আরও অনেকের এরকম হয়েছে শুনেছি। আমাদের ক্লাবের এক মহিলা সেদিন বলল আমাকে; বলল এরকম নাকি আরও অনেকের জীবনেই ঘটেছে। ড. কোয়েলস ঘটনাগুলো শুনে ব্যাখ্যা দিলেন-'

ড. কোয়েলসের ব্যাখ্যা শোনাল আমাকে মিসেস সিলি। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনলাম, মাঝে মাঝে মাথা দুলিয়ে সায় দিলাম তাকে। তারপর হাসলাম। মহিলাকে অফিস থেকে বিদায় করলাম একরকম জোর করেই। কারণ সুযোগ দিলে সে বকবক করেই যেত।

মিসেস সিলি কথা বলার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্টের তালিকা নিয়ে এসেছিল আমার নার্স। আমি ওতে চোখ বুলিয়ে দেখেছি তালিকায় সেই তিন হাইস্কুল ছাত্রীর মাও আছেন। গত হপ্তায় উন্মাদের মত আচরণ করেছিল সে। বিকেল বেলা এল মহিলা। হাসিমুখে চেয়ারে বসায় আগেই কথা শুরু করে দিল। আমি অবশ্য জানতাম মহিলা কী বলবে। জানাল তার মেয়েরা ভাল আছে। ইংরেজির শিক্ষকের সঙ্গে

এখন ওদের ভাব হয়ে গেছে। শিক্ষকের কাছে গিয়ে মাফও চেয়েছে। তিনি ওদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। বলেছেন, ব্যাপারটা আসলে স্রেফ ভুল-বোঝাবুঝি ছিল। শিক্ষয়িত্রী নিজেই তাঁর ছাত্রীদের কাছে বলেছেন পুরো ব্যাপারটাই আসলে মজা করার জন্য করা হয়েছে। মহিলা বলল মেয়েদেরকে নিয়ে এখন তার আর কোনও দুশ্চিন্তা নেই। ড. কোয়েলস তাকে ব্যাখ্যা করেছেন ডেল্যুশন কীভাবে একজন মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে, বিশেষ করে কিশোরীদের।

সুখী মা ঘর থেকে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোন তুললাম আমি। শীলা লেনজের দোকানে ডায়াল করলাম। ও ফোন ধরার পর সাদামাটা ভঙ্গিতে জানতে চাইলাম আজকাল কেমন চলছে ওর। জবাব দেওয়ার আগে একমুহূর্ত নিশ্চুপ রইল শীলা, তারপর বলল, 'আমি তোমার ওখানে একবার যাব ভাবছিলাম,' হেসে উঠল ও, তবে তেমন জোরালো শোনাল না। 'জনের পরামর্শ কাজে লেগেছে, রায়হান। ডিল্যুশন বা যা-ই হোক ওটা, দূর হয়ে গেছে। আর রায়হান, এখন আমার বিব্রত লাগছে! জানি না ঠিক কী ঘটেছিল কিংবা কীভাবে ব্যাপারটা তোমাকে ব্যাখ্যা করব, তবে—'

বাধা দিলাম ওকে। বললাম কী ঘটেছে বুঝতে পারছি আমি। এজন্য ওকে বিব্রত হতে হবে না, মন খারাপ করারও দরকার নেই। স্রেফ ভুলে যেতে হবে ব্যাপারটা। আর আমি ওটাই চাই ওর কাছ থেকে।

ফোনের ওপর হাত রেখেই মিনিটখানেক বা তারও বেশি সময় আমি বসে রইলাম। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করছি। জন যা যা বলেছিল ঠিক তেমনটি ঘটছে। এখন মন থেকে ভয় দূর করে দিতে পারি আমি সহজেই। আর ক্যাথিও আজ রাতে বাড়ি ফিরতে পারবে।

আমি জোরে জোরে বললাম, 'জনিই ঠিক। জনি যা বলেছে তেমনই ঘটেছে। গত রাতে ও আমাদেরকে ডিল্যুশনের ব্যাখ্যা দিয়েছিল। আজ সকাল থেকে যে কজন রোগীর সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের সবাই কৃতজ্ঞতা ও উল্লাসের সঙ্গে জনির নামটা উচ্চারণ করেছে। খুব দ্রুত সবকিছুর সমাধান করে ফেলেছে জনি। আর

একাই। যে জনিকে এতদিন ধরে চিনি আমি, তার মধ্যে কৌতূহল আরও বেশি, চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে সে অন্তত দশবার ভেবে নেয়।' হঠাৎ একটা আশঙ্কা ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে—আমি যে জনিকে চিনি সে এ নয়। এ সেই জনি আদৌ নয়। যদিও চেহারা, কথা বলার ঢঙ, আচার-আচরণ সবকিছু একই রকম—'

মাথা নাড়লাম আমি। জোর করে দূর করে দিতে চাইলাম চিন্তাটা। এসব কী ভাবছি আমি? ও তো প্রমাণ করে দিয়েছে ও যা ভেবেছে তা-ই ঠিক। আঙুলের ছাপের ব্যাপারটা না হয় বাদই দিলাম। ও অবিশ্বাস্য শক্তিতে মিলভ্যালির মানুষের মন থেকে বিভ্রান্তিটা দূর করে দিতে পেরেছে। আমি ফোন থেকে হাত সরিয়ে নিলাম। আমার অফিসের জানালা দিয়ে শেষ বিকেলের আলো ঢুকছে তেরছাভাবে। নীচে, রাস্তা থেকে মানুষজনের হাঁকডাক ভেসে আসছে। স্বাভাবিক জীবনের চিত্র। গতরাতে কী ঘটেছিল তা নিয়ে দিনের আলোতে ভাবছি না আমি। প্রতিদিনকার রুটিনে কালকের ঘটনা যেন তার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে আমি মনে-মনে জন কোয়েলসের উদ্দেশে একটা স্যালুট ঠুকলাম। মনে-মনে নিজেকে বললাম: জনি আগেও যা ছিল এখনও তেমনটিই আছে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বাস্তববাদী একজন মানুষ। ও ঠিকই বলেছে আমরা সবাই বোকার মত আচরণ করেছি। কাজেই ক্যাথি রেনল্ডসের এখন আর নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে কোনও সমস্যা নেই।

সব কাজ শেষ করে সন্ধ্যা আটটার দিকে বাড়ি ফিরলাম আমি। ওরা আমার জন্য সাপার সাজিয়ে অপেক্ষা করছিল। এখনও আলো আছে। ফিওনা আর ক্যাথি বসে আছে বারান্দায়। পরনে অ্যাপ্রন বাড়ির কোথাও হয়তো খুঁজে পেয়েছে। আমাকে দেখে দুজনেই হাত নেড়ে হাসল। আমি গাড়ির দরজা বন্ধ করলাম। দোতলার খোলা একটা জানালা দিয়ে শরিফ ভাইয়ের টাইপরাইটারের খটখট শব্দ ভেসে এল। আমার পছন্দের মানুষগুলোর পদচারণার শব্দে আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে বাড়িটা। খুব ভাল লাগল আমার।

শরিফ ভাই বেরিয়ে এলেন। বারান্দায় সাপার খেতে লাগলাম আমরা। নীল, পরিষ্কার আকাশ। শরীরে আরামের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে

বাতাস। রাস্তার পাশে সার বেঁধে দাঁড়ানো প্রাচীন বিরাট গাছগুলোর পাতা নড়ছে বাতাসে, যেন আনন্দে শ্বাস ফেলছে। পাখি ডাকছে। দূরে কোথাও কেউ আগাছা কাটার যন্ত্র দিয়ে ঘাস কাটছে। গুঞ্জনের মত একটা শব্দ। ভালই লাগছে শুনতে।

বাসায় গিয়েছিল ক্যাথি। কয়েক প্রস্থ কাপড় নিয়ে এসেছে। দারুণ একটা ড্রেস পরেছে ও। চমৎকার লাগছে দেখতে। আমি হাসলাম ওর দিকে তাকিয়ে। আমার পাশে দোলনায় বসেছে ক্যাথি। 'দোতলায় যাবে?' বিনীত গলায় বললাম আমি। 'প্রেম করবে?'

'প্রেম করতে খুব ইচ্ছে করছে,' বিড়বিড় করল ক্যাথি। কফির কাপে চুমুক দিল। 'তবে এখন খুব খিদে পেয়েছে।'

'সো সুইট,' বলল ফিওনা। 'শরিফ, আমার সঙ্গে প্রেম করার সময় এমন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলোনি কেন?'

'সাহস পাইনি,' স্যাণ্ডউইচে কামড় বসালেন শরিফ ভাই।

আমার মুখ লালচে হয়ে উঠেছে। তবে অন্ধকারে কেউ তা লক্ষ করল না। অফিসে আজ কী ঘটেছে ওদেরকে বলতে পারতাম আমি। তবে বললে ক্যাথি হয়তো এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যেতে চাইবে। কিন্তু আমি চাই না ও এক্ষুনি চলে যাক। অন্তত আজকের সন্ধ্যাটা থাকুক আমার সঙ্গে। আমি ওকে নিজেই বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব।

ফিওনার খাওয়া শেষ। উঠে দাঁড়াল। 'আমি খুব ক্লান্ত'—ঘোষণা করল। 'ঘুমাব।' স্বামীর দিকে তাকাল। 'তুমি কী করবে, শরিফ? তোমারও ঘুমানো উচিত।' দৃঢ় শোনাল গলা। স্ত্রীর দিকে তাকালেন শরিফ। মাথা ঝাঁকালেন। 'হুঁ।' বললেন তিনি। 'ঘুমানো দরকার।' এক ঢোকে কাপের বাকি কফিটুকু শেষ করলেন। বারান্দার রেলিং ছেড়ে সিধে হলেন। 'কাল সকালে দেখা হবে,' আমাকে আর ক্যাথিকে বললেন। 'শুভ রাত্রি।'

ওদেরকে চলে যেতে বাধা দিলাম না। আমি এবং ক্যাথিও প্রত্যুত্তরে শুভরাত্রি বললাম। দেখলাম শরিফ দম্পতি বাড়িতে ঢুকল, কথা বলতে বলতে হেঁটে যাচ্ছে সিঁড়ির দিকে। সিঁড়িতে ওদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে ক্যাথির দিকে ফিরলাম আমি। 'একটু সরে বসতে

বললে মাইণ্ড করবে? বামপাশে এসে বসো?'

'না, মাইণ্ড করব না।' সিধে হলো ক্যাথি হাসিমুখে। 'কিন্তু কেন?' দোলনায় আবার বসল ও, তবে আমার বাম দিকে। বারান্দার রেলিঙে কফির কাপটা রাখার জন্য ওর দিকে ঝুঁকতে হলো। 'কারণ'–হাসলাম ওর দিকে তাকিয়ে–'আমি বামদিকে ফিরে চুমু খেতে পছন্দ করি। আমার কথা বুঝতে পারছ তুমি?'

'না, বুঝতে পারছি না'–হাসছে ও।

'ডান পাশে কোনও নারী বসলে–' ডানদিকে হাত ঘুরিয়ে দেখালাম আমি–'খুব অস্বস্তি লাগে আমার। যেন বাম হাত দিয়ে কিছু লেখার চেষ্টা করার মত মনে হয়। আমি বামপাশ না ফিরে চুমু খেতে পারি না।'

আমি একটা হাত দিয়ে ক্যাথির কাঁধ স্পর্শ করলাম। ক্যাথি মৃদু হাসল, ঘুরল আমার দিকে। আমি ঝুঁকলাম ওর দিকে। এ চুমুটা খুব দরকার ছিল আমার জন্য। হঠাৎ বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগল। তালুতে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হতে লাগল। আমি ক্যাথিকে চুমু খেলাম। ধীরে ধীরে। তারপর শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম, ওর মাথাটা হেলে গেল পেছনদিকে। আগ্রাসী চুম্বন করলাম ক্যাথিকে। এ যেন শারীরিক আনন্দের চেয়েও অনেক বেশি কিছু একটা; মনের মধ্যে, শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় ঘটে গেল নীরব বিস্ফোরণ। ওর নরম অধরের স্পর্শ পাচ্ছি আমি, পিঠ আর তার পাশটার ছোঁয়া লাগছে আমার হাতে, ওর শরীর আমার শরীরে লেগে থাকায় দারুণ রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে আচ্ছন্ন আমি। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি আবার চুমু খেলাম ওকে। কী ঘটছে তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার। আমার জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা কোনোদিন হয়নি। আমার হাত এগিয়ে গেল ক্যাথির উরু লক্ষ্য করে। ওকে এক্ষুণি দোতলায় নিয়ে যেতে আমি।

'রায়হান!' ...একটা কর্কশ পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল। কোত্থেকে বুঝতে পারলাম না। 'রায়হান।' আরও জোরে শোনা গেল কণ্ঠটা। আমি বোকার মত বারান্দার চারপাশে চোখ বুলালাম। 'এদিকে,

রায়হান, জলদি!' শরিফ ভাই। স্ক্রিন ডোরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে ইশারা করছেন।

আমি বুঝতে পারলাম ফিওনার কিছু একটা হয়েছে। এক লাফে বারান্দা পার হলাম। শরিফ ভাইয়ের পেছন পেছন লিভিংরুম হয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলাম। তবে শরিফ সিঁড়ির পাশ দিয়ে হলঘরের দিকে পা বাড়ালেন। বেজমেন্টের দরজা খুললেন। টর্চ জ্বাললেন। ওঁর পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম।

বেজমেন্টে ঢুকলাম আমরা। মেঝের নুড়িপাথরে জুতোর ঘষা লেগে কড়কড় শব্দ উঠল। শরিফ বেজমেন্টের দরজার কাঠের হুড়কো খুললেন। টর্চের আলো ফেললেন মেঝেতে। গোল অন্ধকার বৃত্ত স্থির হয়ে রইল।

কংক্রিটের ওপর ওগুলো কী শুয়ে আছে প্রথমে ঠাহর করতে পারলাম না আমি। একটু পরে বুঝতে পারলাম ওগুলো চারটে দানব বীজের গুটি। আকারে গোল, তিন-চার ফুট হবে ব্যাসার্ধ, ফেটে গেছে গুটি জায়গায় জায়গায়। দানব গুটির ভেতর থেকে ধূসর ব্লকের মত থকথকে একটা জিনিস বেরিয়ে এল, খানিকটা ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

দানব গুটিগুলো দেখে আমার মরুভূমিতে জন্মানো এক ধরনের আগাছার কথা মনে পড়ে গেল। বাতাসের মত হালকা ওগুলো, শুঁড়অলা একধরনের আগাছা। ওগুলোর মুখ থাকে খোলা, এগুলোর বন্ধ। দানব গুটিগুলোর শরীরের উপরের অংশ শক্ত, হলদেটে আঁশ দিয়ে তৈরি, আঁশের মধ্যে গুটির মত বাদামি কতগুলো শুঁড় দেখা যাচ্ছে।

'বীজের গুটি,' বিস্মিত গলায় বললেন শরিফ ভাই। 'রায়হান... খবরের কাগজের কাটিং-এ এগুলোর কথা পড়েছি আমি।'

আমি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালাম ওঁর দিকে।

'আরে, আজ সকালে যে জিনিসগুলো তুমি দেখিয়েছ আমাকে,' অধৈর্য গলা শরিফের। 'এক কলেজ প্রফেসরের উদ্ধৃতির কথা বলছিলে। তিনি বীজের গুটির কথা বলেছেন, রায়হান। দানব বীজের গুটি। গত গ্রীষ্মে শহরের পশ্চিমের কোথাও এগুলো দেখা গিয়েছিল।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন উনি আমার দিকে। আমি মাথা ঝাঁকালাম। মনে পড়েছে পেপার কাটিং-এর কথা। শরিফ ধাক্কা মেরে পুরোপুরি খুলে ফেললেন দরজা। ভেতরে ঢুকলাম। জিনিসটা আরও ভাল করে দেখতে চাই। প্রতিটি গুটির চার-পাঁচ জায়গায় ফাটল ধরেছে। ক্ষত বা ফাটল থেকে গলগল করে বেরিয়ে পড়ছে ধূসর পদার্থটা। শরিফের টর্চের আলোয় অদ্ভুত একটা জিনিস চোখে পড়ল। গুটি থেকে খানিক দূরে মেঝেতে পড়ে থাকা ধূসর থকথকে জিনিসটা বাতাসের সংস্পর্শে এসে যেন সাদা রঙে রূপান্তর ঘটতে শুরু করেছে। কোনোই সন্দেহ নেই শুঁড়অলা তুলোর মত জিনিসটা সঙ্কুচিত হচ্ছে নিজে নিজে, একটা আকার নিতে চলেছে।

একবার দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের নরম নলখাগড়া দিয়ে পুতুল বানাতে দেখেছিলাম। নলখাগড়ায় বিনুনি পাকিয়ে তারা মাথা, শরীর, হাত এবং পা বানাত। আমাদের পায়ের কাছে পড়ে থাকা ধূসর, ঘোড়ার লেজের মত জিনিসটাও তেমনি আকার নিচ্ছে। আঁশগুলো সম্প্রসারিত হচ্ছে, বিন্যস্ত হচ্ছে, প্রতিটির মাথা, শরীর এবং খুদে হাত পা আছে। আমার দেখা পুতুলের মত ধীরে ধীরে কাঠামো তৈরি করছে।

বলা মুশকিল কতক্ষণ ওখানে আমরা ছিলাম। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছি। ধূসর পদার্থটা গড়াতে থাকা লাভার মত দানব গুটি থেকে বেরিয়ে এসে জড়ো হচ্ছে কংক্রিটের মেঝেতে। বাতাসের সংস্পর্শে আসার পর রং হালকা হয়ে যাচ্ছে। সাদাটে ধূসর তুলো বেরিয়ে আসছে, কর্কশ আকারটা ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে এল।

স্থির দৃষ্টিতে দেখছি আমরা। মুখ হাঁ হয়ে আছে। প্রকাণ্ড গুটিগুলো ফেটে গেল, যেন শুকনো পাতা মুড়মুড় করে ভাঙল। লাভার মত জিনিসটা গড়িয়ে পড়তে গুটিগুলো আস্তে আস্তে সংকুচিত হতে শুরু করল। মেঝেতে পড়ে থাকা জিনিসগুলো এখন আর পুতুলের মত নয়, শিশুদের মত শারীরিক কাঠামো পেয়েছে। আর ধূসর পদার্থ উদ্‌গিরণ করা গুটিগুলো আকারে আরও ছোট হয়ে গেছে। সাদা আঁশগুলোর সম্প্রসারণ, সংকোচন চলছেই। মাথায় আস্তে ধীরে ফুটে উঠল কোটর।

নাকের একটা রেখা তৈরি হলো প্রতিটি ধূসর পদার্থের গায়ে; সেইসঙ্গে সৃষ্টি হলো মুখের রেখা। তার নীচে হাত, কনুই এবং আঙুলের রেখাও তৈরি হতে লাগল।

শরিফ ভাই এবং আমি একই সঙ্গে মুখ তুললাম, তাকালাম পরস্পরের দিকে। আর এ-দৃশ্য দেখা যায় না। টলতে টলতে তাকালাম বেজমেণ্টের দরজার দিকে। শেষবারের মত তাকালাম পেছন দিকে।

বেজমেণ্টের অসম্ভব প্রক্রিয়া প্রায় শেষের দিকে। বিরাট আকারের গুটিগুলো ছোট ছোট খণ্ডে টুকরো হয়ে ছিটিয়ে আছে মেঝেতে। প্রায় ধুলোর মত। আর গুটিগুলো যেখানে ছিল সেখানে এখন শুয়ে আছে চারটি শরীর। প্রাপ্তবয়স্কদের মত বড় আকারের। আঠালো আঁশের ঘন জটগুলো একসঙ্গে পড়ে রয়েছে একপাশে। চারটি শরীর। আমরা জানি ওগুলোর আমাদের একেক জনের চেহারায় রূপান্তর ঘটবে: একটা আমার মত হবে, একটা শরিফ, একটা ফিওনা আর বাকিটা ক্যাথির চেহারা ধারণ করবে।

'ওরা,' বিড়বিড় করলেন শরিফ ভাই। 'বাতাস থেকে পানি শুষে নিয়ে বেঁচে থাকে। আর মানুষের শরীরের আশির ভাগই পানি। ওরা সেই পানি শুষে নেয়।'

আমাদের সবচেয়ে কাছের দুটো শরীরের একটার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। একটা হাত তুলে দেখলাম। আঙুলে কোনও রেখা ফুটে নেই। একসঙ্গে দুটো চিন্তা খেলে গেল মাথায়: ওরা আমাদেরকে গ্রাস করবে, শরিফের দিকে মাথা তুলে চাইলাম আমি। ভাবলাম—ক্যাথিকে কোথাও যেতে দেওয়া যাবে না। ওকে আমার বাড়িতেই থাকতে হবে।

দশ

রাত ২.৩১ মিনিট। ঘড়ি দেখলাম মাত্র। শরিফ ভাইকে ঘুম থেকে তুলতে আরও ৯ মিনিট বাকি। আমি এ মুহূর্তে পাহারা দিচ্ছি বাড়ি। দুজনে পালা করে পাহারা দিচ্ছি। ওপরতলার হলওয়েতে হেঁটে ক্যাথির ঘরের সামনে গেলাম। মোজা পরা বলে শব্দ হলো না। নিঃশব্দে খুললাম দরজা। ঢুকলাম ভেতরে। তারপর মাঝরাতে এ নিয়ে তৃতীয়বারের মত জ্বাল্যলাম টর্চ। ঘরের প্রতি কোণে আলো ফেললাম। বাড়ির প্রতিটি ঘর এভাবে পরীক্ষা করে দেখছি আমি। ঝুঁকে ক্যাথির খাটের নীচে আলো ফেললাম। তারপর ক্লজিট খুলে পরীক্ষা করে দেখলাম।

টর্চের নীলচে সাদা আলোয় ক্যাথির মাথা পরখ করে দেখলাম। তাকালাম মুখের দিকে। ওর ঠোঁটজোড়া সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। ছন্দোবদ্ধ নিশ্বাসের তালে ওঠানামা করছে বুক। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে ওকে। খুবই সুন্দরী ক্যাথি। ইচ্ছে করল ওর পাশে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য শুয়ে থাকি। অনুভব করি ওর শরীরের উষ্ণতা। ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, পা বাড়ালাম চিলেকোঠার সিঁড়িঘরের দিকে।

চিলেকোঠায় যেসব জিনিস থাকার কথা সবই আছে। টর্চের আলোয় দেখলাম ঘরে সারি-সারি পোশাক আর কোট হ্যাঙারে ঝুলছে। ধুলো যাতে না লেগে যায় সেজন্য কাভার দেওয়া। মেঝের এক কোণে চন্দনকাঠের সিন্দুক। বাবার কাঠের আলমারিটাও আছে। আলমারির ওপরে বাবার ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট বাঁধানো। মিলভ্যালিতে দুই দশকের ওপর বাবা যেসব রোগী দেখেছেন তাদের সবার রোগের বৃত্তান্ত নিয়ে অসংখ্য ফাইল আলমারিতে। এসব রোগীর অর্ধেকেই এখন বেঁচে নেই।

জানালার কাছে হেঁটে গেলাম। এখানে ছেলেবেলায় বসে বই পড়তাম। তাকালাম নীচের অন্ধকার শহরের দিকে। শহরের মানুষ

এখন গভীর ঘুমে অচেতন। এদের অনেককেই বাবা এ পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন। আমি ম্যাকসিনিদের বাড়ির সামনের বারান্দায় তাকালাম। বাতির আলোতে ঝলমল করছে। বাড়ির দোতলাটা অন্ধকার। এখান থেকে গ্রিসনদের বাড়ির বারান্দাও দেখা যায়। সাতবছর বয়সে ডট গ্রিসনের সঙ্গে ওখানে বসে খেলতাম। ওদের বারান্দার লম্বা রেলিংটা ভিতরের দিকে একটু বেঁকে গেছে। রেলিঙে রঙ লাগানোও দরকার। ওরা বাড়ির অবস্থা এরকম করে রেখেছে কেন ভেবে অবাক লাগল। অথচ গ্রিসনরা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। গ্রিসনদের বাড়ির ওপাশে ব্লেইন স্মিথদের সাদা কাঠের বেড়া। এ শহরের প্রায় সবখানে ছড়িয়ে আছে আমার বন্ধুবান্ধব আর প্রতিবেশী। আমি এদের বেশিরভাগকেই চিনি। রাস্তায় দেখা হলে অন্তত হাই-হ্যালোটুকু বলা হয়। ছেলেবেলা থেকে বড় চেনা আমার এই শহরের প্রতিটি রাস্তাঘাট, অলিগলি, বাড়ি, মাঠ-প্রান্তর।

তবে একে আমি যেন আর চিনতে পারছি না। আমার চোখ দেখছে কোনও পরিবর্তন নেই, তবে আমার মন বলছে সবকিছু বদলে গেছে। আমার জানালার নীচের আলোকিত ফুটপাত, বড় চেনা সামনের বারান্দা, সারি সারি অন্ধকার বাড়ি, তার পেছনে শহর–সবকিছুই ভয়ংকর লাগছে। চেনা সবগুলো জিনিস এবং মুখ যেন বিকট ভঙ্গি করে ভ্যাঙচাচ্ছে, শহর বদলে গেছে অথবা ভয়ানক কিছু একটা বদলে যেতে শুরু করেছে। আমার পিছু নিয়েছে ওরা। আমি জানি আমাকে ওরা গ্রাস করতে চাইছে।

সিঁড়িতে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠল, তারপর ভেসে এল মৃদু পায়ের শব্দ। অন্ধকারে পাঁই করে ঘুরলাম। সামনের দিকে ঝুঁকে গেছি, টর্চলাইটটা অস্ত্রের ভঙ্গিতে বাগিয়ে ধরা। শরিফ ভাইয়ের নরম গলা, 'আমি।' টর্চ জ্বালালাম। আলোয় ওঁর চেহারা দেখলাম। ক্লান্ত, ঘুমঘুম। আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আলো নিভিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকলাম মিলভ্যালির দিকে। আমাদের পায়ের নীচে ঘুমন্ত বাড়ি, বাইরের রাস্তা, গোটা শহর স্থির এবং মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ। বিড়বিড় করলেন শরিফ ভাই, 'নীচে গিয়েছিলে?'

'হুঁ,' বললাম আমি। 'দুশ্চিন্তার কারণ নেই। প্রত্যেকটার শিরায় একশ' সিসি বাতাস ঢুকিয়ে দিয়েছি।'

'মরে গেছে?'

কাঁধ ঝাঁকালাম। 'ওগুলো আগের অবস্থায় ফিরে গেছে।'

'সেই ধূসর জিনিসে পরিণত হয়েছে?'

মাথা দোলালাম সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে। জানালায় ভেসে আসা তারার আলোয় দেখলাম কেঁপে উঠেছেন শরিফ ভাই। কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেন, 'এটা ডিল্যুশন নয়। আমরা চোখে ভুল দেখছি না। ওরা জ্যান্ত মানুষের নকল করছে। জন ভুল বলেছে।'

'হুঁ।'

'রায়হান, ওরা যখন একজনকে নকল করে তখন আসল মানুষটার কী হয় বলতে পারো? দুজনেরই কি অস্তিত্ব থেকে যায়? একসঙ্গে হাঁটাচলা করে?'

'অবশ্যই না।' বললাম আমি। 'এরকম কিছু হলে ওদেরকে দেখতে পেতাম। আসল মানুষের কী ঘটে আমি জানি না, শরিফ ভাই।'

'তোমার সমস্ত রোগী কেন তোমাকে একযোগে বোঝানোর জন্য খেপে উঠল যে কোনও সমস্যা নেই? ওরা আসলে তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে, রায়হান।'

আমি শুধু কাঁধ ঝাঁকালাম। আমি শান্ত, বিব্রত। জবাব দেওয়ার চেষ্টা করলে বাধা দিতেন শরিফ ভাই।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন উনি। 'যা ঘটছে আমরা আশা করছি মিলভ্যালির নির্দিষ্ট কিছু এলাকাতেই ঘটছে আর যদি তা না হয়–' কাঁধ ঝাঁকালেন, শেষ করলেন না কথা। তারপর বললেন, 'কাজেই প্রতিটি বাড়ি এবং ভবন, গোটা শহরের সবগুলো অবরুদ্ধ জায়গা সার্চ করতে হবে। আর কাজটা এক্ষুনি করতে হবে, রায়হান।' শান্ত শোনাল কণ্ঠ। 'প্রতিটি নারী, পুরুষ এবং শিশুকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এবং তা এক্ষুনি। তবে কীসের জন্য তা জানি না। শুধু জানি দ্রুত করতে হবে কাজটা।' নীরব হয়ে গেলেন শরিফ। তারপর বললেন, 'স্থানীয় বা রাজ্য পুলিশকে দিয়ে একাজ হবে না। তাদের সে ক্ষমতাও নেই। ওদেরকে বিষয়টা

বোঝাতে যাচ্ছ, ব্যাপারটা চিন্তা করো একবার। রায়হান, এটা ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি।' ঘুরলেন আমার দিকে। 'এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি আমরা হইনি কোনও দিন। এটা মানব ইতিহাসের জন্য নতুন একটা হুমকি।' আবার চুপ করে গেলেন তিনি। যখন কথা বললেন জরুরি শোনাল কণ্ঠ। 'কাজেই কাউকে রায়হান,–সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, এফবিআই, আমি জানি না কী বা কে–তবে কাউকে-না-কাউকে অত্যন্ত দ্রুত এ শহরে আসতে হবে। তাদেরকে মার্শাল ল বা অন্য কিছু জারি করতে হবে–যে কোনও কিছু। অবরুদ্ধ করে ফেলতে হবে এ শহর। তারপর যা করা দরকার করতে হবে।' ওঁর গলার স্বর নেমে গেল ঝপ করে। 'মূল থেকে উপড়ে ফেলো ওদেরকে, ভেঙে ফেলো, গুঁড়িয়ে ফেলো, হত্যা করো।'

আমরা ওখানে দাঁড়িয়ে রইলাম আরও কিছুক্ষণ। ভাবছি আমাদের চারপাশে কী আছে, ছাদের নীচে কী আছে, আড়ালে কী লুকিয়ে রয়েছে। আর এদের সম্পর্কে ওভাবে শুধু ভাবলেই হবে না। কিছু একটা করতে হবে। 'নীচতলায় কফি আছে,' বললাম আমি। ঘুরলাম দুজনে। পা বাড়ালাম সিঁড়ির দিকে।

রান্নাঘরে ঢুকলাম। কফি ঢেলে নিলাম দুটো কাপে। শরিফ ভাই টেবিলের ওপর বসলেন, আমি স্টোভের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। 'ঠিক আছে, শরিফ ভাই,' বললাম আমি। 'কিন্তু কীভাবে? আমরা কী করব? প্রেসিডেন্ট কার্টারকে ফোন করব বা অন্য কিছু? হোয়াইট হাউজে ফোন করে তাঁকে বলব এখানে, মিলভ্যালিতে, গত নির্বাচনে যেখানে ডেমোক্রেটরা জিতেছে সেই শহরে আমরা কিছু লাশ খুঁজে পেয়েছি–সেগুলো ঠিক লাশ নয়, অন্যকিছু। তবে এগুলো কী আমরা জানি না। দয়া করে মেরিন সেনাদেরকে পাঠিয়ে দিন। এই বলব?'

অধৈর্য ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন শরিফ ভাই। 'আমি জানি না। কিন্তু আমাদের কিছু একটা করতেই হবে। যারা কাজ করতে পারবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করাটা খুবই জরুরি। তামাশা রেখে কোনও উপায় খুঁজে বের করো।'

মাথা ঝাঁকালাম আমি। 'ঠিক আছে। চেইন অভ কমাণ্ড।'

'মানে?'

চোখ সরু করে তাকালাম শরিফের দিকে। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। ওর প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছি। 'শুনুন, ওয়াশিংটনে আপনার পরিচিত কেউ আছে? এমন কেউ যে আপনাকে খুব ভালভাবে চেনে, জানে আপনি অপ্রকৃতিস্থ নন? আপনি যখন এ-গল্পটা বলবেন সে যেন বিশ্বাস করে। এমন কাউকে বলা দরকার যে বলটা গড়িয়ে দেবে। বল গড়াতে গড়াতে এমন কারও কাছে গিয়ে পৌঁছাবে যে সত্যি কিছু একটা করতে পারবে!'

একটু ভেবে নিয়ে মাথা নাড়লেন শরিফ ভাই। 'ওয়াশিংটনে আমার পরিচিত কেউ নেই। তোমার আছে?'

'না,' স্টোভের পাশে বসলাম আমি। তারপর মনে পড়ে গেল একজনের কথা। কাঁধ ঝাঁকালাম। 'একজনকে অবশ্য চিনি। ওয়াশিংটনে ওকেই শুধু চিনি আমি। বেন ওইথলার। স্কুলে আমার চেয়ে এক ক্লাস ওপরে পড়ত। এখন রেগুলার আর্মিতে আছে। পেন্টাগনে কাজ করে। তবে ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাত্র। আর কাউকে চিনি না।'

'ওকে দিয়েই কাজ হবে।' দ্রুত বললেন শরিফ ভাই। 'আর্মি ব্যাপারটা সামাল দিতে পারবে। আর ও পেন্টাগনে ভাল একটা পদে আছে। অন্তত একজন জেনারেলের সঙ্গে তো কথা বলতে পারবে।'

'ঠিক আছে–' মাথা দোলালাম আমি। 'ওকে বললে অন্তত ক্ষতি নেই। আমি ওকে ফোন করব।' আমি কফির কাপে একটা চুমুক দিলাম।

শরিফ খ্যাঁকখ্যাঁক করে উঠলেন। 'করব না। করো এক্ষুনি, রায়হান। তুমি কীসের জন্য অপেক্ষা করছ।' তারপর গলা নামালেন। 'সরি, কিন্তু–রায়হান, আমাদের এক্ষুনি কাজে নেমে পড়া দরকার।'

'ঠিক আছে,' স্টোভের পাশে নামিয়ে রাখলাম কাপ। ঢুকলাম লিভিংরুমে। শরিফ আমার পেছন পেছন এলেন। ফোন তুলে জিরো নম্বরে ডায়াল করলাম। অপারেটরের সাড়া পেয়ে ধীর গলায়, সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করলাম শব্দ, 'আমাকে ওয়াশিংটন ডিসিতে লাইন দিন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল বেনজামিন ওইথলার। আমি তার নম্বর জানি না।

তবে ফোনবুকে নম্বরটা পাবেন।' শরিফের দিকে ঘুরলাম। 'বেডরুমে একটা বাড়তি লাইন আছে। ওখানে যান। কী বলছি শুনতে পাবেন।'

কানে ফোন লাগিয়ে বিপবিপ শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি, তারপর খুটখাট আওয়াজ, অস্পষ্ট ইলেকট্রিক গুঞ্জন, এরপর নীরবতা। অবশেষে রিং হওয়ার শব্দ।

তিনবার রিং বাজার পর বেনের কণ্ঠ শুনতে পেলাম। পরিষ্কার। 'হ্যালো?'

'বেন?' অজান্তে গলা চড়ে গেল আমার। লং-ডিসট্যান্সের ফোনে লোকে যেভাবে কথা বলে। 'আমি রায়হান মর্তুজা। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বলছি।'

'হাই রায়হান!' উচ্ছ্বসিত শোনাল কণ্ঠ। 'কেমন আছ তুমি?'

'ভাল, বেন। কেটে যাচ্ছে একরকম। আমি কি তোমাকে ঘুম থেকে জাগালাম?'

'আরে না, সাড়ে ৫টা বাজে। এখনও ঘুমিয়ে থাকব নাকি?'

আমি মৃদু হাসলাম। 'ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে ভালোই করেছি। আমরা তোমাদেরকে ট্যাক্স দিই সারাদিন ঘুমিয়ে থাকার জন্য নয়।' তারপর সিরিয়াস গলায় বললাম, 'তোমার একটু সময় হবে? ধরো আধঘণ্টা? আমি কিছু কথা বলব। তোমাকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। ব্যাপারটা সংঘাতিক জরুরি, বেন। আমি পুরো ব্যাপারটা তোমাকে ব্যাখ্যা করতে চাই। আমার কথা শুনবে?'

'অবশ্যই। এক মিনিট।' কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর দূর থেকে পরিষ্কার গলা শোনা গেল। 'বলো, রায়হান।'

আমি বললাম, 'বেন, তুমি আমাকে চেনো। আমাকে খুব ভালো করে জানো। আমি এ মুহূর্তে মাতাল নই, তুমি জানো আমি উন্মাদ নই এবং জানো মাঝরাতে বন্ধুদের সঙ্গে ফাজলামিও আমি করি না। যা বলব বিশ্বাস হতে চাইবে না তোমার। তবে আমার প্রতিটি কথা সত্যি। আমি চাই ঘটনাটা শোনার সময় ব্যাপারটা তুমি বোঝার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, রায়হান।' শান্ত গলা বেনের।

'সপ্তাখানেক আগে,' ধীরে ধীরে শুরু করলাম আমি, 'গত বৃস্পতিবার...' শান্ত গলায়, মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে বলে যেতে লাগলাম। ওকে পুরো গল্পটা বলার চেষ্টা করলাম। আমার অফিসে ক্যাথির আগমন থেকে শুরু করলাম, কুড়ি মিনিট বাদে আজ রাতের ঘটনা বলে উপসংহার টানলাম।

একজন মানুষের চেহারা না-দেখে স্রেফ টেলিফোনে জটিল এবং দীর্ঘ একটা গল্প বলা সহজ নয়। আর ফোনটাও খুব বিরক্ত করছিল। প্রথমে বেনের গলা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম, ও-ও শুনতে পাচ্ছিল আমার কথা। যেন দরজার এপাশে আর ওপাশে বসে কথা বলছি দুজনে। কিন্তু আজকের ঘটনা বলা শুরু করেছি, কানেকশন দুর্বল হয়ে এল। বেন বারবার আমাকে কথার পুনরাবৃত্তি করতে বলল। প্রায় চিৎকার করতে হলো আমাকে ফোনে। আর প্রতিটি শব্দ বারবার উচ্চারণ করার সময় মানুষ ভালভাবে কথা বলতে পারে না, ঠিকভাবে চিন্তাও করতে পারে না। অপারেটরকে বললাম কানেকশন ঠিক করে দিতে। একটু পর কানেকশন পরিষ্কার হয়ে এল। তবে কানের মধ্যে খড়খড় করতে লাগল রিসিভার। তার মধ্যেই কথা বলার চেষ্টা করলাম। দুইবার কানেকশন একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, হঠাৎ ডায়াল টোন গুঞ্জন তুলল কানে। আমি অপারেটরকে গালাগাল দিতে লাগলাম। বেনের সঙ্গে শেষের দিকে ভালভাবে কথাই বলতে পারলাম না। বারবার বাধা পেলে কি আর ঠিকমত কথা বলা যায়।

আমার কথা শেষ হলে একটু বিরতি দিল বেন। তারপর বলল, 'আমাকে তুমি কী করতে বলো, রায়হান?'

'জানি না, বেন–' লাইন হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল– 'তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ কিছু একটা করা দরকার। গল্পটা অন্য কাউকে বলা দরকার। আর এক্ষুনি। ওয়াশিংটনে এমন কাউকে গল্পটা শোনাও যে কিছু করতে পারবে।'

হাসল বেন, জোর করে হাসি। 'রায়হান, আমি কোথায় আছি মনে আছে তো? পেন্টাগন ভবনের সামান্য একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল

আমি। আমি দারোয়ানকেও সালাম দিই। আমাকে কেন, রায়হান? এখানে আর কারও সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই যে সত্যি–'

'না, ড্যাম ইট! পরিচয় থাকলে তো তার সঙ্গেই কথা বলতাম। এমন কারও সঙ্গে পরিচয় থাকতে হবে যে আমাকে চেনে। যে জানে আমি পাগল বা উন্মাদ নই। আর তুমি ছাড়া অন্য কাউকে আমি চিনি না। বেন, তোমাকেই কাজটা করতে হবে–'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে–' ওর কণ্ঠ নরম। 'আমার পক্ষে যা করা সম্ভব আমি করব। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমার কর্নেলকে গল্পটা বলব। আমি তাকে ঘুম থেকে তুলব। সে জর্জ টাউনে থাকে। তুমি আমাকে যা যা বলেছ, যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি পুরোটা তাকে বলব। আমি বলব আমি জানি তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কের একজন মানুষ। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি তুমি যা বলেছ তা সব সত্যি। কিন্তু এর বেশি কিছু করতে পারব না, রায়হান।'

একমুহূর্ত বিরতি নিল বেন, তারপর বলল, 'তবে, রায়হান, এতে খুব একটা কাজ হবে বলে মনে হয় না। আমার কর্নেল গল্পটা শুনে কী করবে? সে হয়তো জেনারেলকে গল্পটা শোনোবে। সেখান থেকে আরও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা হয়তো গল্পটা শুনবেন। কিন্তু তাঁরা গল্প শুনে কী করবেন? তাঁরা হয়তো ঘটনাটা বিশ্বাসই করতে চাইবেন না। আসলে তাঁরা ব্যাপারটাকে পাওাই দেবেন না। তুমি তো সেনাবাহিনীকে চেনো।'

ক্লান্ত, পরাজিত গলায় বললাম আমি, 'হুঁ।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম একটা। 'তুমি ঠিকই বলেছ, বেন।'

'তবু আমি কাজটা করব। আমার সার্ভিস রেকর্ডের গুল্লি মারো। কপালে যা থাকে হবে। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করেছি, রায়হান। আমার মনে হচ্ছে তোমাদের শহরে মারাত্মক কিছু একটা ঘটছে। আর এটার তদন্ত হওয়া দরকার। তুমি যদি মনে করো আমার উচিত–'

'না,' দৃঢ় গলায় বললাম এবার। 'বাদ দাও, বেন। তুমি ঠিকই বলেছ ব্যাপারটাকে কেউ পাত্তা দেবে না। যখন কোনও কাজ হবেই না তখন চাকরির ঝুঁকি নিয়ে কিছু করার দরকার নেই।'

আমরা আরও কিছুক্ষণ কথা বললাম। বেন খবরের কাগজের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিল। বললাম সাংবাদিকরা ব্যাপারটাকে ইউএফও ধরনের কিছু একটা ভেবে নিয়ে রসালো গল্প ফেঁদে বসবে। এফবিআই'র সাহায্য নিতে বলল বেন। বললাম, ওর কথাটা ভেবে দেখব। প্রতিশ্রুতি দিলাম ওর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলব। বিদায় জানিয়ে রেখে দিলাম ফোন। একটু পর সিঁড়ি ভেঙে এলেন শরিফ।

'তো?' জিজ্ঞেস করলেন উনি। কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। বলার মত তো কিছু নেই। একমুহূর্ত পরে জানতে চাইলেন শরিফ ভাই, 'এফবিআই-কে ফোন করবে?'

ফোনের দিকে ইঙ্গিত করলাম, 'ফোন তো আছেই। চেষ্টা করে দেখুন।' শরিফ সানফ্রান্সিসকোর ফোন বুক খুলে বসলেন।

কিছুক্ষণ পর ৫৫২-২১৫৫-এ ডায়াল করলেন তিনি। তাকিয়ে দেখলাম আমি। শরিফ ভাই রিসিভার এমনভাবে ধরলেন যেন আমি শুনতে পাই। রিং হওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর একটা লোক বলে উঠল, 'দুত্তোর–' কেটে গেল লাইন। শুরু হলো ডায়াল টোন।

আবার ডায়াল করলেন শরিফ ভাই। খুব সতর্কতার সঙ্গে। রিং শুরু হওয়ার আগেই অপারেটরের গলা শোনা গেল, 'কার নম্বর চাইছেন, প্লিজ।' জানালেন শরিফ ভাই। মহিলা বলল, 'এক মিনিট, প্লিজ।' তারপর রিং শুরু হলো। বেজেই চলল। তারপর থেমে গেল, আবার বাজল রিং, আবার বিরতি। এভাবে অন্তত ছবার ঘটল। অপারেটর বলল, 'আপনার লোক ফোন ধরছে না।' শরিফ ফোনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন একমুহূর্ত। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে।'

আমার দিকে মুখ তুলে চাইলেন শরিফ ভাই। কথা বলার সময় আশ্চর্য শান্ত শোনাল কণ্ঠ, 'ওরা লাইন দেবে না, রায়হান। ওখানে একজন আছে। সে আমাদের প্রশ্নের জবাব দেয়। তবে আমাদের নম্বর তারা কখনোই ধরে দেবে না, রায়হান। ওরা টেলিফোন অফিস দখল করে নিয়েছে। আর কী কী ওরা গ্রাস করেছে খোদা জানেন।' আমি মাথা ঝাঁকালাম, 'আমারও তাই ধারণা।' ভয়াবহ একটা আতঙ্ক গ্রাস করল আমাদেরকে।

এগারো

তাড়া খাওয়া প্রাণীর মত ছোটাছুটি শুরু করে দিলাম আমরা। আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েরা, চোখ পিটপিট করছে আলোয়, চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি। তবে আমাদের চেহারা দেখে যা বোঝার বুঝে নিল। সংক্রামক রোগের মত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল ওদের মধ্যে। তারপর আমরা ভীতসন্ত্রস্ত প্রাণীর মত ছোটাছুটি শুরু করে দিলাম। জামাকাপড় গোছাতে লাগলাম। শরিফ ভাই কসাইর একটা ছুরি গুঁজে নিলেন বেল্টে, বাসায় যা ছিল প্রতিটি পাইপয়সা পকেটে ঢুকালাম। ফিওনাকে দেখলাম রান্নাঘরে, তখনও রেডি হতে পারেনি, ক্যানভর্তি খাবার ঢোকাচ্ছে একটা ছোট কার্টনে।

হলঘরে ছুটতে গিয়ে একজন আরেকজনের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম, বাড়ি লাগল সিঁড়ি বেয়ে উঠতে এবং নামতে গিয়ে; আমাদের ব্যস্ততা দেখতে নিশ্চয় পুরোনো আমলের নির্বাক কমেডি ছবির মত লাগছিল, তবে দৃশ্যটা দেখে হাসাহাসি করার মত কেউ ছিল না। আমরা ছুটে পালাচ্ছিলাম। বাড়ি থেকে, শহর থেকে, যত দ্রুত সম্ভব। আমরা হঠাৎ যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, বুঝতে পারছি না কী করব, কার বিরুদ্ধে কিংবা কীভাবে লড়াই করব। আমাদের কল্পনা এবং চিন্তাচেতনার বাইরে অসম্ভব রকম ভয়ংকর অথচ চরম বাস্তব একটা জিনিস আমাদেরকে ধাওয়া করছে। আমরা তাই পালাচ্ছি।

ফিওনার পায়ে এখনও বেডরুমের চটি, আমরা নীরব, অন্ধকার রাস্তায় পার্ক-করা শরিফের গাড়ির দিকে ছুটলাম। গাড়ির পেছনের আসনে ছুঁড়ে ফেললাম জামাকাপড়। গাড়িতে স্টার্ট দিলেন শরিফ ভাই। পিচের রাস্তায় চাকার ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ কিচ্‌চ্‌ শব্দ উঠল, ফুটপাত থেকে সরে এল, আমরা ছুটলাম। আমরা ছুটছি। আমরা পালাচ্ছি। আমরা কিছুই ভাবতে পারছি না। মাথা কাজ করছে না। চলে এলাম ইউএস ১০১-এ,

মিলভ্যালিকে এগারো মাইল পেছনে ফেলে।

প্রায় নির্জন রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটছে, আস্তে আস্তে চিন্তাভাবনাগুলো জড়ো হতে লাগল মস্তিষ্কে। ক্যাথি আমার পেছনে, ব্যাকসিটে বসেছে। হাসিমুখে ফিরলাম ওর দিকে। ঘুমাচ্ছে। মুখটা ম্লান। পাশ দিয়ে যাওয়া একটা গাড়ির হেডলাইটের আলোয় রক্তশূন্য লাগল চেহারা। আবার আমার মধ্যে ফিরে এল সেই ভয়। নির্জলা আতঙ্কের নীরব বিস্ফোরণ ঘটল মস্তিষ্কে।

শরিফ ভাইয়ের কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে লাগলাম। ওঁকে গাড়ি থামাতে বলছি। অন্ধকার রাস্তা ছেড়ে নোংরা, নুড়িপাথরের সরু রাস্তায় নেমে এলেন শরিফ। ব্রেক কষলেন। কমপার্টমেন্টের বোতামে ঘুসি মারলেন। খুলে গেল ওটা। ভেতরে কী যেন খুঁজলেন, তারপর হাঁচড়েপাঁচড়ে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। ওঁর চেহারা হিংস্র দেখাচ্ছে। আমিও ওঁর সঙ্গে নেমে পড়লাম। ড্যাশবোর্ড থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছি চাবি। দুজনে ছুটলাম গাড়ির পেছনদিকে। কিন্তু শরিফ দৌড়ে চললেন নুড়ির রাস্তায়। আমি ওকে থামতে বলার জন্য মুখ খুলেছি, উনি এক হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়লেন মাটিতে। উনি কী করছেন বুঝতে পারছি। ফ্লেয়ার জ্বেলেছেন। ফ্লেয়ার জ্বালিয়ে গাড়ির পেছনে চলে এলেন। আমি গাড়ির ট্রাঙ্কের তালায় চাবি ঢুকিয়ে দিলাম। মোচড় দিতে লাগলাম উন্মাদের মত।

আমার হাত থেকে চাবি নিলেন শরিফ। গোছা থেকে বেছে নিলেন সঠিক চাবিটি। ঢোকালেন তালায়। মোচড় দিলেন। তারপর ট্রাঙ্কের ডালা তুলে দিলেন। ওখানে শুয়ে আছে ওরা। ফ্লেয়ারের লাল আলো ঢেউ খেলছে শরীরে। প্রকাণ্ড দুটো বীজ। ইতিমধ্যে বিস্ফোরিত হয়েছে দু'এক জায়গায়। দুহাত বাড়িয়ে দিলাম আমি। হ্যাঁচকা টান মেরে তুলে নিয়ে ওগুলোকে ফেলে দিলাম রাস্তায়। ওগুলোর ওজন নেই। বাচ্চাদের বেলুনের মত, আমার হাতে এবং আঙুলে কর্কশ, শুকনো একটা স্পর্শ লাগল। চামড়ায় ওগুলোর ঘিনঘিনে ছোঁয়া আমার মাথায় জ্বালিয়ে দিল আগুন। আমি পা দিয়ে মাড়িয়ে দিতে লাগলাম ওগুলোকে। জানিও না ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণায় আ-আ-আ চিৎকার বেরিয়ে আসছে আমার মুখ

থেকে।

কতক্ষণ ওগুলোকে পা দিয়ে উন্মাদের মত মাড়িয়েছি জানি না, শরিফ আমাকে হাত ধরে টানতে টানতে ওখান থেকে সরিয়ে আনলেন। আবার ফিরে এলাম গাড়ির ট্রাঙ্কের সামনে। শরিফ গ্যাসোলিনের অতিরিক্ত ক্যানটা বের করলেন। রাস্তার ধারে ওজনহীন প্রকাণ্ড দুটো স্তূপের ওপর খালি করলেন পুরো ক্যান। ওগুলো গলে থকথকে কাদা হয়ে গেল। আমি মাটি থেকে একটা ফ্লেয়ার তুলে নিয়ে থকথকে সুপের মত দেখতে জিনিসটার গায়ে ছুঁড়ে মারলাম।

গাড়িতে চড়ে বসলাম আমরা। আবার ছুটল গাড়ি। পেছনে তাকালাম। ফ্লেয়ারের শিখা হঠাৎ লাফ মেরে উঠে গেল পাঁচ-ছয় ফুট ওপরে। কমলা রঙের শিখার সঙ্গে গোলাপি, ঘন একটা ধোঁয়ার মেঘ মোচড় খেতে লাগল। শরিফ ভাই গাড়ির গতি আরও বাড়িয়েছেন, লক্ষ করলাম আগুনের শিখা হঠাৎ লাফিয়ে নেমে এসেছে নীচে, ইঞ্চিখানেক দৈর্ঘ্যের নীল-লাল জিভ বের করে জ্বলছে, রক্ত-গোলাপি রঙের ধোঁয়া দেখা গেল আবার। তারপর হঠাৎ নিভে গেল আগুন। মাটির ছোট একটা টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল দৃশ্যটা।

আমরা এ মুহূর্তে কেউ কিছু বলছি না, ভাবছিও না। কথা বলা এবং চিন্তা করার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি একহাতে ক্যাথির হাত ধরে আছি, আরেক হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল, মোড় নিচ্ছি রাস্তায়, বাঁক ঘুরছি। ক্যাথি আমার পাশে শিরদাঁড়া টানটান করে বসে আছে নীরবে।

এক ঘণ্টা কিংবা তারও পরে একটা মোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করালাম। ওটার মাথায় সবুজ নিয়নে লেখা: **খালি**। শব্দটাকে ঠাণ্ডা এবং অনান্তরিক মনে হলো। শরিফ নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। আমি আমার দিকের দরজা খুলেছি, ক্যাথি ঝুঁকে এল, ফিসফিস করল, 'আমি একা রুমে থাকতে পারব না, রায়হান। আমার ভীষণ ভয় করছে। আজ রাতে কিছুতেই আমি একা থাকতে পারব না।' মাথা ঝাঁকালাম আমি। নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। মোটেলের মালিককে ঘুম থেকে তুললাম। মাঝবয়েসি এক মহিলা। পায়ে চটি। তাকে ক্লান্ত এবং বিরক্ত মনে

হলো। এত রাতে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলায় বিরক্ত। আধডজন শব্দও ব্যবহার করতে হলো না, দুটো ডাবল রুম পেয়ে গেলাম। ভাড়া চুকিয়ে দিলাম। চাবি দিয়ে দিল মহিলা। রেজিস্ট্রেশন কার্ডে সই করতে হলো। ছদ্মনাম লিখলাম। শরিফ ভাইও তাই করলেন। চাই না কেউ জানুক আমরা এখানে আছি।

গাড়ির ব্যাকসিটে স্তূপ করা জামাকাপড় থেকে রাতে পরার জন্য পাজামা খুঁজে নিলেন শরিফ। আমি ওর কাছ থেকে একজোড়া পাজামা ধার নিলাম। মেয়েরা যে যার নাইটগাউন পেয়ে গেল। নিজেদের ঘরে তালা খুললাম। আগে ক্যাথি ঢুকল, পেছন পেছন আমি। ডাবল বেডের রুম চেয়েছিলাম। কিন্তু খাট দেখলাম একটা। অসন্তোষ প্রকাশ করলাম আমি, পা বাড়িয়েছি দরজার দিকে, আমার হাত চেপে ধরল ক্যাথি। 'বাদ দাও, রায়হান। প্লিজ, আমার খুব ভয় করছে। এমন ভয় জীবনেও পাইনি। রায়হান, আমি একা ঘুমাতে পারব না!'

বিছানায় শোয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। ক্যাথিকে স্পর্শ করিনি আমি, শুধু কোমরে একটা হাত রেখেছি। ও দুহাতে শক্ত করে জড়িয়ে থাকল আমাকে শিশুর মত। আমরা ঘুমালাম। স্রেফ ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম বাকি রাতটা। আমরা ক্লান্ত ছিলাম। গত রাত ৩-টা থেকে এক ফোঁটা ঘুমাবার সুযোগ পাইনি। তবে সবকিছুর জন্য সময় এবং জায়গা থাকে। এ-মুহূর্তে জায়গা থাকলেও প্রেম করার সময় এটা নয়।

ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি কিনা বলতে পারব না। কারণ কিছুই মনে নেই আমার। দুপুর পর্যন্ত সম্ভবত ঘুমিয়েছি। তবে সকাল সাড়ে ৮-টা পৌনে ৯-টার দিকে আমি ফিরে শুয়েছি, ক্যাথির গায়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। চোখ মেলে চাইলাম। ঘুমাচ্ছে এখনও। ঘুমের মধ্যেই সরে এল আমার দিকে। জড়িয়ে ধরল।

ক্যাথির উষ্ণ নিশ্বাস আমার গালে, আমাকে গরম করে তুলল। ওকে জড়িয়ে ধরলাম দুহাতে। অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে থাকলাম। ওর শরীরের পরশ নিলাম। তারপর আমাদের মধ্যে ওটা ঘটল যা ঘটেছিল অনেক দিন আগে। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম আবার।

ঘুম ভাঙার পরে সেরে নিলাম গোসল। জামাকাপড় পরলাম। ক্যাথির দিকে তাকিয়ে মুচকি একটা হাসি উপহার দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। শরিফ ভাই ছোট পার্কিং লটে পায়চারি করছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'তো? এখন কী? এরপর কোথায় যাবেন?'

শরিফ ভাই তাকালেন আমার দিকে। ওঁকে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত লাগছে। শ্রাগ করার ভঙ্গিতে একটা কাঁধ উঁচু হলো, 'বাড়ি।' আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম স্থির দৃষ্টিতে।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি,' অস্বস্তি নিয়ে বললেন তিনি। 'বাড়ি ছাড়া আর কোথায় যাব? নামটাম বদলে, মুখে দাড়ি গজিয়ে কোথাও গিয়ে নতুন জীবন শুরু করার কথা ভাবছ নাকি?' হাসলেন।

আমিও হাসলাম। ভোরের তাজা বাতাসে আমার মস্তিষ্ক আবার কাজ শুরু করে দিয়েছে। ভয়টা আছে এখনও, তবে আতঙ্কিত না হয়েই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করতে পারছি। আমরা ভয়ে পালিয়ে এসেছি। এতে একদিক থেকে ভালই হয়েছে। অন্তত আমার জন্য। কিন্তু বাড়ি থেকে ক'দিন পালিয়ে থাকব? অপরিচিত, অচেনা কোনও জায়গায় আমাদের পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। আমরা ফিরে যাব আমাদের পরিচিত জায়গায়, যা-ই ঘটুক তার বিরুদ্ধে লড়াই করব। অন্তত যতটুকু সাধ্যে কুলোয়।

একটু পরে ফিওনা এল। যোগ দিল আমাদের সঙ্গে। শরিফ ভাই বললেন, 'ঠিক করেছি বাড়ি ফিরে যাব।'

ধীরে মাথা ঝাঁকাল ফিওনা। 'ঠিক আছে,' বলল সে স্বামীকে। 'ফিরে যেতে চাইলে যাবে। কেন ফিরে যেতে চাইছ তা আমি শুনতে চাই না। তবে তুমি যেখানে যাবে, আমি তোমার সঙ্গে যাব।' আমার দিকে ফিরে মুখে কষ্টার্জিত হাসি ফোটাল সে। 'মর্নিং, রায়হান।'

নাইট গাউন পরা ক্যাথি এল আমার পাজামা বগলে নিয়ে। ওকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। 'রায়হান–' আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। 'আমার বাড়ি ফেরা দরকার। আমার বাবা–' আমাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে থেমে গেল।

'আমরা সবাই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি,' নরম গলায় বললাম আমি, ওর কনুই ধরে এগোলাম গাড়ির দিকে। শরিফ ও ফিওনা আমাদের সঙ্গে

এলেন। 'আগে নাস্তা খেয়ে নিই।'

১১-টা নাগাদ আমরা মিলভ্যালির রাস্তায় চলে এলাম। গাড়ি সেকেণ্ড গিয়ারে চালাচ্ছেন শরিফ, সমানে গালিগালাজ করে চলেছেন। কারণ রাস্তাঘাটের অবস্থা করুণ। রাস্তার যেখানে-সেখানে গর্ত, বড় বড় পাথর পড়ে আছে। একটার সঙ্গে ধাক্কা খেলে আর দেখতে হবে না। রাস্তার এ করুণ দশার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের উদ্দেশে অশ্রাব্য খিস্তির তুফান ছুটিয়ে দিলাম আমি আর শরিফ ভাই।

বারো

আমি জানি না শহরে কতজন লোক এখনও বাস করছে। শহরটা মরে যাচ্ছে দেখতে কষ্ট লাগছে। এ যেন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যুর চেয়েও করুণ। কারণ একজন বন্ধু মারা গেলে আরেকজনের কাছে যাওয়া যায়। কিন্তু একটা শহরের মৃত্যু হলে তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না।

মিলভ্যালির ভয়ংকর পরিবর্তন আমাকে আমার এক চাচার কথা মনে করিয়ে দিল। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের পক্ষে জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। গল্প করতেন ইটালির লড়াই নিয়ে। তাঁরা জার্মান মুক্ত শহরে প্রবেশ করেছিলেন। শহুরে বাসিন্দাদের তাঁদের কাছে বন্ধুসুলভ মনে হয়েছিল। তবু তাঁরা বাগিয়ে রাখেন রাইফেল, ডানে-বামে উপরে-নীচে তাকান, অত্যন্ত সতর্কভাবে পা ফেলেন। উঁকি মেরে দেখেন প্রতিটি জানালা, দরজা, গলিপথ এবং মানুষ। যেন কোনোকিছুতে তাঁরা ভয় পাচ্ছেন। আর নিজের শহরে, পরিচিত রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সেই একইরকম অনুভূতি হচ্ছে আমার। আমি উপলব্ধি করতে পারি যুদ্ধের সময় ইটালিয়ান গ্রামে প্রবেশের সময় কীরকম অনুভূতি হয়েছিল আমার চাচার। এখানে কখন কী দেখতে হবে সেই ভয়ে সিঁটিয়ে আছি।

শরিফ ভাই বললেন, 'কিছুক্ষণের জন্য আমার বাসায় ফেরা

দরকার, রায়হান। ফিওনা আর আমার কিছু জামাকাপড় নেব।'

ওদের সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করল না। চিন্তাভাবনা আর অনুভূতিগুলো আমাকে অসুস্থ করে ফেলেছে। বললাম, 'ঠিক আছে, শরিফ ভাই। আমাদেরকে তা হলে কোথাও নামিয়ে দিন। আমরা একটু হাঁটব। আপনার বাড়িতে দেখা হবে।'

সিকামোর এভিন্যুতে আমাদেরকে নামিয়ে দিলেন শরিফ ভাই। এখান থেকে আমার বাড়ি দশ মিনিটের হাঁটাপথ দূরে। সিকামোর আবাসিক এলাকার রাস্তা। মিলভ্যালির অন্যান্য রাস্তার মতই। শরিফের গাড়ির শব্দ মিলিয়ে গেল। আমি আর ক্যাথি থ্রকমর্টন রাস্তা দিয়ে হাঁটা দিলাম। আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। রাস্তায় আমাদের জুতোর শব্দ ছাড়া অন্য কোনও আওয়াজও নেই। চারদিক সুনসান।

আধডজন ব্লক পেরিয়ে এলাম আমরা। তাকালাম চারপাশে। মিলভ্যালির রাস্তায় প্রতিদিন যাতায়াত করি আমি। সপ্তাখানেক আগেও এদিকটাতে এসেছি। তবে তখন কারণ ছিল না বলে আশপাশে ভাল করে লক্ষ করার প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু এখন কারণ আছে। আমি চারপাশে চোখ বুলালাম। দেখছি রাস্তাঘাট এবং বাড়িঘর, লক্ষ করার চেষ্টা করছি কোথায় কী বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

আমি ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না বৈসাদৃশ্যটা কোথায়। যদিও মন বলছিল কোথাও একটা মস্ত ভজকট আছে। আমার মত ক্যাথিরও তেমনই মনে হচ্ছিল।

'রায়হান,' সতর্ক, নিচু গলায় বলল ও, 'আমি কি কল্পনা করছি নাকি রাস্তাটাকে সত্যি মৃত মনে হচ্ছে?'

মাথা নাড়লাম আমি। 'না'। আমরা যে সাতটা ব্লক পার হয়ে এলাম এর মধ্যে একটা বাড়িও চোখে পড়েনি যেটা নতুন রঙ করা হয়েছে কিংবা একটি বাড়িরও বারান্দা, ছাদ কিংবা ভাঙা জানালা মেরামত করা হয়নি। কোনও বাড়ির বাগানে একটি ছাদও লাগনো হয়নি, লনের ঘাস কাটা কিংবা আগাছাও পরিষ্কার করা হয়নি। 'এখানে কর্মচাঞ্চল্য বলে কিছু নেই, ক্যাথি। কেউ কোনও কাজ করছে না। এবং সেটা বেশ অনেকদিন ধরেই।'

আমরা ব্রিথড়েলে আরও তিনটি ব্লক পার হলাম। একই দৃশ্য। থ্রকমর্টন রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। কোথাও কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ল না। যেন একটা অসমাপ্ত মঞ্চ দেখছি যেখানে শেষ পেরেক গাঁথা এবং ব্রাশের চূড়ান্ত পোঁচ লাগানো বাকি।

থ্রকমর্টনে এবার মাঝে মাঝে লোকজনের সাড়া পাওয়া যেতে লাগল। দু'একজন হেঁটে যাচ্ছে ফুটপাত ধরে। পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করা। তবু আশ্চর্য খালি এবং নিষ্প্রভ লাগছে রাস্তা। মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ কিংবা মানুষের কণ্ঠের আওয়াজ ছাড়া রাস্তাটা অদ্ভুত নীরব। যেন গভীর রাত, ঘুমিয়ে পড়েছে শহর।

রোগীর জরুরি ফোন পেয়ে থ্রকমর্টন রাস্তা ধরে কত গাড়ি চালিয়ে গেছি। কিন্তু কখনও রাস্তার আশপাশ ভালো করে লক্ষ করিনি। কিন্তু এখন করছি। মনে পড়ল আমার অফিসের কাছে খালি এ দোকানটাকে আগেও দেখেছি। হাঁটতে হাঁটতে আরও তিনটা খালি স্টোর পার হয়ে এলাম। দোকানগুলোর ভিতরটা নোংরা, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে জিনিসপত্র। মনে হলো বেশ কিছুদিন ধরে এরকম অপরিষ্কার হয়ে আছে।

আমরা মিল টাউন ট্যাভার্ন পার হলাম। বারটির জানালায় ভনভন করছে মাছি, কার্ডবোর্ডের সাইনবোর্ডের দৈন্যদশা। বারের ভিতরে মাত্র একজন খদ্দের। নিষ্কম্প বসে আছে। দরজা খোলা। আমরা একবার ভিতরে উঁকি দিলাম—সুনসান বার।

ডেভস লাঞ্চ বন্ধ—সম্ভবত চিরদিনের জন্য। কারণ কাউণ্টারের টুলের নাটবল্টু খুলে ফেলা হয়েছে, মেঝেতে পড়ে আছে চিৎ হয়ে। একটা জুতোর দোকানের জানালায় এখনও ৪ জুলাইর বিজ্ঞাপনী ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। ওটার পাশে বাচ্চাদের কয়েক জোড়া জুতো। চামড়ায় ধুলোর পুরো স্তর। সেকুইয়া প্রেক্ষাগৃহের সামনে চলে এলাম। ডিসপ্লে কেসে একটা প্ল্যাকার্ড টাঙানো। তাতে লেখা: শুধু শনি ও রবিবার সন্ধ্যায় খোলা।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ করলাম আবর্জনায় ভর্তি চারপাশ।

রাস্তার ধারের আবর্জনার ঝুড়ি উপচে পড়ছে ময়লা। দোকানের প্রবেশপথে ছেঁড়া কাগজপত্র, ধুলোর ছোট ছোট ঘূর্ণি সৃষ্টি করেছে বাতাস। ছোট টাউন স্কোয়ারে আগাছা অনেক বড় হয়ে গেছে। ছেঁটে দেওয়ার কেউ নেই। ক্যাথি বিড়বিড় করল: পপর্কন ওয়াগনটা নেই। বাস স্টেশনের ধারে দিনের বেলা লাল চাকার কাচ লাগানো পপর্কন ওয়াগন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত মধ্যবয়স্ক এডি। আজ এডি বা ওয়াগন কিছুই নেই।

ডেভের রেস্টুরেন্ট সামনে। শেষবার এখানে রাতে খাওয়ার সময় খদ্দেরের সংখ্যা কম লক্ষ করে অবাক হয়েছিলাম। আজও অবাক হলাম। উঁকি দিয়ে দেখি মাত্র দু'জন লোক লাঞ্চ করছে। অথচ এ সময়টা লোকে গমগম করার কথা। বরাবরের মত আজকেও প্রতিদিনকার খাবারের মেনুর ফটোকপি সেঁটে রাখা হয়েছে জানালায়। আজ মাত্র তিনটি মেনু। যদিও সবসময় ছয় থেকে আট রকমের মেনু দেখে এসেছি।

'রায়হান, এসব কখন ঘটল?' ক্যাথি আমাদের সামনের পেছনের প্রায় নির্জন রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল।

'একেকবারে একটু একটু করে।' কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'এখন বুঝতে পারছি সত্যি মারা যাচ্ছে শহরটা।'

আমরা রেস্টুরেন্টের জানালার সামনে থেকে সরে এলাম। এড বার্লির ট্রাক চলে গেল সগর্জনে। আমাদের দেখে হাত নাড়ল সে, আমরাও। তারপর আবার অদ্ভুত নীবরতা নেমে এল। ফুটপাতে শুধু আমাদের জুতোর খটখট আওয়াজ।

লাভলকের ফার্মেসির সামনে এসে ক্যাথি বলল, কণ্ঠ সাদামাটা রাখার চেষ্টা করল, 'চলো, কোক বা কফি খেয়ে আসি।' সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালাম। আমি জানি কোক বা কফি নয়, ও আসলে কিছুক্ষণের জন্যে রাস্তাটা থেকে দূরে থাকতে চায়। আমিও চাই।

কাউন্টারে একটা লোককে বসে থাকতে দেখে অবাক হলাম আমি। তবে বিস্মিত হয়েছি বলে নিজেরই অবাক লাগল। থ্রকমর্টনে আসার পরে ভেবেছিলাম প্রতিটি জায়গাই দেখব জনশূন্য। কাউন্টারে বসা

লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদেরকে দেখল। চিনতে পারলাম তাকে। সানফ্রান্সিসকো হোলসেল হাউজের এক সেলসম্যান। একবার তার মচকে যাওয়া গোড়ালির চিকিৎসা করেছিলাম। আমি তার পাশের টুলে বসে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যবসা-বাণিজ্য কেমন চলছে?'

বুড়ো মি. লাভলক কাউন্টার থেকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। আমি দু'আঙুল তুলে বললাম, 'দুটো কোক।'

'একদম বাজে,' জবাব দিল সেলসম্যান। 'অন্তত এ শহরে।' তারপর অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল যেন মনস্থির করতে পারছে না আর কিছু বলবে কি না। কাউন্টারে বোতলের ছিপি খোলার শব্দ হলো, ভরে দেওয়া হলো কোকের গ্লাস। আমার পাশে বসা লোকটা ঝুঁকে এল, গলা নামিয়ে জানতে চাইল, 'এখানে হচ্ছেটা কী?'

মি. লাভলক আমাদের কোকের গ্লাস নিয়ে এলেন। সাবধানে এবং ধীরগতিতে নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন, পিটপিট করলেন চোখ। উনি চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর দোকানের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম সেলসম্যানকে। 'মানে?' কোকের গ্লাসে চুমুক দিলাম। বাজে। গরম।

'কারও কাছ থেকে কোনও অর্ডার পাচ্ছি না।' কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। তারপর হাসল সে। 'আপনারা কী জিনিস কিনবেন না বলে ধর্মঘট করছেন?' পরমুহূর্তে তার মুখ থেকে মুছে গেল হাসি। 'লোকে কেনাকাটা একদম বাদ দিয়েছে।' গম্ভীর মুখে বিড়বিড় করল সে।

'এ মুহূর্তে সবাই বোধহয় একটু টানাটানির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে,' বললাম আমি।

'হয়তো বা,' নিজের কাপটা তুলে নিল সে, পান করল কফির তলানিটুকু। 'বুঝতে পারছি এ শহরে আর এসে লাভ নেই। অন্যান্য সেলসম্যানরাও কেউ কোনও অর্ডার পাচ্ছে না। তারা এখানে আসা বাদ দিয়েছে আগেই। এখান থেকে আর মাল কামানো যাবে না। অনেক জায়গায় তো কোক বিক্রিও বন্ধ—' কফির কাপের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল—'এ দোকানে এর আগে দু'বার কফি খেতে এসেও পাইনি। দু'বার কফি ছিল না দোকানে। কোনও কারণ নেই।' মুখভঙ্গি করে

কাউন্টার থেকে পিছলে নামল সে। চেহারায় রাগ। 'ঘটছে কী?' ক্রুদ্ধ গলা তার। 'শহরটা কি মরতে বসেছে?' পকেট থেকে একটা কয়েন বের করল, কাউন্টারে রাখার জন্য ঝুঁকল সামনে। 'ওদের ভাবখানা এমন সেলসম্যান না হলেও তাদের চলবে।' আমার দিকে একমুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারপর পেশাদারি হাসি ফোটাল মুখে। 'দেখা হবে, ডক্।' ক্যাথিকে বিনীত ভঙ্গিতে নড্ করল, ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা দিল দরজার দিকে।

'রায়হান,' বলল ক্যাথি। ঘুরলাম ওর দিকে। 'শোন, রায়হান,'–ফিসফিস করল ও, কণ্ঠে উদ্বেগ,–'তোমার কি মনে হয় কোনও শহরকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সম্ভব? বাইরে থেকে যারা আসছে তাদেরকে আসতে নিরুৎসাহিত করা, এভাবে একটা শহরকে সবার স্মৃতি থেকে মুছে দেওয়া যায়?'

আমি একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিলাম, 'না।'

'কিন্তু রাস্তাঘাট, রায়হান! গাড়ি ঘোড়া যাতে চলতে না পারে সেজন্য রাস্তায় বড়বড় গর্ত খোঁড়া হয়েছে। এর কারণ কী? সেলসম্যানটার কথাই ধরো, তারপর শহরটার যে চেহারা দেখছি–'

'এটা সম্ভব নয়, ক্যাথি; এটা করতে হলে শহরের প্রতিটি মানুষকে নিয়ে করতে হবে। আমাদেরকে সহ।'

'ওরা আমাদেরকেও এর মধ্যে জড়াতে চাইছে।' বলল ক্যাথি।

আমি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম ওর দিকে। ও ঠিকই বলেছে। 'চলো,' বললাম আমি, কাউন্টারে পঞ্চাশ সেন্ট রেখে সিধে হলাম। 'যা দেখা দরকার দেখেছি।'

রাস্তার পরের মোড়ে আমার অফিস। আমি অফিসের দোতলার জানালায় তাকালাম। ওখানে সোনার পাতায় লেখা আমার নাম। আমরা হাঁটতে লাগলাম। শপিং এরিয়া থেকে বেরিয়ে এসে ক্যাথি বলল, 'আমার একবার বাড়ি যাওয়া দরকার। বাবাকে দেখে আসব। যেতে ইচ্ছে করছে না। তবু যেতে হবে।'

আমি আর কী বলব শুধু মাথা ঝাঁকালাম। এক ব্লক সামনে পাবলিক লাইব্রেরি। বললাম, 'লাইব্রেরিতে একটু কাজ আছে আমার।'

ডেস্কে মিস ওয়েগ্যাণ্ডকে বসে থাকতে দেখলাম। তাঁর দিকে তাকিয়ে আন্তরিক একটা হাসি উপহার দিলাম। আমি যখন গ্রেড স্কুলের ছাত্র মিস ওয়েগ্যাণ্ড তারও আগে থেকে লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। আমি ভদ্রমহিরার কাছ থেকে জেন গ্রে এবং টম সুইফট সিরিজের বই নিয়ে পড়েছি। ধূসর চুলো, ছোটখাটো গড়নের, বুদ্ধিদীপ্ত চাউনির মিস ওয়েগ্যাণ্ড খুব আন্তরিক স্বভাবের মানুষ। লাইব্রেরির মূল রিডিংরুমে বসে তাঁর সঙ্গে নিচু গলায় গল্প করা যায়। ওখানে ম্যাগাজিন-টেবিলের পাশে আরামদায়ক কুশনের চেয়ার আছে। বিকেল কাটানোর চমৎকার জায়গা। এখানে লোকে আসে নিরিবিলিতে অনুচ্চ স্বরে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে। বাচ্চাদের খুব ভালবাসেন মিস ওয়েগ্যাণ্ড। তাঁর কাছে গেলে আপনাকে তিনি আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাবেন। নিজেকে বাইরের কেউ মনে হবে না।

মিস ওয়েগ্যাণ্ড আমার প্রিয় মানুষদের একজন। তাঁর ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। কুশল জিজ্ঞেস করলাম। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো তাঁর চেহারা। বুঝিয়ে দিলেন আমাদের দেখে খুশি হয়েছেন। 'হ্যালো, রায়হান,' বললেন তিনি। 'তোমাকে আবার লাইব্রেরিতে দেখে খুশি হলাম।' মুচকি হাসলাম আমি। 'তোমাকে দেখেও খুশি হয়েছি, ক্যাথি,' বললেন তিনি। 'তোমার বাবাকে আমার পক্ষ থেকে হ্যালো বোলো।'

আমি বললাম, 'দ্য মিলভ্যালি রেকর্ড ফাইলটা একবার দেখা যাবে, মিস ওয়েগ্যাণ্ড? গেল সামারের, জুলাইর প্রথম পার্ট।'

'অবশ্যই,' বললেন তিনি। নীচে গিয়ে ফাইলটা নিজেই নিয়ে আসতে চাইলাম। মিস ওয়েগ্যাণ্ড বললেন, 'না, বসো। আরাম কারো। আমি নিয়ে আসছি।'

ম্যাগাজিনের টেবিলের সামনে দুটো চেয়ার দখল করলাম আমরা। ক্যাথি একটা পত্রিকা দেখছে, আমি চারপাশে চোখ বোলাতে লাগলাম। টেবিলে পাঠক মাত্র একজন। এক বুড়ো। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। মিস ওয়েগ্যাণ্ড একটু দেরি করেই এলেন। বারোটা বিশ বাজে। কাপড়ে মোড়ানো খবরের কাগজের আকারের বইটির প্রচ্ছদে লেখা: মিলভ্যালি

রেকর্ড, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬। হাসিমুখে বইটা রাখলেন তিনি টেবিলে। আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। শরিফ ভাইয়ের ক্লিপিঙের ডেটলাইন ছিল ৯ জুলাই। আমি বড় বইটি খুললাম।

রেকর্ডের প্রথম পৃষ্ঠা দুজনে মিলে পড়তে লাগলাম। প্রতিটি লেখায় সতর্কতার সঙ্গে চোখ বোলাচ্ছি। তবে প্রফেসর এল বার্নার্ড বাডলং কিংবা দানব সিড পডের ওপর কোনও খবর দেখতে পেলাম না। পৃষ্ঠার উপরে, বামদিকে আয়তাকার একটি গর্ত, দুই কলাম চওড়া, পাঁচ-ছয় ইঞ্চি গভীর; ব্লেড দিয়ে খবরের অংশটা নিখুঁতভাবে কেটে নেওয়া হয়েছে। আমরা যা খুঁজছিলাম তা পেলাম না। জুলাই ৮ রেকর্ডের তিনটা পৃষ্ঠাও উধাও।

জুলাই ৭ ইস্যুতে চলে গেলাম। শুরু করলাম প্রথম পৃষ্ঠা থেকে। বাডলং কিংবা বীজ পড নিয়ে কিছু লেখা নেই। জুলাই ৬ রেকর্ডের প্রথম পৃষ্ঠার নীচের অর্ধেক অংশ নেই হয়ে গেছে। তিন কলাম জায়গা নিয়ে কাগজটা কাটা।

হঠাৎ কী মনে হতে ঝট করে মিস ওয়েগ্যাণ্ডের দিকে তাকালাম। তিনি বড় টেবিলের পেছনে স্থিরভঙ্গিতে বসে আছেন। তাকিয়ে রয়েছেন আমাদের দিকে। আমি মুখ তুলে চেয়েছি তাঁর দিকে, মুখটাকে মনে হলো কাঠের তৈরি, ভাবাবেগশূন্য, চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে, হাঙরের চোখের মত ঠাণ্ডা। একমুহূর্তেরও কম সময়ের মধ্যে, বলা যায় চোখের পলকে তাঁর চেহারায় পরিবর্তন ঘটল। কাঠের মূর্তি যেন ফিরে পেল প্রাণ, আন্তরিক হাসি ফুটল মুখে, ভুরু তুললেন তিনি প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে, শান্ত গলায়, যে কণ্ঠটিকে বহুদিন ধরে চিনি আমি, জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের আর কিছু লাগবে?'

'জি,' বললাম আমি। 'দয়া করে একবার এদিকে আসবেন, মিস ওয়েগ্যাণ্ড?'

উজ্জ্বল হাসিতে মুখ ভরিয়ে ডেস্ক ঘুরে তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। লাইব্রেরিতে এখন কেউ নেই। মিস ওয়েগ্যাণ্ডের ডেস্কের বড় ঘড়িতে ১২টা ২৬ বাজে। লাইব্রেরির অপর সহকারীটি চলে গেছে কিছুক্ষণ আগে।

মিস ওয়েগ্যাণ্ড আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর দিকে মুখ তুলে চাইলাম। তিনি হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমি খবরের কাগজের গর্তের দিকে ইঙ্গিত করে শান্ত গলায় বললাম, 'ফাইলটা এখানে নিয়ে আসার আগে সিড পডের ব্যাপারে যেসব রেফারেন্স ছিল সব কেটে রেখে দিয়েছেন, তাই না?'

ভুরু কোঁচকালেন তিনি—এহেন অভিযোগে বিস্মিত—নিচু, গোল টেবিলে রাখা কাটা কাগজটার ওপর ঝুঁকলেন চোখে সরল বিস্ময় নিয়ে।

সিধে হলাম আমি, তাঁর মুখের সামনে মুখ এনে বললাম, 'আর ভান করতে হবে না, মিস ওয়েগ্যাণ্ড কিংবা যে-ই হও তুমি।' তার চোখে সরাসরি চোখ রাখলাম। 'আমি চিনি তোমাকে,' নরম গলায় বললাম আমি। 'জানি তুমি কী।'

একমুহূর্ত তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, ক্যাথি এবং আমার দিকে হতভম্বের মত তাকালেন; তারপর হঠাৎ মুখোশটা খুলে গেল তাঁর। ধূসর চুলের মিস ওয়েগ্যাণ্ড, যিনি কুড়ি বছর আগে প্রথম আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন হাকলবেরি ফিনের একটি কপি, তাকালেন আমার দিকে, তাঁর চেহারা দেখাল পাথরের মত, শূন্য, ভয়ানক ঠাণ্ডা এবং প্রচণ্ড নিষ্ঠুর। তাঁকে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হলো। তারপর তিনি কথা বলে উঠলেন, নিষ্প্রাণ, ভাবাবেগশূন্য গলা। 'সত্যি চেনো?' বললেন তিনি। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন। চলে গেলেন।

ক্যাথিকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম লাইব্রেরি থেকে। ফুটপাতে কিছুক্ষণ হাঁটার পর নীরবতা ভঙ্গ করল ও, 'এমনকী উনিও! মাথা নেড়ে বিড়বিড় করল। 'এমনকী মিস ওয়েগ্যাণ্ডও!' চোখে জল এসে গেছে ওর। 'ওহ্ রায়হান।' নরম গলা ওর। তাকাল চারদিকে। দেখল বাড়িঘর, নির্জন বাগান, রাস্তা। 'আর কত?'

এ প্রশ্নের জবাব জানা নেই আমার, শুধু মাথা নাড়তে পারলাম। এগোলাম ক্যাথির বাড়ির দিকে।

তেরো

ক্যাথিদের বাড়ির সামনে একটা গাড়ি দাঁড়ানো। ১৯৭৩ বুইক সেঞ্চুরি সেডান, রোদে পুড়ে নীল রঙটা ম্লান। 'শীলা, এলিডা চাচি এবং ইরা চাচা,' আমার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল ক্যাথি। তারপর বলল 'রায়হান'—আমরা প্রায় বাড়ির সামনে চলে এসেছি, সাইড ওয়াকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও—'আমি ওখানে যেতে পারব না।'

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'আমাদের ভেতরে যাওয়ার দরকার নেই, কেট। তবে ওদের চেহারা দেখা দরকার।' ডানে-বামে মাথা নাড়ল ক্যাথি। আমি বললাম, 'কী ঘটছে জানাটা খুব জরুরি, ক্যাথি! না হলে আমাদের শহরে ফিরে আসার প্রয়োজনই হত না।' ওর হাত ধরলাম আমি। বাড়ির দেয়াল টপকালাম, ক্যাথিকে দেয়াল টপকাতে সাহায্য করলাম। দেয়ালের পাশে লন। নীরবে লন ধরে হাঁটছি। 'ওরা কোথায় থাকতে পারে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। ক্যাথির কাছ থেকে জবাব না পেয়ে ওকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলাম। 'কেট, ওরা কোথায় থাকতে পারে? লিভিংরুমে?'

পুতুলের মত মাথা দোলাল ক্যাথি। আমরা নিঃশব্দে বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে পুরোনো, প্রশস্ত বারান্দার সামনে চলে এলাম। লিভিংরুমের জানালার নীচে বারান্দা। খোলা জানালা দিয়ে শোনা যাচ্ছে মানুষজনের কণ্ঠ। লিভিংরুমের সাদা পর্দার পেছনে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। এক এক করে দু'পা থেকে খুলে নিলাম জুতা। তাকালাম ক্যাথির দিকে। ঢোক গিলল ও। তারপর এক হাতে আমাকে ধরে রেখে অন্যহাতে জুতো খুলল। বাড়ির পেছনে, লিভিংরুমের ঠিক নীচে, বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়লাম পা টিপে টিপে। খোলা জানালার পাশে, অত্যন্ত সাবধানে এবং ধীরে ধীরে বসে পড়লাম বারান্দায়। আমাদেরকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। বড় প্রাচীন বৃক্ষ আর লনের উঁচু ঝোপ রাস্তা থেকে

আড়াল করে রেখেছে আমাদেরকে।

' আরেকটু কফি নেবে?' একটা কণ্ঠ শুনতে পেলাম আমরা। ক্যাথির বাবা।

'না,' বলল শীলা। কাঠের টেবিলে কাপ এবং প্লেট রাখার ঠুন শব্দ হলো। 'একটার মধ্যে দোকানে ফিরতে হবে। তবে তুমি আর ইরা চাচা এখানে থাকতে পারো, এলিডা চাচি।'

'না,' জবাব দিলেন শীলার চাচি। 'আমরাও উঠব। ক্যাথির সঙ্গে দেখা হলো না বলে খারাপ লাগছে।'

খোলা জানালার চৌকাঠে মুখ তুললাম আমি। ওখানে বসে আছে ওরা; ক্যাথির ধূসরচুলো বাবা, সিগারেট ফুঁকছেন, গোল মুখ আর লাল গালের শীলা, লম্বা, বুড়ো ইরা চাচা, ছোটখাট মিষ্টি চেহারার বুড়ি চাচি; সবাইকে স্বাভাবিক লাগছে। যেভাবে দেখে আসছি বরাবর।

'আমারও খারাপ লাগছে,' বললেন ক্যাথির বাবা। 'ভাবলাম ও বাড়ি আসবে, ও শহরে এসেছে আপনারা তো জানেনই।'

'হ্যাঁ, জানি,' বললেন ইরা চাচা। 'রায়হানও।' ওরা কী করে খবরটা জেনে গেল ভেবে অবাক লাগল আমার। আমরা শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম তাই বা জানল কী করে?

ইরা চাচা ঠাট্টার সুরে এবার বললেন, 'কাজকর্ম কেমন চলছে, রায়হান? আজ ক'জনের পটল তোলালে?'

আমার ঘাড়ের চুল সরসর করে খাড়া হয়ে গেল। সপ্তাখানেক আগে ইরা চাচার সঙ্গে তাঁর বাড়ির সামনের লনে দেখা হওয়ার সময় এ কথাটাই জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি। তবে এখন যে-সুরে তিনি কথাটা বললেন, যেন একটা বাচ্চা নির্দয় সুরে আরেকজনকে ঠাট্টা করছে।

'ওহ, রায়হান,' গলায় বিষ ঢেলে বলল শীলা, আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল– 'তোমার কী হয়েছে দেখার জন্য চলে এসেছি–' হেসে উঠল সে। কৃত্রিম হাসি, ব্যঙ্গ করছে।

এলিডা চাচি আমার সঙ্গে শীলার কথোপকথন নকল করলেন, 'আমার খুব বিব্রত লাগছে, রায়হান। আমি জানি না কী হয়েছে–' তাঁর

বিকৃত কণ্ঠে বমি বমি ভাব হলো আমার। 'কীভাবে যে কথাটা বলি তোমাকে, তবে-আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।' ছোটখাট মহিলা কণ্ঠস্বর গম্ভীর করলেন। 'ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই, শীলা'-আমার গলার স্বর নকল করলেন তিনি নিখুঁতভাবে। 'আমি তোমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাই না, চাই না তোমার কোনোরকম খারাপ লাগুক; পুরো ব্যাপারটা স্রেফ ভুলে যাও।'

তারপর হাসতে লাগল সবাই-নিঃশব্দে-তাদের ঠোঁটের আড়াল থেকে দাঁত বেরিয়ে এল, মশকরার ভঙ্গিতে চোখ নাচছে, তাতে হিমশীতল চাউনি। আমি জানি এরা শীলা, ইরা চাচা, এলিডা চাচি কিংবা ক্যাথির বাবা নয়। জানি এরা মানুষ নয়। খুব অসুস্থ লাগল আমার। ক্যাথি বারান্দার মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে, দেয়ালে পিঠ, রক্তশূন্য মুখ, হাঁ করে আছে। অর্ধচেতন অবস্থায় রয়েছে ও।

আমি বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে জোরে চিমটি কাটলাম ক্যাথির বাহুতে। একই সঙ্গে অন্য হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে রাখলাম ওর মুখ যাতে 'ব্যথায় চিৎকার করতে না পারে। ওর গালে রঙের ছোপ দেখতে পেলাম, আঙুলের গাঁট দিয়ে জোরে আঘাত করলাম কপালে। রাগে জ্বলে উঠল ক্যাথির চোখ। ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে কথা না বলতে ইশারা করলাম। কনুই ধরে ওকে সিধে হতে সাহায্য করলাম। বারান্দা থেকে নিঃশব্দে নেমে এলাম জুতো হাতে নিয়ে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পায়ে গলালাম জুতো। তবে ফিতে বাঁধলাম না। হাঁটতে শুরু করলাম আমার বাড়ির দিকে। দুই ব্লক পেছনেই আমার বাড়ি। হাঁটার সময় ক্যাথি শুধু 'ওহ, রায়হান, ওহ রায়হান' বলে ফোঁপাতে লাগল। আমরা দ্রুত পা চালাচ্ছি, ক্রমে সরে আসছি অভিশপ্ত বাড়িটির কাছ থেকে।

বাড়ির বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠছি, দেখি বারান্দার দোলনার সামনে স্থানীয় পুলিশ চিফ নিক গ্রিভেট। পরনে নীল ইউনিফর্ম কোট। আমাদের দেখে হাসল সে, 'হাই রায়হান, ক্যাথি।'

'হ্যালো, নিক,' কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম আমি। 'কোনও সমস্যা?'

'না'—ডানে-বামে মাথা নাড়ল সে। 'কোনও সমস্যা নেই।' বারান্দায় দাঁড়িয়ে সরল ভঙ্গিতে হাসছে মধ্যবয়স্ক লোকটা। 'তোমরা তবু একবার আমার সঙ্গে থানায় যেতে পারবে, রায়হান?'

'অবশ্যই,' মাথা ঝাঁকালাম আমি। 'কী ব্যাপার, নিক?'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তেমন কোনও ব্যাপার নয়। কয়েকটা প্রশ্ন করব।'

'কী নিয়ে প্রশ্ন?'

আবার শ্রাগ করল সে, 'তুমি আর শরিফ সাহেব যে লাশটা দেখেছ সে ব্যাপারে আর কী!'

'ঠিক আছে,' আমি ঘুরলাম ক্যাথির দিকে। 'যাবে আমার সঙ্গে?' যেন এটা কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। 'বোধহয় বেশি সময় লাগবে না, নিক, তাই না?'

'না,' জবাব দিল নিক। 'দশ-পনেরো মিনিট লাগবে হয়তো।'

'ঠিক আছে। আমার গাড়িটা নেব?'

'বরং আমারটা ব্যবহার করো, রায়হান। কাজ শেষ হয়ে গেলে তোমাদেরকে বাড়ি পৌঁছে দেব।' বাড়ির কিনারে ইঙ্গিত করল। 'আমার গাড়িটা তোমার গ্যারেজে রেখেছি। তোমার গাড়ির পাশে। গ্যারেজের দরজা খোলা রেখে গিয়েছিলে, রায়হান।'

আমি সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালাম যেন স্বাভাবিক কাজটাই করেছে নিক। কিন্তু কাজটা স্বাভাবিক নয়। সে তার গাড়ি রাস্তার পাশে রাখেনি কারণ তার গাড়ি দেখতে পেয়ে আমরা যদি পালিয়ে যেতাম! বারান্দায় রেলিঙের একপাশে সরে দাঁড়ালাম নিককে পথ করে দিতে। হাই তোলার ভঙ্গিতে মুখের সামনে নিয়ে এলাম হাত। নিক পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে। মোটাসোটা মানুষটা আমার কাঁধ সমানও উঁচু নয়। ও সিঁড়ি বেয়ে নামছে, গায়ের সব শক্তি দিয়ে চোয়ালে বসিয়ে দিলাম ভয়ংকর এক ঘুসি। তবে মারামারিতে এক্সপার্ট এবং ট্রেনিংপ্রাপ্ত না হলে নিকের মত গাট্টাগোট্টা মানুষকে এক ঘুসিতে কাবু করা সম্ভব নয়। এবং কাবু হলোও না।

ঘুসি খেয়ে টলে উঠল নিক, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। আমি এক হাত

দিয়ে ওর ঘাড় জড়িয়ে ধরলাম, উঠে পড়লাম পিঠে। গলায় প্রচণ্ড জোরে চাপ দিতে লাগলাম। ওর মুখটা দেখতে পাচ্ছি আমি। রাগ বা ক্রোধ নেই, চোখের দৃষ্টি ঠাণ্ডা, কঠিন, ব্যারাকুডার মত আবেগশূন্য। ওর কোমর থেকে পিস্তলটা খুলে নিলাম, পিঠে ঠেকিয়ে ছেড়ে দিলাম ওকে। ও জানে বন্দুকটা ব্যবহার করব আমি। তাই দাঁড়িয়ে থাকল স্থির হয়ে। ওকে পিছমোড়া করে হ্যাণ্ডকাফ পরালাম। আমার বাড়িতে নিয়ে এলাম।

ক্যাথি আমার হাতে হাত রাখল। 'রায়হান, ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে। ওরা আমাদেরকে ধরে ফেলবে। রায়হান, আমাদের পালাতে হবে।'

ওর হাত ধরলাম আমি। চোখে চোখ রাখলাম। 'হ্যাঁ—আমিও এখান থেকে চলে যেতে চাই, ক্যাথি। এ শহর থেকে হাজার মাইল দূরে কোথাও। আমিও পালাতে চাই। তবে পালাবার সময় লড়াইও করতে চাই—এখানে। আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। আমি ওদের চোখের আড়ালে থাকব। তবে আমাকে এখানে থাকতে হবে। তোমাকে নিরাপদ কোনও জায়গায় রেখে আসব।'

আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ক্যাথি। ঠোঁট কামড়াচ্ছে। মাথা নাড়ল। 'আমি তোমাকে ছাড়া নিরাপদে থাকতে চাই না। এতে লাভ কী?' আমি কথা বলতে যাচ্ছি, বাধা দিল ও। 'তর্ক কোরো না, রায়হান। এখন তর্ক করার সময় নেই।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে।' নিক গ্রিভেটকে ধাক্কা মেরে বসিয়ে দিলাম একটা চেয়ারে। ফোন করলাম জন কোয়েলসের নম্বরে। এখন ওর সাহায্য সবচেয়ে দরকার।

অপরপ্রান্তে বাজল ফোন। তিনবার রিং হওয়ার পর শুনতে পেলাম জনের কণ্ঠ, 'হ্যালো—' তারপর কেটে গেল লাইন। একটু পর টেলিফোন কোম্পানির কণ্ঠে অপারেটর বলল, 'আপনি কত নাম্বার চাইছেন, প্লিজ?' আমি নম্বরটা বললাম তাকে। আবার রিং শুরু হলো, বেজেই চলল, এবার কেউ ফোন ধরছে না। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি অপারেটর কোনও রিং সার্কিটে আমার নম্বরটা ঢুকিয়ে দিয়েছে

তাই শুধুই রিং হচ্ছে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এখন ওদের হাতে।

লাইন কেটে দিলাম আমি। ফোন করলাম শরিফ ভাইয়ের নম্বরে। সাড়া দিলেন তিনি। আমি বুঝতে পারলাম ওরা এ নম্বরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবে না। কারণ আমরা কী কথা বলি তা ওদের জানা দরকার। আমিই আগে কথা বললাম, 'শরিফ ভাই, ঝামেলা হয়েছে। ওরা আমাদেরকে ধরার চেষ্টা করছে। তোমাদেরকেও। জলদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ো। আমি ফোন রেখেই বাসা থেকে বেরুচ্ছি।'

'ঠিক আছে, রায়হান। কোথায় যাবে?'

কী জবাব দেব ভাবছি। আমি চাই যারা আমাদের কথা শুনছে তারা ভাবুক আমরা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তবে শরিফ ভাইকে কথাটা এমনভাবে বলতে হবে যাতে উনি বুঝতে পারেন আসলে আমরা কোথাও যাচ্ছি না। উনি লেখক মানুষ। কোনও সাহিত্যিকের নাম মনে করার চেষ্টা করলাম। মার্গারেট মিচেলের নাম মনে পড়ল।

'এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে ছোট একটা হোটেল আছে। মিসেস মিচেল নামে এক মহিলা হোটেলটা চালায়। চেনেন?'

'চিনি, রায়হান,' চেহারা না-দেখেই বলতে পারি হাসছেন শরিফ ভাই। 'আমি চিনি মিসেস মিচেলকে। খুব ভাল মহিলা।'

'কেট আর আমি এক্ষুনি শহর ছাড়ছি। আমরা মিসেস মিচেলের হোটেলে উঠব। আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন তো, শরিফ ভাই? কী করব জানেন তো?'

'একদম পানির মত পরিষ্কার বুঝতে পারছি,' বললেন তিনি।

আমি জানি শরিফ ভাই বুঝতে পেরেছেন আমরা বাড়ি ছাড়ছি বটে তবে শহর ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না। 'আমরাও ওখানে যাব,' বললেন শরিফ ভাই। 'তা হলে একসঙ্গেই যাই না কেন? কোথায় মিলিত হব বলো, রায়হান।'

'খবরের কাগজের ক্লিপিঙের সেই ভদ্রলোকের কথা মনে আছে? শিক্ষক?' আমি জানি শরিফ বুঝতে পারবেন আমি বাডলং-এর কথা বলছি। 'ওখানে যাচ্ছি আমরা। তবে পায়ে হেঁটে। আপনার গাড়িটা নিয়ে আসুন। এখন থেকে ঠিক এক ঘণ্টা পরে।'

'বেশ,' বলে ফোন রেখে দিলেন শরিফ ভাই। আশা করলাম টেলিফোন এক্সচেঞ্জে যে-ই থাকুক তাকে আমরা বোকা বানাতে পেরেছি।

নিক গ্রিভেটকে টেনেহিঁচড়ে গ্যারেজে নিয়ে এলাম। গ্যারেজের মেঝেতে বসিয়ে দিলাম ওকে। তারপর মাথার একপাশে পিস্তলের বাঁট দিয়ে জোরে বাড়ি দিলাম। চিৎ হয়ে পড়ে রইল ও। আমি নিকের ঘাড়ের চামড়ায় আঙুল দিয়ে জোরে মোচড় দিলাম। ব্যথায় ককিয়ে উঠল। আবার আঘাত করলাম ওকে। এবার আগের চেয়ে জোরে। ও স্থির হয়ে পড়ে থাকল মেঝেতে। আমি আগের চেয়ে জোরে চিমটি কাটলাম ঘাড়ে। নড়াচড়া করল না নিক। অজ্ঞান হয়ে গেছে।

আমার গাড়িটা বের করলাম গ্যারেজে। তারপর গাড়ি থেকে নেমে বন্ধ করে দিলাম গ্যারেজ। চললাম উত্তরে, ইস্ট ব্লিথডেন এভিনিউ ধরে। ওদিকে এল বার্নার্ড বাডলং-এর বাড়ি। আমাদের না-জানা প্রশ্নের জবাব হয়তো তিনি দিতে পারবেন। সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। সময় এখন আমাদের বিরুদ্ধে। যে কোনও সময় পুলিশের গাড়ি চলে আসতে পারে রাস্তায় কিংবা অন্য কোনও গাড়ি এসে জোর করে আমাদেরকে তুলে দিতে পারে ফুটপাতে। নিক গ্রিভেটের পিস্তলটা সিটের ওপর শুয়ে আছে। আমি পালাতে চাইছি, লুকোতে চাইছি। আমি জানি না কী করব। তবে যে মার্সিডিসে আমরা চলেছি সেটা বড্ড মার্কামারা। সবাই জানে এটা ড. রায়হানের গাড়ি। জানি না এ-মুহূর্তে কোনও বাড়িতে কেউ ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছে কি না ড. রায়হান মর্তুজা তার গাড়ি নিয়ে পালাচ্ছে।

চোদ্দ

ক্যালিফোর্নিয়ার মেরিন কাউন্টির বিশাল একটা অঞ্চল জুড়ে পাহাড়-পর্বত। আর মিলভ্যালি কতগুলো পাহাড়ের সারির ওপর গড়ে উঠেছে।

শহরের রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এবং ওপর দিয়ে। প্রতিটি রাস্তা ও পাহাড় আমার চেনা। আমি এরকম একটা রাস্তা ধরে চলেছি বাডলংয়ের বাড়িতে। বাডলংয়ের বাড়ি খাড়া এক পাহাড়চুড়োয়, চারপাশে ঝোপঝাড়, আগাছা আর ইউক্যালিপটাসের সারি। আমরা বাডলংয়ের বাড়ির সামনে এসে কতগুলো ক্ষুদ্রাকৃতির গাছের আড়ালে পার্ক করলাম গাড়ি। রাস্তা থেকে আমাদের গাড়িটি দেখা যাচ্ছে না। শুধু দুটো বাড়ি থেকে সরাসরি গাড়িটিকে দেখা যাবে। তবে ও-বাড়িতে কেউ থাকে বলে মনে হয় না। গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম দু'জনে, ইগনিশন কি ভিতরেই থাকল, মোটর চলছে। মোটর চালু দেখলে কেউ ভাববে আমরা ফিরে আসব গাড়িতে। নিকের পিস্তলটা আর নিলাম না, ছুঁড়ে ফেলে দিলাম ঝোপে।

পাহাড় বাইতে লাগলাম। এ রাস্তায় ছোটবেলায় অনেক ছোটাছুটি করেছি। বাডলং-এর বাড়িটি আমরা যে-পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আছি তার ঠিক পাদদেশে। রাস্তা থেকে দশ-বারো হাত দূরে একটা জায়গা দেখতে পেলাম। ওখান থেকে ঝোপ এবং গাছের আড়ালে পরিষ্কার দেখা যায় বাডলং-এর বাড়ি। এবং বাড়ির উঠোন। বাদামি রঙের দোতলা বাড়ি। পেছন দিকে উঠোন, একপাশে বেড়া। আরেক পাশে লম্বা ঝাড়। আশপাশে প্রাণের চিহ্ন নেই। আমরা নিঃশব্দে নেমে এলাম পাহাড় থেকে, পেছনের বেড়ার উঁচু গেট খুললাম, উঠোন পেরিয়ে চলে এলাম বাড়ির কিনারে। কেউ দেখল না আমাদেরকে।

বাড়ির দরজায় কড়া নাড়লাম। অপেক্ষা করতে করতে মনে হলো বাডলং বাড়িতে নাও থাকতে পারেন। তবে কিছুক্ষণ পরে বছর চল্লিশের এক লোক হাজির হলেন দরজার সামনে। কাচের আড়াল দিয়ে দেখলেন আমাদেরকে। ছিটকিনি খুলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কারণ আমরা সাইডডোরে নক্ করেছি। আমি বিনীত ভঙ্গিতে হাসলাম। 'আমরা বোধহয় ভুল দরজা ব্যবহার করেছি, প্রফেসর বাডলং?'

'হ্যাঁ,' হাসলেন তিনি। তাঁর চোখে স্টিল রিমের চশমা, মাথায় ঈষৎ ঢেউ-খেলানো বাদামি চুল, বুদ্ধিদীপ্ত, কৌতূহলী চেহারা, শিক্ষকরা

যেরকম হয়ে থাকেন।

'আমি ড. রায়হান মর্তুজা। আর–'

'ওহ্, আচ্ছা,' হাসিটা মুখে ধরে রেখে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'আমি শহরে দেখেছি আপনাকে, আর–'

'আমিও আপনাকে দেখেছি,' বললাম আমি। 'কলেজে পড়াতেন। এ ক্যাথি রেনল্ডস। আমার বান্ধবী।'

'কেমন আছেন?' দরজা পুরোপুরি মেলে ধরলেন তিনি, সরে দাঁড়ালেন একপাশে। 'ভিতরে আসুন।'

ভিতরে ঢুকলাম আমরা। হলঘর পেরিয়ে স্টাডিরুমের মত দেখতে একটা ঘরে নিয়ে এলেন তিনি আমাদের। ঘরে পুরোনো আমলের একটা রোল-টপ ডেস্ক, দেয়ালের শেলফে কিছু বই, আরেক দেয়ালে বাঁধানো সার্টিফিকেট এবং ছবি। দেয়াল ঘেঁষা জীর্ণ, প্রাচীন কাউচ। ঘরটি ছোট, একটি মাত্র জানালা, আবছা অন্ধকার ভিতরে। তবে ডেস্ক ল্যাম্প জ্বলছে। এ ঘরে ভদ্রলোক নিশ্চয় অনেকক্ষণ সময় কাটান, ভাবলাম আমি। ক্যাথি এবং আমি কাউচে বসলাম। বাডলং দখল করলেন স্যুইভেল ডেস্ক চেয়ারটি। চেয়ার ঘুরিয়ে আমাদের মুখোমুখি হলেন তিনি। বন্ধুত্বসুলভ হাসি ফোটালেন মুখে। 'আপনাদের জন্য কী করতে পারি?'

বললাম তাঁকে। পুরো ব্যাপারটি জটিল এবং দীর্ঘ বলে সংক্ষেপে বললাম খবরের কাগজে তিনি যে-কথাগুলো বলেছেন সে-সম্পর্কে জানতে এসেছি।

'বিকি নামে এক রিপোর্টার একদিন সকালে ফোন করেছিল আমাকে,' বললেন বাডলং। 'আমি বোটানি এবং বায়োলজি পড়াই জানত সে। তাই বলল পারনেলের গোলাবাড়িতে একবার যেতে। ওখানে নাকি অদ্ভুত একটা জিনিস আছে। দেখলে আমি তাজ্জব হয়ে যাব।'

প্রফেসর তাঁর বুকে হাত রেখেছেন। এক হাতের আঙুলের ডগা অন্য হাতের আঙুলের ডগা স্পর্শ করেছে। অধ্যাপকরা বক্তৃতা দেওয়ার সময় অচেতনভাবে এরকম করে থাকেন।

'তো আমি গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম। পুরোনো গোলাবাড়ির পাশে আবর্জনার স্তূপে পড়ের মত একটা জিনিস দেখাল আমাকে পারনেল। সবজির মত। কিন্তু জিনিসটা ঠিক চিনতে পারলাম না। বিকি জিজ্ঞেস করল এটা কোনও উদ্ভিদজীবন কি না। আমি বললাম হতে পারে।' বাডলং মাথা নাড়লেন। 'সাংবাদিকরা খুব চালাক হয়। একটা ব্যাপার আপনি বুঝে ওঠার আগেই তারা ওই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য আদায় করে নেবে। সিগারেট?' কোটের বুকপকেট থেকে তিনি সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করলেন। আমাকে আর ক্যাথিকে সিগারেট অফার করলেন। আমরা মাথা নেড়ে নিষেধ করলাম খাই না। তিনি নিজের সিগারেটে আগুন ধরালেন।

'যে জিনিসগুলো সে আমাকে দেখাল–' মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন প্রফেসর–'আমার কাছে স্রেফ বীজের গুটি বলে মনে হলো। বুড়ো পারনেল বলল আকাশ থেকে ভেসে এসেছে এগুলো। আমি এতে দ্বিমত প্রকাশ করিনি–না হলে কোত্থেকে আসবে ওগুলো। পারনেলকে হতভম্ব মনে হচ্ছিল। যদিও আমার কাছে ওগুলোকে আসাধারণ কিছু মনে হয়নি, শুধু আকার ছাড়া। কিছু বীজের গুটির মধ্যে এমন কিছু পদার্থ ছিল যা দেখে ওগুলোকে ঠিক সিড-পড বলে মনে হয়নি। বিকি আবর্জনার স্তূপে পড়ে থাকা কয়েকটা জিনিসের প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করল। একজোড়া খালি ডেলমণ্টে পিচের ক্যান দেখাল ও। একই রকম দেখতে। একটা ভাঙা কুঠারের হাতল। পাশে অবিকল এরকম আরেকটা হাতল। তবে এতে অবাক হওয়ার মত কিছু খুঁজে পেলাম না আমি। বিকি তখন এ দিয়ে একটা গল্প বানাতে চাইল।'

সিগারেটে একটা টান দিলেন বাডলং, হাসলেন। 'বিকি প্রশ্ন করল এগুলো "আউটার স্পেস" থেকে এসেছে কি না। আমি জবাব দিলাম আসতেও পারে। যদিও জানতাম না কোত্থেকে এসেছে ওগুলো।' চেয়ারে শিরদাঁড়া টানটান করলেন বাডলং, তারপর ঝুঁকে এলেন আমাদের দিকে। 'আমাদের তখন ফাঁদে ফেলে দিল তরুণ সাংবাদিক। একটা থিওরি আছে আমাদের–কিছু উদ্ভিদ জীবন এ গ্রহে এসেছে

মহাশূন্য থেকে। বিখ্যাত একটি থিওরি। আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী লর্ড কেভিন এ-তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁর মতে, এ গ্রহে কোনও জীবনের শুরু হয়নি, বরং মহাশূন্যের গভীর থেকে ভেসে এসেছে। তিনি বলেছেন কিছু বীজগুটি, যেগুলোর প্রবল ঠাণ্ডা সহ্য করার ক্ষমতা ছিল, ওগুলো হয়তো আলোর চাপে ভাসতে ভাসতে চলে আসে পৃথিবীর কক্ষপথে। এ তত্ত্বের সঙ্গে সকলে পরিচিত। কেউ এর পক্ষে, কেউবা বিপক্ষে।

'তো আমি সাংবাদিককে বললাম এগুলো "আউটার স্পেস" থেকে আসা বীজগুটি হতে পারে। আমার সাংবাদিক বন্ধু একথায় চমৎকৃত হলো। "মহাশূন্যের বীজগুটি" শব্দদুটো খুব পছন্দ হলো তার। সে সঙ্গে নিয়ে আসা নোট বইতে শব্দদুটো লিখে ফেলল। এরপর দেখলাম সে ওই শব্দ দিয়ে পত্রিকার পাতায় হেডলাইন বানিয়েছে।'

আমি বললাম, 'আপনি আলোর চাপের কথা বললেন, প্রফেসর বাডলং। বীজগুটিগুলো আলোর চাপে মহাশূন্য থেকে ভাসতে ভাসতে এসেছে বললেন। ব্যাপারটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।'

চেয়ারে হেলান দিলেন বাডলং। হাসিমুখে বললেন, 'ব্যাপারটা তরুণ বিকির কাছেও ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছিল। এর মধ্যে রহস্যের কিছু নেই, ডক্টর। আপনি জানেন আলো শক্তি। মহাশূন্যে যা-কিছুই ভাসতে থাকুক না কেন, তা বীজগুটি হোক বা অন্য কিছু, আলোর চাপে সামনের দিকে এগোতে থাকবে। আলোর রয়েছে নিশ্চিত, পরিমিত শক্তি। এক একর জমিতে সূর্যের আলোর ওজন কয়েক টন, বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন। উদাহরণ হিসেবে বীজগুটির কথাই ধরুন, আলোর পথে বিস্তৃত হয়ে থাকা বীজগুটিগুলো দূর নক্ষত্রের আলোর স্রোতে ভাসতে ভাসতে একসময় পৃথিবীতে চলে এসেছে হয়তো।'

'তবে চলার গতি খুব মন্থর, তাই না?' আমি হাসলাম প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে। মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'তা তো বটেই। অসম্ভব ধীরগতি। এতই মন্থর গতি যা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে অসীম সময়ে অসীম ধীরগতিতে কী আসে যায়? বীজগুটিগুলো হয়তো লাখ লাখ বছর ধরে ভেসে বেড়াচ্ছে শূন্যে। কয়েক কোটি বছরও হতে

পারে। ছিপিবন্ধ একটা বোতলকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হলে ওটা সাগরপথে গোটা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে। এই বীজগুটিগুলো হয়তো পৃথিবী সৃষ্টির আগেই তাদের যাত্রা শুরু করেছে।'

তিনি আমার দিকে ঝুঁকে এলেন, হাঁটুতে চাপড় দিলেন। তাকালেন ক্যাথির দিকে। 'তবে আপনি সাংবাদিক নন, ডক্টর। পারনেলের গোলাবাড়িতে যে বীজের গুটি আমি দেখেছি বা সত্যি যদি ওগুলো তাই হয়ে থাকে, হয়তো বাতাসে ভেসে এসেছে। তাও বেশিদূর থেকে নয়। আমি হয়তো ওগুলোর জাত-পাত চিনতে পারিনি। তবে ওগুলো অচেনা কিছু নাও হতে পারে।' একটু বিরতি দিলেন তিনি। তারপর মৃদুস্বরে জানতে চাইলেন। 'এগুলোর ব্যাপারে আপনার এত আগ্রহ কেন, ডক্টর?'

আমি ইতস্তত করলাম, কতটুকু বলতে পারব বা বলা উচিত ঠিক বুঝতে পারছি না। শেষে বলে ফেললাম, 'মিলভ্যালিতে যে ডিল্যুশনের একটা ঘটনা ঘটেছে তা কি আপনি শুনেছেন, প্রফেসর বাডলং?'

'কিছুটা।' আমার দিকে অবাক চোখে তাকালেন তিনি। ডেস্কে রাখা কাগজের স্তূপের দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'স্থানীয় পত্রিকায় এ ব্যাপারে লেখালেখি করেছে। আপনার কি ধারণা ডিল্যুশনের ঘটনার সঙ্গে,'–মুচকি হাসলেন তিনি–'আমাদের মহাশূন্যের বীজগুটির কোনও সম্পর্ক রয়েছে?'

ঘড়ি দেখলাম আমি। সিধে হলাম। আর তিন মিনিটের মধ্যে শরিফ ভাই চলে আসবেন এখানে। ওর গাড়িতে উঠব আমরা। 'সম্ভবত,' প্রফেসর বাডলং-এর প্রশ্নের জবাবে বললাম। 'একটা কথা বলুন: এই বীজগুটিগুলোতে কি অদ্ভুত কোনও ভিনগ্রহের অর্গানিজম থাকতে পারে যা মানব শরীর নকল করতে পারে? নিজেদেরকে হুবহু একজন মানুষে রূপান্তর ঘটানো কি তাদের পক্ষে সম্ভব?'

হাসিখুশি, তারুণ্যদীপ্ত মানুষটা আমার দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন, খুঁটিয়ে দেখছেন আমাকে। তারপর মৃদু গলায়, তবে জোর দিয়ে বললেন, 'না, ডক্টর মর্তুজা।' হাসলেন তিনি। 'পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে যাতে আপনি জোর দিয়ে কিছু বলতে পারবেন না।

এটি তার মধ্যে একটি। এটা অসম্ভব একটি ব্যাপার। পৃথিবীর কোনও পদার্থের পক্ষেই মানুষের শরীরের রূপ নেওয়া সম্ভব নয়। আপনি যদি এরকম কিছু দেখেও থাকেন, ভুল দেখেছেন, ডক্টর। মাঝে মাঝে তত্ত্ব মানসিক ভাবে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে আমি জানি। তবে আপনি একজন ডাক্তার। আপনি যখন বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবেন, বুঝতে পারবেন আমি কতটা ঠিক বলেছি।'

প্রশ্নটা করা ভুল হয়েছে, বুঝতে পারলাম আমি। নিজেকে একটা আস্ত নির্বোধ মনে হলো। আমি প্রফেসরকে দ্রুত ধন্যবাদ দিলাম। ওখান থেকে পালাতে পারলেই যেন বাঁচি।

গেটের হুড়কোতে হাত রেখেছি, খোলার চেষ্টা করছি, থেমে গেলাম। আমাদের ডান দিকে, কয়েকশো গজ দূর থেকে ভেসে এল গাড়ির শব্দ। তীব্রগতিতে ছুটে আসছে। পেভমেন্টে কিচকিচ করে উঠল, রাবার গাছের ফাঁক দিয়ে শরিফ ভাইয়ের গাড়ি দেখতে পেলাম। হুইলের ওপর ঝুঁকে আছে, চোখ সামনে। ফিওনা তার পাশে গুটিসুটি মেরে বসা। আরেক জোড়া টায়ারের কিচ্‌চ্‌ শব্দ শুনলাম। এক সেকেণ্ড পরে গুলির শব্দ হলো। বুলেটটা বাতাসে শিস কেটে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। সাদা-কালো রঙের, সোনালি তারকাঅলা মিলভ্যালির পুলিশের গাড়ি বিদ্যুৎগতিতে চলে গেল গেটের সামনে দিয়ে। একটু পরে দুটো গাড়ির শব্দই মিলিয়ে গেল।

আমাদের পেছনে সদর দরজা খুলে গেছে, শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম। গেটের হুড়কো খুলে ফেলেছি আমি। ক্যাথির কনুই শক্ত হাতে ধরে গেট থেকে বেরিয়ে এলাম। দ্রুত পা চালালাম, তবে ছুটছি না। রাস্তার পাশ ধরে হাঁটছি। সেই বাড়ি দুটোর একটা থেকে কেউ চেঁচিয়ে কিছু একটা বলল। আরেকজন চেঁচিয়ে জবাব দিল। আমরা আবার পাহাড় বাইতে শুরু করেছি। ইউক্যালিপটাস আর ওকগাছের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে দ্রুত হাঁটছি।

একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা নিয়ে ভাবছি। শরিফ ভাইয়ের বুদ্ধিমত্তায় আমি রীতিমত অভিভূত। ওঁকে বেশিক্ষণ হয়তো তাড়া করেনি পুলিশের গাড়ি। তবে ওঁকে মিলভ্যালির রাস্তা দিয়ে পুলিশের

তাড়া খেয়ে আসতে হয়েছে ঘড়িতে একটা চোখ রেখে। উনি ইচ্ছে করলে অনেক আগেই পালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েও আমাদের এখানে এসেছেন, কারণ জানতেন, আমরা ওঁর জন্য অপেক্ষা করব। উনি দেখাতে চেয়েছেন তাঁকে পুলিশে ধাওয়া করেছে। আমাদেরকে সাবধান করে দিতে চেয়েছেন শরিফ ভাই। আতঙ্ক এবং ভয় নিয়ে কাজটা করতে হয়েছে ওঁকে। আমি এখন শুধু প্রার্থনা করতে পারি শরিফ ভাই তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে পুলিশের কবল থেকে যেন পালাতে পারেন। তবে পারবেন বলে মনে হয় না। কারণ খানাখন্দে ভরা রাস্তাগুলো এতক্ষণে পুলিশের ব্লক করে রাখার কথা। পুলিশের অন্য গাড়িগুলো হয়তো অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। এখন বুঝতে পারছি মিলভ্যালিতে ফিরে এসে কী মারাত্মক ভুল করেছি। এ শহরে যারা রাজত্ব করছে তাদের বিরুদ্ধে কতটা অসহায় আমরা। ওদের হাতে হয়তো যে-কোনও সময় ধরা পড়ে যাব। হয়তো রাস্তার পরের মোড়টা ঘোরার সময়ই—জানি না তারপর কী আছে আমাদের ভাগ্যে।

রক্তস্রোতে ছড়িয়ে পড়া ভয়টা বিপর্যস্ত করে তুলল আমাদেরকে। ক্যাথি আমার হাতের সঙ্গে প্রায় ঝুলে আছে, মুখটা সাদা, রক্তশূন্য, চোখ আধবোজা, ঠোঁট জোড়া ফাঁক হয়ে আছে, মুখ দিয়ে টানছে বাতাস। আর পাহাড় বাইতে পারছি না। পা আর চলতে চাইছে না। ইচ্ছের বিরুদ্ধে টেনে চলছি পা দুটোকে। কোথাও একটা আশ্রয়ের দরকার আমাদের, কিন্তু কিছু নেই—এমন কোনও বাড়ি চোখে পড়ল না যেখানে আমরা সাহস করে যাব। এমন একটা মুখ দেখতে পেলাম না যার কাছে গিয়ে আকুতি করে বলব: আমাদের বড় বিপদ, আমাদেরকে বাঁচাও।

পনেরো

আমাদের শহরের মেইন স্ট্রিট পাহাড়ের কোল বেয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। শহরের বেশিরভাগ রাস্তাই এরকম। আমরা একটা পাহাড়ি রাস্তা ধরে নেমে আসছি। রাস্তাটা মিশেছে কতকগুলো বাণিজ্যিক ভবনের সরু গলিতে। এর মধ্যে আমার দাপ্তরিক ভবনটিও রয়েছে।

আমার ওখানে যেতে ভয় করছে। তবু কেন জানি মনে হচ্ছে ওখানে গেলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও নিরাপদে থাকব। কারণ ওরা আশা করবে না আমরা অফিসে আসব। সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি শেষে ব্যর্থ হয়ে শেষতক হয়তো ওরা অফিসে ঢুকবে। এ মুহূর্তে খানিকটা বিশ্রাম না নিলেই নয়। অফিসে কিছুটা ঘুমিয়েও নিতে পারব হয়তো। অফিসে বেনজেড্রাইন ট্যাবলেট আছে। কয়েকটা স্টিমূল্যান্টও রয়েছে। এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে পারলে চাঙা হয়ে উঠবে শরীর।

আমাদের নীচে বাড়িঘরের ছাদ দেখতে পাচ্ছি। বাণিজ্যিক রাস্তাটি খুব চেনা আমার; সেকুইয়া, ওখানে ছেলেবেলায় শনিবারের সন্ধ্যায় বহু ছবি দেখেছি। বেনেটার ভ্যারাইটি স্টোর, সিনেমা দেখার সময় ওই দোকান থেকে ক্যাণ্ডি কিনে নিয়ে যেতাম। গ্রীষ্মের এক ছুটিতে একবার খণ্ডকালীন চাকরিও করেছি। কতগুলো দোকানের ওপর তিন-রুমের ওই অ্যাপার্টমেণ্ট। তখন কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, এক সামারে এক মেয়ে আমাকে তার ঘরে যাওয়ার আহবান করেছিল। মেয়েটি একা থাকত বাড়িটিতে।

গলিতে চলে এলাম। কেউ নেই। শুধু একটা কুকুর রাস্তায় ফেলে রাখা কার্টনের গন্ধ শুঁকছে। আমরা দোতলা অফিসভবনের দিকে পা বাড়ালাম।

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় নারী বা পুরুষ, যদি কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হত, তাকে ঘায়েল করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম আমি। তবে কারও সঙ্গে

দেখা হলো না। দোতলায় উঠে ধাতব ফায়ার-ডোরে কান পাতলাম। কারও কোনও সাড়া নেই। দরজা খুললাম। খালি হলরুম পার হয়ে ঝাপসা কাচের দরজার দিকে পা বাড়ালাম। দরজার গায়ে আমার নাম লেখা। চাবি বের করে তালা খুললাম। ঢুকে পড়লাম নিজের অফিসে। ক্লিক শব্দে পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

আমার ওয়েটিংরুম এবং অফিসে ইতিমধ্যে গ্রাস করেছে ধুলো। প্রতিটি কাচ এবং কাঠের গায়ে ধুলোর পাতলা স্তর। আমি অফিস থেকে যাওয়ার পর আমার নার্স অফিসের ধারেকাছেও ঘেঁষেনি বুঝতে পারছি। ভ্যাপসা একটা গন্ধ ঘর জুড়ে। অন্ধকার। প্রতিটি ভেনেশিয়ান ব্লাইণ্ড বন্ধ। নিস্তব্ধ চারপাশ। কেমন যেন অচেনা। যেন অনেকদিন আমি আসিনি এখানে, এ অফিস যেন এখন আর আমার নয়। ঘরে কেউ ঢোকেনি বোঝাই যায়, কেউ অনুপ্রবেশ করেছে কি না পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টাও করলাম না।

ওয়েটিংরুমের লম্বা, প্রশস্ত গদিআঁটা সোফায় শুইয়ে দিলাম ক্যাথিকে। জুতো খুলে ফেলল ও। এক্সামাইনিং টেবিল থেকে একজোড়া চাদর আর বালিশ নিয়ে এলাম। ক্যাথির গায়ে জড়িয়ে দিলাম চাদর। মাথায় গুঁজে দিলাম বালিশ। ক্যাথি শুয়ে দেখছে আমাকে, কিছু বলছে না। আমার চোখে চোখ পড়তে ফ্যাকাসে হাসল ও। ওর পাশে হাঁটু মুড়ে বসলাম আমি, মুখখানা ধরলাম দুহাতে, চুমু খেলাম যেন আদর করে শিশুকে চুম্বন করেছি। এর মধ্যে সেক্সের কোনও প্রশ্ন নেই। ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'ঘুমাও মেয়ে। একটু বিশ্রাম নাও,' ওর দিকে হেসে চোখ টিপলাম।

আমি জুতো খুলে ফেলেছি। কাজেই হলঘরে কেউ এলেও আমাদের উপস্থিতি টের পাবে না। এক্সামাইনিং টেবিল থেকে লেদারপ্যাডটা খুলে ওয়েটিংরুমের জানালার কাছে নিয়ে এলাম। জানালাগুলো থকমর্টন স্ট্রিটের দিকে মুখ করা। জানালার সমান্তরাল মেঝেতে বিছালাম লেদারপ্যাড। কোটের বোতাম খুললাম, ঢিলে করলাম টাই, তারপর বসলাম। দেয়ালে হেলান দিয়ে ভেনিশিয়ান ব্লাইণ্ডের একটা খড়খড়ি সামান্য ফাঁক করে তাকালাম রাস্তায়।

একটু ভাল লাগছে আমার। অন্ধকার এবং নীরব এ ঘরে কিছুক্ষণ আগেও নিজেকে অসহায় এবং অন্ধের মত মনে হচ্ছিল। তবে নীচে রাস্তার দিকে তাকিয়ে, ওখানকার কর্মচাঞ্চল্য দেখে মনে যেন খানিকটা জোর ফিরে পেলাম।

খড়খড়ির পৌনে এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে প্রথমে যে-দৃশ্যটি দেখতে পেলাম আমেরিকার হাজার হাজার ছোট শহরের মেইনস্ট্রিটে এরকম দৃশ্য হামেশা দেখা যায়। অ্যাসফল্টের রাস্তায়, ফুটপাতের ধারে এবং পার্কিং মিটারে গাড়ি পার্ক করা। লোকজন ড্রাগ স্টোর রেডহিল লিকার্স থেকে ঢুকছে, বেরুচ্ছে। ভার্নির হার্ডওয়্যার-এর দোকানেও ডজনখানেক লোক দেখলাম। পাতলা কুয়াশার একটা মেঘ ভেসে আসছে উপকূল থেকে। মহিলারা মার্কেটে যাচ্ছে, আসছে। বগলে বাদামি কাগজের ঠোঙা। বাচ্চারা মায়েদের হাত ধরে রয়েছে। গাড়ি ঢুকছে পার্কিং স্পেসে; এক মেইলম্যানকে দেখলাম একটার-পর-একটা দোকানে যাচ্ছে চিঠি বিলি করতে। এক বুড়ো একা একা হাঁটছে; তিনটে কিশোর অলস ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এত স্বাভাবিক লাগছে সবকিছু। কোথাও কোনও ছন্দপতন চোখে পড়ছে না। রাস্তার মাথায় মেরিন সিটির একটা বাস থামল। তিনজন লোক নামল বাস থেকে। এক মহিলা আর এক পুরুষ নামল একসঙ্গে। পুরুষের হাতে রশিতে ঝোলানো ব্রাউন পেপারের পার্সেল। বাসে চড়ার জন্য কেউ অপেক্ষা করে নেই। একটু পর চলে গেল বাস। আমি বাসের শিডিউল জানি। আগামী একান্ন মিনিটের মধ্যে আর কোনও বাস শহরে ঢুকবে না কিংবা বেরুবে না।

কুয়াশা আগের চেয়ে ভারী হয়েছে। ছাদ ছুঁয়ে যাচ্ছে। ঘন, ধূসর রঙের কুয়াশা। এর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই, তবে...পরিবর্তন একটা চোখে পড়ল। ওরা শনিবার বিকেলের সাধারণ জনতার মত আচরণ করছে না। দোকানে এখনও কেউ কেউ ঢুকছে, বেরুচ্ছে, তবে কয়েকজন গাড়িতে স্রেফ পাথরের মূর্তি হয়ে বসে আছে; কারও গাড়ির দরজা খোলা, পা মাটিতে, কেউ পাশের গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে। কেউ কেউ খবরের কাগজ পড়ছে, কেউবা রেডিও শুনছে। স্রেফ

সময় কাটাচ্ছে ওরা। এদের অনেককেই চিনি আমি; লেন পার্লম্যান, অপ্টোমেট্রিস্ট, জিম ক্লার্ক এবং তার স্ত্রী, শার্লি ও তার বাচ্চারা, আরও অনেকে।

মিলভ্যালিতে কোনও আগন্তুক এলে তার কাছে রাস্তার দৃশ্যটা খুব স্বাভাবিক মনে হবে। তবে আমার কাছে তা মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটার অপেক্ষায় রয়েছে সবাই।

আমি দেখলাম পঞ্চাশোর্ধ্ব স্থানীয় ঠিকাদার বিল বিটনার ফুটপাত ধরে হেঁটে আসছে। দোকানের জানালার দিকে তাকাতে তাকাতে পকেট থেকে একটা বোতাম বের করল। প্লাস্টিক কিংবা ধাতব বোতাম। তাতে কিছু লেখা। কোটের ল্যাপেলে লাগাল সে। রুপোর ডলারের সাইজ। ডিজাইনটা দেখেই চিনে ফেললাম। ওতে কী লেখা আছে তাও জানি–মিলভ্যালি বার্গেন জুবিলি। প্রতিবছর স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এটা পরে। খদ্দেরকে বোতাম দেয় যদি তারা পরতে চায়। তবে বোতামগুলো ছিল সাদার ওপরে লাল। আর বিল বিটনারের বোতাম নেভি ব্লু'র ওপর হলুদ রং করা।

রাস্তায় যত লোক দেখতে পেলাম আমি, সবার হাতে হলদে-নীল বোতাম লক্ষ করলাম। সবাই বোতামগুলো কোটের ল্যাপেলে লাগাচ্ছে। কেউ হাঁটতে হাঁটতে, কেউবা কথা বলতে বলতে অলস ভঙ্গিতে কাজটা করল। পাঁচ, ছয় মিনিটের মধ্যে সবাই, এমনকী পার্কিং মিটার পুলিশ জ্যানসেকও নীল-হলুদ রঙের মিলভ্যালি বার্গেন জুবিলি বোতাম লাগিয়ে নিল কোটের ল্যাপেলে।

মিনিটখানেক সময় লাগল আমার বুঝতে যে লোকজন আমার জানালার নীচের পাবলিক চত্বরে জড়ো হতে শুরু করেছে। এদের প্রত্যেকের কোটের ল্যাপেলে বার্গেন জুবিলি বোতাম লাগানো।

ক্যাথির সাড়া পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। আমার পাশে, মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসেছে। ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। লেদারপ্যাড পুরোটা বিছিয়ে নিলাম মেঝেতে যাতে দু'জনে বসতে পারি। ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম, আমার কাছ ঘেঁষে এল ক্যাথি, গালে গাল ঠেকাল। ভেনিশিয়ান ব্লাইণ্ড দিয়ে দু'জনে তাকালাম নীচের রাস্তার

দিকে।

ডাইম স্টোর থেকে বেরিয়ে এল একজন সেলসম্যান। হেঁটে গেল নিজের গাড়ির দিকে। গাড়ির দরজায় তার কোম্পানির নাম লেখা। দরজা খুলে সে কী যেন খুঁজতে শুরু করল। পুলিশ কর্মকর্তা জ্যানসেক হাতঘড়ি দেখল, তারপর হেঁটে এসে দাঁড়াল গাড়িটির সামনে। সিধে হলো সেলসম্যান, বন্ধ করল দরজা, হাতে একতাড়া লিফলেট। জ্যানসেক কথা বলতে লাগল তার সঙ্গে। রাস্তার অল্প যে ক'জন লোক হলুদ-নীল বোতাম লাগায়নি কোটে, সেলসম্যান তাদের একজন। লোকটার ভুরু কুঁচকে উঠতে দেখলাম আমি, চেহারায় হতভম্ব ভাব, সে যা বলছে, দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে তা নাকচ করে দিচ্ছে জ্যানসেক। বিরক্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সেলসম্যান, ঘুরে গাড়ির ড্রাইভারের আসনের দিকে গেল, পকেট থেকে বের করল চাবি, জ্যানসেক অপর দরজা খুলে ডানদিকের সিটে বসে পড়ল। পিছিয়ে গেল গাড়ি, এগোল দশ-বারো গজ সামনে, তারপর বাম দিকে মোড় নিল। আমি জানি ওরা থানায় যাচ্ছে। জ্যানসেক কী কারণে লোকটাকে গ্রেপ্তার করল বুঝতে পারলাম না।

একটা নীল ভলভো সেডান, রাস্তায় চলমান গাড়ি দেখতে পেলাম শুধু এটাকেই, লো-গিয়ারে ধীরগতিতে চলছে, পার্ক করার জায়গা খুঁজছে। একটা জায়গা পেয়ে গেল ড্রাইভার, ওদিকে গাড়ির নাক নিয়ে সেঁধোতে যাচ্ছে, ওরিগন লাইসেন্স প্লেট ওটার, বেজে উঠল পুলিশের বাঁশি। স্থানীয় পুলিশ সার্জেন্ট বিউচ্যাম্প গটগট করে হেঁটে এল ফুটপাত দিয়ে। মুঠো শক্ত করা, গাড়ির দিকে হাত বাড়িয়ে নিষেধ করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল ওরিগন কার, ড্রাইভার বসে থাকল নিজের আসনে। বিউচ্যাম্প হাজির হয়ে গেল গাড়ির সামনে। ড্রাইভারের পাশে বসা এক মহিলা উইণ্ডশিল্ড দিয়ে উঁকি দিল। ড্রাইভারের জানালায় ঝুঁকল বিউচ্যাম্প, কিছুক্ষণ কথা বলল, তারপর উঠে বসল পেছনের আসনে। পিছিয়ে গেল গাড়ি, তারপর এগোল সামনের দিকে, বামে মোড় নিয়ে ছুটল পুলিশ থানা অভিমুখে, অদৃশ্য হয়ে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

কাছের দুই ব্লকে আরও তিনজন পুলিশ দেখতে পেলাম। বুড়ো হেস এবং আরও দুজন তরুণ ওদেরকে চিনি না। হেসের পরনে ইউনিফর্ম, তবে দুই তরুণ শুধু মাথায় ইউনিফর্ম ক্যাপ পরেছে, গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, কালো রঙের প্যান্ট। স্পেশাল পুলিশের মত লাগছে ওদেরকে, যেন বিশেষ উদ্দেশ্যে ভাড়া করে আনা হয়েছে। ডেভের ওয়েট্রেস এলিস এসে দাঁড়াল দরজার বাইরে, তার সাদা ইউনিফর্মে নীল-হলদে জুবিলি বোতাম সাঁটানো। তরুণ এক পুলিশের সঙ্গে চোখাচোখি হলো তার। একবার মাথা ঝাঁকাল এলিস, ফিরে গেল রেস্টুরেন্টে। পুলিশটা একা ঢুকল রেস্টুরেন্টে।

মিনিটখানেক পরে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল তরুণ পুলিশ, সঙ্গে তিনজন। একজন পুরুষ, এক মহিলা ও বছর-আটেকের একটি মেয়ে। নিঃসন্দেহে ওরা একটি পরিবার। পরিবারটি বা দলটি ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রইল, লোকটা কথা বলছে, কিছু একটা নিয়ে প্রতিবাদ করছে। তারপর দলটা সাইড স্ট্রিটের দিকে এগুলো। ওদিকে থানা। ওরা রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি তাকিয়ে রইলাম ওদিকে। পরিবারের কারও পোশাকে জুবিলি বোতাম নেই, শুধু পুলিশটির আছে।

এক ডেলিভারি ট্রাকের ড্রাইভারের সঙ্গে একই রকম আচরণ করা হলো; সে এবং পুলিশ দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাওয়ার পরে আমি এমন একজনকেও দেখলাম না যার পোশাকের সঙ্গে হলুদ-নীল বোতাম সাঁটানো নেই।

রাস্তা এখন নীরব, প্রায় নিস্তব্ধ, একটা গাড়িও চলছে না, কেউ হাঁটাহাঁটিও করছে না। কেউ খবরের কাগজ পড়ছে না কিংবা গাড়িতেও বসে নেই। সবাই দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাতে, তিন-চারজনে মিলে একটা দল তৈরি করে, রাস্তার দিকে ফেরা। বুড়ো পুলিশ হেস শুধু চওড়া রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতিটি দোকান কিংবা বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের সামনে তার মালিক কর্মচারী এবং খদ্দের দাঁড়ানো। বুড়ো হেস মাথা ঘুরিয়ে প্রতিটি দোকান-মালিকের দিকে তাকাল। মালিকরা সবাই ডানেবামে মাথা নাড়ল। অন্য দুই পুলিশ এল হেসের কাছে, মনে হলো কিছু একটা রিপোর্ট করছে। হেস তাদের কথা শুনল।

তারপর মাথা ঝাঁকাল। রোল কল শেষ হলো। দুই পুলিশ হেঁটে গেল ফুটপাতে, রাস্তার দিকে ফিরে রইল। জনতার সঙ্গে অপেক্ষা করছে।

ছাদের ওপর থেকে, দুটো জায়গার প্রায় আধমাইল রাস্তা দেখতে পাচ্ছি আমি। গাড়ি কিংবা কোনও কিছু চলাচল করছে না ওখানে। দূরের এক রাস্তায় ব্যারিকেড দেখতে পেলাম। ধূসর রঙ করা কাঠের ঘোড়া দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে। আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম এভাবে ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে ওভারঅল পরা লোকগুলো আসলে রাস্তা মেরামত করছে। এখন আর মিলভ্যালিতে প্রবেশের উপায় নেই, বাণিজ্যিক এলাকায় যাওয়ার রাস্তাও বন্ধ। মিলভ্যালিকে বাইরের দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে, এ শহরের বাসিন্দা ছাড়া অচেনা কাউকে আশপাশে দেখতে পেলাম না আমি।

তিন-চার মিনিট পর একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল—জনতা সরি বেঁধে দাঁড়াল দু'পাশের ফুটপাতে, খালি হয়ে গেল রাস্তা, যেন অদৃশ্য প্যারেড দেখছে তারা। প্রায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল তারা, নির্বাক। এমনকী বাচ্চাকাচ্চারাও চুপ হয়ে গেছে। এখানে-সেখানে ধূমপান করছে দু'একজন, তবে বেশিরভাগ স্রেফ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েকজন লোককে দেখলাম বুকে হাত বেঁধে আয়েশি ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। মাঝে মাঝে কেউ কেউ এক পায়ের ওজন চাপাচ্ছে অন্য পায়ে। শিশুরা তাদের বাবা মার কোট ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ পেলাম, তারপর রাস্তার বাঁকে হুড দেখতে পেলাম, সেকুইয়ার কাছে গাঢ় সবুজ রঙের লক্করঝক্কর মার্কা একটা পুরোনো শেভ্রোলে পিকআপ। ওটার পেছন পেছন এল আরও চারটে ট্রাক, তিনটে জিএম ফার্মের বড় ট্রাক, বাকি গাড়িটি একটি পিকআপ। গাড়িগুলো পাবলিক চত্বরে চলে এল। সার বেঁধে দাঁড়াল ফুটপাত ঘেঁষে। প্রতিটি ট্রাকের গা তারপুলিনে মোড়া। গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল ড্রাইভাররা। তারপুলিনের বাঁধন খুলতে লাগল। খোলাবাজারের মত একটা দৃশ্য, গ্রাম থেকে ট্রাকে করে মাল এসেছে। ড্রাইভারদের সকলের পরনে ডেনিম ওভারঅলের প্যান্ট আর শার্ট। এদেরকে চিনি আমি। শহরের পশ্চিমের ছোট খামারগুলোতে কাজ

করেঃ জো গ্রিমালডি, জো প্রিক্সলি, আর্ট গেসনার, বার্ট পারনেল এবং আরেকজন।

বিজনেস সুট পরা দু'জন লোক রাস্তায় এসে দাঁড়াল, ট্রাকের সারির পাশেঃ ওয়ালি ইগেরহার্ড, স্থানীয় রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী, অপরজনের নামটা মনে করতে পারলাম না। তবে একে বুইক গ্যারেজে মেকানিকের কাজ করতে দেখেছি। ওয়ালির হাতে একতাড়া কাগজ, ছোট কাগজ, নোটবুক থেকে ছেঁড়া। ওরা কাগজের তাড়ায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর মুখ তুলে চাইল মেকানিক, গভীর দম নিল, উঁচু গলায়, প্রায় চিৎকারের ভঙ্গিতে বলল–আমরা পরিষ্কার শুনতে পেলাম ওর কণ্ঠ, 'সসালিটো! সসালিটো পরিবার হাজির থাকলে দয়া করে এগিয়ে আসুন!' সসালিটো মেরিন কাউন্টির একটি শহর। উপকূলের পরেই। ফুটপাত থেকে নেমে এল একজন নারী আর এক পুরুষ। হেঁটে গেল ওয়ালির দিকে। অন্যরা ভিড় ঠেলে নেমে পড়ল রাস্তায়, পা বাড়াল ট্রাকের দিকে।

জো প্রিক্সলি তার পিকআপের তারপুলিন খুলে ফেলেছে, পেছনে চলে এল। গুটিয়ে ফেলল তারপুলিন। আমি আগেই ধারণা করেছি ওর ভেতরে কী আছে। তাই জিনিসটা দেখে অবাক হলাম না মোটেই। পিকআপের ধাতব শরীরের পাশে সারি বাঁধা অনেকগুলো সিড পড।

'ঠিক আছে!' হাঁক ছাড়ল মেকানিক। 'সসালিটো! সসালিটো শুধু প্লিজ!' জো প্রিক্সলির ট্রাকের ধারে দাঁড়ানো পাঁচ-ছজন লোককে ইঙ্গিত করল সে। জো বীজগুটিগুলো এক এক করে নামিয়ে দিল ট্রাকের নীচে দাঁড়ানো লোকগুলোর হাতে। প্রতিটি নারী এবং পুরুষ সাবধানে একটি করে গুটি নিল প্রসারিত হাতে। একজন নিল একসঙ্গে দুটো। ওয়ালি ইগেরহার্ড তার হাতের তালিকায় টিক চিহ্ন দিয়ে যেতে লাগল একটা করে পড ট্রাক থেকে নামানো হলেই। তারপর মেকানিককে কী বলতে সে হাঁক ছাড়ল, 'মেরিন সিটি, প্লিজ! মেরিন সিটি পরিবার অথবা তাদের প্রতিনিধিরা আসুন, নেক্সট!' মেরিন সিটি সসালিটো থেকে কয়েক মাইল দূরের আরেকটি মেরিন কাউন্টি শহর।

এবার সাতজন লোক এগিয়ে গেল, এদের মধ্যে পাঁচজন কালো–

মেরিন সিটি কৃষ্ণাঙ্গ-অধ্যুষিত শহর। জো এদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে বীজগুটি তুলে দিল। মধ্যবয়স্ক এক কৃষ্ণাঙ্গিনী, গ্রেস বার্ক, ব্যাংকে কাজ করে, সে একাই নিল তিনটি। ফুটপাত থেকে এক লোক নেমে এল তাকে সাহায্য করতে, যাতে হাত থেকে পড়ে গিয়ে চুরমার না হয়ে যায় বীজগুটি। মনে পড়ল গ্রেস বার্কের বোন এবং ভগ্নিপতি থাকে মেরিন সিটিতে। ওখানে ওদের আরও আত্মীয়স্বজন আছে কি না জানি না।

পার্ক করা গাড়িগুলোর ট্রাঙ্ক খুলে ফেলা হয়েছে। বিরাট আকারের প্যাডগুলো খালি ট্রাঙ্কে রাখা হচ্ছে। অনেক গাড়ির পেছনের সিটে সাবধানে রেখে দিচ্ছে বীজগুটি। এক্ষেত্রে প্রতিটি গুটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হচ্ছে যাতে কেউ বুঝতে না পারে জিনিসটা কী।

এরপর টিবুরনের নাম ধরে ডাকা হলো, আটজন এগিয়ে গেল পড নিতে। তারপর খালি হয়ে গেল জো প্রিক্স্লির ট্রাক। সে রাস্তায় বসে সিগারেট ধরাল। এরপর অন্য ট্রাক থেকে মাল খালাস করার পালা। গ্যারেজ মেকানিক হাঁক ছাড়ল: 'বেলভেডার।' ফুটপাত থেকে নেমে এল দু'জন। এরপর ডাকা হলো কোর্টে মাডেরা, স্ট্রবেরি, বেলভেরন গার্ডেনস এবং স্যান রাফায়েলের নাম ধরে–চোদ্দজন লোক স্যান রাফায়েলের পক্ষে গ্রহণ করল পড। এটি এ-রাজ্যের বৃহত্তম শহর। তারপর প্রদেশের প্রতিটি শহরের নাম ধরে ডাকা হলো। পনেরো মিনিটের মধ্যে খালি হয়ে গেল পাঁচটি ট্রাক, শুধু জো গ্রিমালডিরটা বাদে। ওতে দুটো পড রয়ে গেল।

ওয়ালি এবং মেকানিক মিশে গেল জনতার ভিড়ে। ওয়ালি বুক পকেটে চালান করে দিল তার কাগজপত্র। ভেঙে গেল জনতার ভিড়। ট্রাক এবং গাড়িগুলো সচল হলো। দানব পডগুলো নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ির মালিকরা। লোকজন আবার হাঁটাহাঁটি শুরু করল রাস্তায়। শহরে নতুন কেউ ঢুকলে এখনকার দৃশ্যটা অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হবে তার কাছে। পথচারীদের কারোর কোটের ল্যাপেলে এখন আর হলুদ-নীল রঙের জুবিলি বোতাম লাগানো নেই।

পাঁচ মিনিট বাদে দেখলাম জ্যানসেক যে সেলসম্যানকে গ্রেপ্তার

করে থানায় নিয়ে গিয়েছিল, সে গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছে। একা। কিছুক্ষণ পর ওরিগন লাইসেন্সের গাড়িটাকেও দেখা গেল।

ক্যাথিকে এখনও জড়িয়ে ধরে আছি, তাকালাম ওর দিকে। আমার দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ক্যাথি, ঠোঁট কামড়াল, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। জবাবে মৃদু হাসলাম আমি। কিছুই বলার নেই আসলে আমাদের। আমাদের অনুভূতিশক্তিও যেন ভোঁতা হয়ে গেছে, নতুন করে কিছুই ভাবতে পারছি না।

তবে একটা ব্যাপার আমার কাছে এখন পরিষ্কার–মিলভ্যালি শহরটা পুরো ওদের দখলে। এ শহরের প্রতিটি নারী, পুরুষ, শিশু এখন আর পরিচিত নয় আমার কাছে। ওরা প্রত্যেকে আমাদের শত্রু। আমাদেরকে সাহায্য করার এখানে কেউ নেই।

ষোলো

আমরা প্রায়ই বলি, 'আমি অবাক হইনি' কিংবা 'জানতাম এ-রকম ঘটবে'–এর অর্থ কোনও ঘটনা ঘটার সময়, যদিও আগে আমরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন থাকি না, তবে আমাদের অবচেতন মন বলে এরকম কিছু একটা ঘটতে পারে। জানালার পাশে বসে ভাবছিলাম আমাদের এখন যা করা উচিত তা হলো অপেক্ষা–সন্ধ্যা নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করা। তারপর আমরা শহর থেকে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করব। দিনের বেলা এ-কাজ করা যাবে না। কারণ প্রতিটি হাত এবং চোখ লেগে থাকবে আমাদের বিরুদ্ধে। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলাম ক্যাথিকে, আশার ভঙ্গিতে কথাটা শোনালাম যেন সফল হব কাজটিতে।

রিসেপশন রুমের দরজার তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ হলো খুট করে। অবাক হলাম না। যেন জানতাম এরকম ঘটবে। তালা যে-ই খুলুক, মাস্টার-কি সে নিয়ে নিয়েছে ভবনের দারোয়ানের কাছ থেকে।

তবে যখন দরজা খুলে গেল, চারজন লোক ঢুকল ঘরে। চট করে

দাঁড়িয়ে গেলাম আমি। হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল খুশিতে। নতুন আশায় উজ্জীবিত আমি আনন্দের হাসি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলাম হ্যাণ্ডশেকের জন্য, উত্তেজনায় গলা দিয়ে কর্কশ আওয়াজ বেরুল, 'জনি!' আমি ওর হাত ধরে জোরে ঝাঁকিয়ে দিলাম।

সাড়া দিল জন, যদিও তেমন উৎসাহ নিয়ে নয়, তার হাতখানা আমার মুঠোয় প্রায় নিস্তেজ লাগল।

ওর চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝে ফেললাম সব। ওর চোখে খুশি নেই, চেহারা থেকে স্বাভাবিক টেনশন এবং সতর্ক ভাবটাও উধাও।

জন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝে ফেলল আমার মনের খবর। ধীরগতিতে মাথা ঝাঁকাল সে, 'হ্যাঁ, রায়হান, অনেকক্ষণ পর দেখা হলো। সেই যে রাতে ফোন করলে তার আগে শুধু দেখা হয়েছিল।'

ঘরে আর কে কে এসেছে দেখার জন্য ঘুরলাম আমি, পরখ করলাম প্রতিটি চেহারা, তারপর ফিরে গেলাম ক্যাথির কাছে। হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম কাঁধ। মুখোমুখি হলাম ওদের।

এক লোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে–বেঁটেখাটো, বলিষ্ঠ গড়ন। মাথায় টাক। একে আগে কখনও দেখিনি। অপরজন চেট মিকার, অ্যাকাউনটেণ্ট, বিশালদেহী, কালো চুল, পঁয়ত্রিশের কোঠায় বয়স, হাস্যোজ্জ্বল চেহারা। চতুর্থ জন প্রফেসর বাডলং, আমার দিকে তাকিয়ে চিরচেনা বন্ধুর মত হাসছেন।

আমি এবং ক্যাথি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, সোফার দিকে ইঙ্গিত করে মৃদু গলায় জন বলল, 'বসো।' মাথা নাড়লাম আমরা। কথাটা পুনরাবৃত্তি করল সে, 'বসো'। অনুনয় তার কণ্ঠে, 'প্লিজ, ক্যাথি; তুমি ক্লান্ত। যাও, সোফায় গিয়ে বসো।' কিন্তু ক্যাথি আমার গায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকল। আমি ওর কাঁধ চেপে ধরলাম জোরে। আবার মাথা নাড়লাম ডানে বামে।

'ঠিক আছে,' সোফার চাদর সরিয়ে একপাশে বসল জন। চেট মিকার তার পাশে এসে বসল। বাডলং ওদের কাছ থেকে একটু দূরে একটা চেয়ার দখল করলেন। আর বেঁটেখাটো মানুষটা দাঁড়িয়ে রইল দরজার সামনে।

'আশা করি ব্যাপারটা তোমরা স্বাভাবিকভাবে নেবে,' আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল জন। 'আমরা তোমাদের গায়ে হাত তুলব না। আর একবার যখন বুঝতে পারবে আমাদের কী করতে হবে–' শ্রাগ করল সে–'আশা করি ব্যাপারটা তোমরা মেনে নেবে এবং সকল ভুল-বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে।' আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল সে। আমরা জবাব দিচ্ছি না দেখে শুরু করল আবার, 'শুরুতেই বলে রাখি তোমরা কোনোরকম ব্যথা পাবে না; কিছুই টের পাবে না, ক্যাথি। কথা দিচ্ছি।' একমুহূর্ত ঠোঁট কামড়াল সে, কী বলবে ভাবছে। তারপর আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইল। 'তোমরা ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখবে সবকিছু আগের মতই আছে। তোমরা আগের মতই থাকবে। তোমাদের চিন্তাচেতনা, স্মৃতি, অভ্যাস, আচার-আচরণ কোনোকিছুর বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটবে না। তোমরা অবিকল আগের মত রইবে।' জোর দিল সে প্রতিটি শব্দের ওপর, যদিও তার চোখের তারায় সন্দেহ ফুটে উঠতে দেখলাম আমি এক সেকেণ্ডের জন্য। কথাগুলো যেন তার নিজেরই বিশ্বাস হয়নি।

'আমরা যদি একই রকম থাকি তা হলে আমাদেরকে বিরক্ত করছ কেন?' তর্কের খাতিরে নয়, কিছু বলা দরকার তাই বললাম। 'আমাদেরকে যেতে দাও। আমরা শহর ছেড়ে চলে যাব। আর ফিরব না।'

জন কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল, তাকাল বাডলং-এর দিকে, 'তুমি বোধহয় ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারবে, বাড।'

'ঠিক আছে,' খুশি-খুশি দেখাল বাডলংকে। চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন, শিক্ষক ছাত্রদেরকে লেকচার দেওয়ার সময় যেমন আনন্দবোধ করেন তেমন আনন্দিত লাগল তাঁকে। আমার মনে হলো জন হয়তো ঠিকই বলেছে, কোনও পরিবর্তনই ঘটবে না, সবকিছু যেমন ছিল তেমনই থাকবে।

'আপনারা যা দেখেছেন দেখেছেন, যা শুনেছেন শুনেছেন,' শুরু করলেন বাডলং। 'আপনারা পড বা বীজগুটি দেখেছেন। এগুলোর অন্য কোনও নাম দেওয়া গেল না–দেখেছেন ওগুলোকে পরিবর্তিত হতে,

নিজেদেরকে প্রস্তুত হতে; দু'বার দেখেছেন ওগুলোর প্রক্রিয়া প্রায় শেষ হওয়ার পথে। ওগুলোকে আমরা সিড বা বীজগুটি বলে জানি। তবে ওরা জ্যান্ত। মহাশূন্য থেকে ভেসে এসেছে, আসলগুলো, বিশাল দূরত্ব পার হয়ে। এ গ্রহে হঠাৎ করে আগমন ঘটছে ওদের, তবে আসার পর ওদের কিছু কর্তব্যকর্ম করতে হয়েছে, যেসব কাজ আপনারা স্বাভাবিকভাবে করেন বা স্বাভাবিক বলে মনে হয় আপনাদের কাছে, সে রকম কিছু কাজ। এ কারণেই ঘটেছে পরিবর্তন। কারণ পডগুলোকে তাদের ক্রিয়া সম্পাদন করতেই হবে, তারা করতে বাধ্য।'

'কী ধরনের ক্রিয়া সম্পাদন?' শ্লেষের সুরে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

কাঁধ ঝাঁকালেন বাডলং। 'বেঁচে থাকার জন্য কিছু কর্ম সম্পাদন।' আমার দিকে একমুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি। 'গোটা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে, ড. মর্তুজা। বেশিরভাগ বিজ্ঞানী তা জানেন এবং স্বীকারও করেন। ধরুন, ডক্টর, অসীম দূরত্বের কোনও গ্রহে জীবন রয়েছে, আমাদের বিবর্তনের চেয়ে অনেক প্রাচীন। ওই গ্রহ যদি মরতে শুরু করে তখন কী ঘটবে? ওই গ্রহের জীবন তখন নিজেদের অস্তিত্ব যেভাবেই হোক টিকিয়ে রাখতে চাইবে।'

চেয়ারে সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন বাডলং, আমার দিকে স্থির দৃষ্টি, নিজের বক্তৃতায় যেন নিজেই মুগ্ধ। 'একটি গ্রহ মারা যাচ্ছে,' পুনারাবৃত্তি করলেন তিনি। 'বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে। ওই গ্রহের জীবন প্রস্তুত হচ্ছে। কীসের জন্য? গ্রহটি ত্যাগ করার জন্য। কিন্তু কোথায় যাবে? কখন? এর জবাব একটাই–তারা এমন কোথাও যাবে যেখানে টিকিয়ে রাখতে পারবে তাদের অস্তিত্ব।'

বাডলং আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন, হেলান দিলেন চেয়ারে। উপভোগ করছেন সময়। রাস্তায় বেজে উঠল একটা গাড়ির হর্ন, ভেসে এল একটা বাচ্চার কান্না। 'কাজেই পডগুলোকে এক অর্থে বলা যায় একধরনের প্যারাসাইট বা পরজীবী যারা অন্যের ওপর ভর করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। তবে এ পরজীবী অন্যের জীবন শুষে নেয়, আঁকড়ে ধরে থাকে তার হোস্টকে। যে কাউকে নকল করার ক্ষমতা আছে তাদের। তাদের কোষগুলো জীবন্ত কোষের ওপর ভর

করে বেঁচে থাকে। এই পডগুলো কোটি কোটি মাইল দূর থেকে এখানে এসেছে, এখন বেঁচে থাকার তাগিদে নিজেদের কর্তব্যকর্ম করছে। ভর করছে মানুষের ওপর। তাদের ওপর ভর করে টিকিয়ে রাখছে নিজেদের অস্তিত্ব।'

হাসলাম আমি। 'সস্তা থিওরি।' তীব্র ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বললাম। 'আর আপনিই বা কী করে জানলেন এসব কথা? আপনি অন্য গ্রহ, জীবনগঠন সম্পর্কে কতটুকু কী জানেন?'

আমার কথা শুনে রাগ করলেন না বাডলং। শান্ত গলায় বললেন, 'আমরা এই ছোট্ট গ্রহটি সম্পর্কেই বা কতটুকু জানি, ডক্টর? আমরা তো মাত্র গাছ থেকে নেমে এলাম। এখনও বুনো। মাত্র দুশ' বছর আগেও আপনারা, ডাক্তাররা জানতেন না কীভাবে শরীরে রক্ত-সঞ্চালন ঘটে। আমরা তো শরীর সম্পর্কে এখনও অনেক কিছুই জানি না। আপনার শরীরের একটি প্যাটার্ন রয়েছে, প্রতিটি জ্যান্ত জিনিসেরই তা থাকে– সেলুলার লাইফের এটাই মূল ভিত্তি। আর আপনার শরীরে পরিবর্তন ঘটে ঘুমের মধ্যে। ঘুমের মধ্যে আপনার শরীর থেকে প্যাটার্ন কেড়ে নেওয়া যায়, হজম করা সম্ভব স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির মত। এক শরীর থেকে অন্য শরীরে প্রবেশ করানো যায়।'

মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর। 'কাজেই ঘটনা এরকম ঘটতে পারে, ডক্টর মর্তুজা। এবং সহজে। ইলেকট্রিকাল ফোর্স লাইনের জটিল প্যাটার্ন যা আপনার শরীরের প্রতিটি পরমাণুকে একত্রিত করে কোষ গঠন করে–তা ধীরে ধীরে স্থানান্তর করা যায়। আর যেহেতু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণুর চেহারা একরকম–আপনার মত একজন মানুষের ডুপ্লিকেট তৈরি করা সহজ, পরমাণু মিলবে পরমাণুর সঙ্গে, মলিকিউল মলিকিউলের সঙ্গে, কোষ কোষের সঙ্গে। আপনার শরীরের ক্ষুদ্রতম কাটাছেঁড়ার দাগও নকল শরীরে ফুটে উঠবে। আর আসল শরীরের কী হবে? ওটা গলে যাবে, ধূসর একটা থকথকে পদার্থে পরিণত হবে। এরকম ঘটতে পারে এবং ঘটছে এবং আপনারা তা জানেন। তবু ব্যাপারটা আপনারা মেনে নিতে চাইছেন না।' আমাকে দেখলেন তিনি, হাসলেন। 'হয়তো ভুল বললাম আমি। আপনারা ব্যাপারটা মেনে

নিতেও পারেন।'

ঘরটা কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গেল। ওয়েটিং রুমের চার মূর্তি ক্যাথি এবং আমাকে লক্ষ করছে। বাডলং ঠিকই বলেছেন। আমি তাঁর কথা মেনে নিয়েছি। আমি জানি তিনি যা বলেছেন তা সত্য। সম্ভব হোক বা না হোক, এটাই সত্যি। হতাশা এবং অসহায়বোধ গ্রাস করল আমাকে। কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করলাম। বারবার মুঠো খুলছি আর বন্ধ করছি। হঠাৎ, কোনোকিছু, না ভেবেই, কিছু একটা করার তাগিদে আমি ভেনিশিয়ান ব্লাইণ্ডের রশি ধরে টান দিলাম। মেশিনগানের গুলির শব্দ তুলল জানালার খড়খড়ি, দিনের আলো ঢুকল ঘরে। আমি নীচের রাস্তায় তাকালাম। লোকজন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, দোকানপাট, গাড়ি, সবকিছু কত স্বাভাবিক!

আমার অফিসের চার অনুপ্রবেশকারী একটুও নড়াচড়া করল না। স্রেফ দেখছে আমাকে। আমি ঘরের চারদিকে দ্রুত চোখ বোলালাম। কিছু খুঁজছি যা দিয়ে কিছু একটা করা যাবে।

জন আমার মনের ভাব বুঝতে পারল। বলল, 'তোমার যা-খুশি জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে পারো, রায়হান। এতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে। তারা ভাঙা জানালাটা দেখবে। তুমি জানালায় দাঁড়িয়ে পথচারীদের উদ্দেশে চিৎকারও করতে পারো, রায়হান। তবে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না।' আমাকে ফোনের দিকে তাকাতে দেখে জন বলল, 'ফোন করতে চাইলে করো। আমরা তোমাকে বাধা দেব না। তবে লাইন পাবে না।'

ক্যাথি ঘুরল আমার দিকে, আমার বুকে গুঁজে দিল মুখ, হাত দিয়ে চেপে ধরল কোটের ল্যাপেল। আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ও নিঃশব্দে ফোঁপাচ্ছে।

'তা হলে কীসের জন্য অপেক্ষা করছ?' রাগে জ্বলে উঠল আমার চোখ। 'আমাদেরকে অত্যাচার করবে?'

মুখ বিকৃত করল জন, যেন আমার কথায় আহত হয়েছে। মাথা নাড়ল। 'না, রায়হান। আমরা তোমাদেরকে অত্যাচার করতে আসিনি। তোমাদেরকে আঘাত করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমাদের নেই। তোমরা

আমার বন্ধু! বা বলা যায় বন্ধু ছিলে।' অসহায় ভঙ্গিতে দুই হাত মেলে ধরল সে। 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? আমাদের কিছু করার নেই, রায়হান, শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া। আর তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা যে ব্যাপারটা মেনে নাও। তোমরা না ঘুমানো পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, রায়হান। আর কাউকে জোর করে ঘুম পাড়ানো যায় না।'

জন আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, তারপর যোগ করল। 'তবে না ঘুমিয়েও থাকতে পারবে না। ঘুমের বিরুদ্ধে কিছুক্ষণ হয়তো লড়াই করতে পারবে, তবে অবশেষে...তোমাদেরকে ঘুমিয়ে পড়তেই হবে।'

দরজার সামনে দাঁড়ানো ক্ষুদ্রকায় লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এত কথার দরকার কী? ওদেরকে জেলে পুরে দিলেই হলো। একসময় ঘুমিয়ে পড়বে।'

জন শীতল দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। 'এত কথার দরকার কারণ এরা আমার বন্ধু। তোমার ইচ্ছে হলে বাড়ি চলে যেতে পারো। আমরা তিনজনই যথেষ্ট।'

বেঁটে লোকটা আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল শুধু। কিছু বলল না।

জন সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, হেঁটে এল আমাদের সামনে। তার চেহারায় বেদনা। 'রায়হান, ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো। তোমরা ধরা পড়ে গেছ। এখন আর কিছুই করতে পারবে না। ব্যাপারটা মেনে নাও। ক্যাথির সঙ্গে কথা বলো। ওকে সত্যটা বুঝতে দাও। তোমরা কিছুই টের পাবে না। স্রেফ ঘুমিয়ে পড়বে এবং ঘুম থেকে জেগে দেখবে আগের মতই আছ। খামোকা জোরাজুরি করে লাভ কী?' ঘুরল সে, ফিরে গেল সোফায়।

সতেরো

আমার হাত নড়ছে, ক্যাথির চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, আস্তে আস্তে ম্যাসেজ করে দিচ্ছি ঘাড়, ওকে আরাম দেওয়ার চেষ্টা করছি। অসম্ভব শান্ত লাগছে নিজেকে। আরও কিছুক্ষণ হয়তো সহ্য করতে পারব। তবে বেশিক্ষণ পারব না। ক্যাথিও পারবে না।

জনের দিকে তাকালাম। বসে আছে সোফার কিনারে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রয়েছে। চেহারায় উদ্বেগ। আমি বাডলং-এর দিকে ফিরলাম। 'কীভাবে ঘটল এটা?' আলাপের সুরে জানতে চাইলাম। 'মিলভ্যালির সবাই একযোগে আক্রান্ত হলো—কীভাবে ঘটল?'

জবাব দেওয়ার জন্য মুখিয়ে ছিলেন বাডলং। 'পডগুলো বাতাসে ভেসে চলে আসে এখানে। ওগুলো অন্য কোথাও যেতে পারত। কিন্তু বাইচান্স চলে আসে এখানে। পারনেল ফার্মের আবর্জনার স্তূপের পাশে ঠাঁই করে নেয়। প্রথমেই নকল করে একটা টিনের ক্যান। ওটার মধ্যে একসময় ফলের রস ছিল। তারপর নকল করে কুঠারের ভাঙা কাঠের হাতল। এটা অবশ্য একটা প্রাকৃতিক অপচয় ছিল। তারপর ওগুলো হয় বাতাসে ভেসে গেছে নতুবা লোকে বয়ে নিয়ে গেছে তার বাড়িতে। তারপর মানুষ ডুপ্লিকেট করা শুরু করে তারা। আপনার বান্ধবী শীলা হেনজের চাচা বেজমেন্টে সিডপড রেখেছিলেন। তিনি সেখানে আক্রান্ত হন। তারপর ক্যাথির বাবা—' কথা শেষ করলেন না তিনি।

'প্রথম পরিবর্তনটা ঘটার পর একের-পর-এক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। স্থানীয় গ্যাস এবং ইলেকট্রিক মিটার রিডার চার্লি বুশলজ একই সত্তরজনের রূপান্তর ঘটিয়েছে। দুধঅলা, কাঠমিস্ত্রি এরা একেকজন অপরজনকে সংক্রামিত করেছে। আর কোনও বাড়িতে কারও একজনের রূপান্তর ঘটলে গোটা পরিবার দ্রুত প্রভাবিত হয়ে পড়েছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন প্রফেসর। 'তবে মাঝে মাঝে যে দু-একটা দুর্ঘটনা ঘটেনি এমন নয়। এক মহিলা তার বোনকে দেখল বিছানায় ঘুমাচ্ছে। এক মুহূর্ত পরে–প্রক্রিয়া তখনও শেষ হয়নি, সে তার বোনকে দেখতে পেল গেস্ট রুমের ক্লজিটে। স্বাভাবিকভাবেই ধাক্কাটা সামলাতে পারেনি সে। পাগল হয়ে গেছে। বাচ্চাদের নিয়ে ঝামেলা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলোও এদের চোখ এড়িয়ে যায় না। তবে তাদেরকে ম্যানেজ করা গেছে। আপনার কাজিন শীলা লেন্জ এবং আপনি মিস রেনল্ডস, অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষ। বেশিরভাগ মানুষই পরিবর্তন টের পায় না, কারণ বোঝার কোনও উপায় থাকে না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আপনি একটা পার্থক্যের কথা বলেছেন।'

'তেমন কোনও পার্থক্য আসলে নেই। কোনোকিছুই স্থায়ী নয়।'

'কিন্তু পরিবর্তন হওয়ার পর পরিবর্তিত মানুষটার মধ্যে আসলে কিছুই থাকে না–, বলে চললাম আমি। আপনার মধ্যেও তা নেই, বাডলং। আনন্দ, ভয়, আশা কিংবা উত্তেজনা সবকিছুই আপনার মধ্যে অনুপস্থিত। আপনি এখনও সেই নোংরা থকথকে ধূসর পদার্থটির মধ্যে বাস করছেন, বাডলং। জনি–' আমি মনোবিজ্ঞানীর দিকে ফিরলাম। 'তুমি অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু সাইকিয়াট্রি নামে একটা বই লেখার পরিকল্পনা করেছিলে। ওটার কী হলো? শেষ ওটাকে নিয়ে কবে কাজ করেছ, জনি, আদৌ কি তাকিয়েছ ওদিকে?'

'ঠিক আছে, রায়হান,' শান্ত গলায় বলল জন। 'তুমি তো সবই জানো। আমরা ব্যাপারটা তোমাদের জন্য সহজ করে তুলতে চেয়েছিলাম। আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উত্তেজনা এসব দিয়ে কী হবে? পরিবর্তিত হওয়ার পরেও খাবার তোমার কাছে সুস্বাদু লাগবে, বই পড়তে ভাল লাগবে...'

'তবে লিখতে নয়।' শান্ত গলা আমার। 'লেখার জন্য যে আবেগ দরকার তা আমি নিজের মধ্যে পাব না। ওগুলো সব চলে গেছে, তাই না, জনি?'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না, রায়হান।

তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ জীবন কত সুন্দর হয়ে উঠবে।'

'তবে সেখানে আবেগ বলে কিছু থাকবে না,' গলা চড়ল আমার। 'জনি, তুমি প্রেম করতে পারবে, সন্তান জন্ম দিতে পারবে?'

আমার দিকে তাকাল জন। 'তুমি জানো আমরা তা পারব না, রায়হান।' রাগ রাগ শোনাল ওর কণ্ঠ। 'তুমি সত্যি কথাটা জানো, তবে ব্যাপারটা নিয়ে গোয়ার্তুমি করছ। ডুপ্লিকেশন পারফেক্ট নয়, হতে পারে না। আমরা কেউ বেঁচে থাকব না, রায়হান। সবাই মরে যাব–' হাত নাড়াল সে যেন এটা কোনও ব্যাপার নয়– 'বড়জোর পাঁচ বছরের মধ্যে।

'শুধু মানুষ নয়।' নরম গলায় বললাম আমি, 'জ্যান্ত যা কিছু আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে, তাই না, জনি?'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসল জন। তারপর সিধে হলো। গেল জানালার ধারে। আঙুল দিয়ে দেখাল শেষ বিকেলের আকাশে পাতলা একফালি চাঁদ। দিনের আলোয় ম্লান, নিষ্প্রভ তবে পরিষ্কার চেনা যায়। পাতলা কুয়াশার মেঘ এগোচ্ছে ওটার দিকে। 'চাঁদকে দ্যাখো, রায়হান–মৃত। মানুষ একে নিয়ে পরীক্ষা করার সময় থেকে শুরু করে এ-পর্যন্ত চাঁদের সারফেসের এক তিল পরিবর্তন হয়নি। তোমার মনে কি এ-প্রশ্ন কখনও উদয় হয়নি যে চাঁদে কেন প্রাণ নেই? পৃথিবীর এত কাছে চাঁদ, একসময় এ গ্রহের অংশ ছিল, এ কেন মরে যাবে?'

অল্পক্ষণ চুপ করে থাকল জন। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি আমরা নীরবে। অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করল ও। 'তবে চাঁদ সব সময় মৃত ছিল না। একসময় জ্যান্ত ছিল সে।' ঘুরল জন, ফিরে গেল সোফায়। 'অন্যান্য গ্রহ এ-গ্রহের মত ঘুরে চলেছে প্রাণদানকারী সূর্যের চারপাশে। উদাহরণ হিসেবে মঙ্গলের কথা ধরো।' এক কাঁধ সামান্য উঁচু করল সে। 'এক সময় ওখানে যারা ছিল তারা এখনও মরুর বুকে বেঁচে আছে। আর এখন–পৃথিবীর পালা। সমস্ত গ্রহ ব্যবহার করা হয়ে গেলেও কিছু আসে যায় না। বীজগুটিরা চলতে থাকবে, আবার ফিরে যাবে মহাশূন্যে, ভেসে বেড়াবে–কতদিনের জন্য বা কোথায় যাবে তা বিবেচ্য বিষয় নয়। অবশেষে তারা হাজির হবে–অন্য কোথাও। বাড়লং

বলেছে এগুলো পরজীবী। ব্রহ্মাণ্ডের পরজীবী। ওরাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে।'

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'তোমরা পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার মতলব করেছ?'

হাসল জন, 'আমরা আগে দখল করে নেব এ প্রদেশ। তারপর একে একে ছড়িয়ে পড়ব অন্য রাজ্যগুলোতে। প্রথমে হামলা চালাব উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায়, ওরিগন, ওয়াশিংটনে এবং সর্বশেষ পশ্চিম-উপকূলে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ব। আমরা আগে দখল করে নেব এ মহাদেশ। তারপর বাকি বিশ্ব।'

'বিশ্ব!' নরম গলায় বললাম আমি। তারপর চেঁচিয়ে উঠলাম। 'কিন্তু কেন? ওহ্ মাই গড, কেন।'

জবাব দিলেন বাডলং। রেগে গেলেও চেহারা দেখে বোঝা গেল না। 'ডক্টর, আপনি আমাদের কথা দেখছি কিছুই বুঝতে পারেননি। আপনার মাথাতেই ঢোকেনি বিষয়টা। আমি আপনাকে কী বললাম? আপনি কাজ করেন কেন? কী কারণে? আপনি কেন শ্বাস নেন, খাবার খান, ঘুমান, প্রেম করেন এবং সন্তান জন্ম দেন? কারণ, এটা আপনার ফাংশন বা কর্তব্যকর্ম। আপনি মানুষ বলে এসব করেন। অন্য কোনও কারণ নেই।' আবার মাথা নাড়লেন তিনি আমি তাঁর কথা বুঝতে পারিনি বলে, 'প্রকৃতির নিয়মে এটা হয়ে আসছে। আমাদেরকেও নিজেদের কাজ করে যেতে হবে। কারণ আমরা তা করতে বাধ্য। এবারে বুঝতে পেরেছেন?'

বুঝলাম আমি। ওদের কথা মেনে না নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবে হাল ছেড়ে দিতে মন চাইছে না। কিছু একটা করা দরকার। আর সেজন্য কিছুক্ষণের জন্য হলেও একা থাকতে হবে আমাদের।

'জনি,' বললাম আমি–'তুমি বললে একসময় আমরা বন্ধু ছিলাম। আমরা কেমন বন্ধু ছিলাম নিশ্চয় মনে আছে তোমার।'

'অবশ্যই, রায়হান।'

'তবে সেই অনুভূতি তোমার মধ্যে এখন আর কাজ করে কি না জানি না। তবু যদি বন্ধুত্বের স্মৃতি সামান্যও মনে থাকে তোমার, সে

দাবিতে বলছি, আমাদের একটু একা থাকতে দাও। আমাদেরকে এখানে আটকে রেখো। বাইরে তোমরা পাহারা বসিয়ো। তবু একটু একা থাকতে দাও। তোমরা আমাদের দিকে সারাক্ষণ চেয়ে থাকলে ঘুমাব কীভাবে? আমাদেরকে এখানে তালা মেরে রেখে হলঘরে অপেক্ষা করো। আমরা অন্তত শেষ মুহূর্তটুকু বেঁচে থাকার আনন্দ উপভোগ করতে চাই।'

জন তাকাল বাডলং-এর দিকে। বাডলং মাথা ঝাঁকিয়ে দিলেন। চেট মিকারের দিকে ফিরল জন। সে শুধু কাঁধ ঝাঁকাল। তবে দরজায় দাঁড়ানো বেঁটে মানুষটির কাছে কিছু জানতে চাওয়া হলো না। 'ঠিক আছে, রায়হান,' বলল জন। 'তোমার অনুরোধ রক্ষা করা হলো।' সে বেঁটে লোকটার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। লোকটা হলওয়েতে চলে গেল। জন আমার অফিসের ভারী কাঠের দরজার তালা খুলল। লাগাল। আবার খুলল। কপাট মেলে ধরল আমাদেরকে ভিতরে যেতে দেওয়ার জন্য।

ধীরগতিতে আমাদের পেছনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজা, আমি একঝলক দেখতে পেলাম বেঁটে লোকটা হলওয়ে থেকে রিসেপশনে ফিরে আসছে হাতে দুটো প্রকাণ্ড বীজগুটি নিয়ে। বীজগুটির আড়ালে তার শরীর প্রায় ঢাকা পড়েছে। তারপর বন্ধ হয়ে গেল আমাদের দরজা, তালা লাগানোর শব্দ পেলাম। হালকা কিছু একটা ঘষা খেল দরজায়। বুঝতে পারলাম মেঝেতে বন্ধ-দরজার সামনে রাখা হয়েছে। আমাদের খুব কাছে, তবে নাগালের বাইরে।

আঠারো

ক্যাথির হাত তুলে নিলাম আমার হাতের মুঠোয়, শক্ত করে ধরে থাকলাম। আমার দিকে তাকাল ও, হাসার চেষ্টা করল। আমার ডেস্কের সামনে বড় চামড়ার চেয়ারটাতে বসিয়ে দিলাম ওকে। আমি বসলাম

চেয়ারের হাতলে। ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে রইলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলাম দু'জনে। সে রাতের কথা মনে পড়ছে—অল্প কদিন আগে ক্যাথি আমার বাড়ি এসেছিল শীলার ব্যাপারে কথা বলতে। এই একই ড্রেস পরনে ছিল ওর সেসময়। সিল্কের লম্বা হাতের জামা, তাতে লাল-ধূসর ছাপা। ওকে দেখে কী খুশি হয়ে উঠেছিলাম মনে পড়ল। হাইস্কুলে অল্প কদিন মাত্র ডেট করলেও ওকে কখনোই ভুলতে পারিনি আমি। আমি এখন অনেক কিছু বুঝতে পারছি যা আগে বুঝতে পারিনি। 'আই লাভ ইউ, কেট,' বললাম আমি। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল ও, তারপর আমার বাহুতে এলিয়ে দিল মাথা।

'আই লাভ ইউ, রায়হান।'

বন্ধ দরজার পেছনে একটা শব্দ হলো। পাতার খসখসে আওয়াজ। বুঝতে পারলাম শব্দটা কীসের। চট করে একবার তাকালাম ক্যাথির দিকে। ও শুনতে পেয়েছে কি না জানি না। পেলেও চেহারায় ভাব ফুটে উঠতে দেখলাম না।

'আমাদের বিয়ে করা উচিত ছিল, কেট। এখন বিয়ে করতে পারলেও বেশ হত।'

'আমারও তাই মনে হয়।' আমাদের পেছনের দরজা থেকে কটকট একটা শব্দ হলো। সিধে হলাম আমি, ছোট অফিসঘরে আত্মরক্ষা করা যায় এরকম কিছু একটা খুঁজলাম। ডেস্কের ড্রয়ার খুললাম: প্রেসক্রিপশন প্যাড, ব্লটার, সেলুলয়েড ক্যালেণ্ডার কার্ড, পেপার ক্লিপ, রাবার ব্যাণ্ড, ভাঙা একটা ফরসেপ, পেন্সিল, একজোড়া ফাউন্টেন পেন, একটা ইমিটেশন-ব্রোঞ্জ লেটার ওপেনার। ওপেনারটা তুলে নিলাম, ড্যাগারের ভঙ্গিতে চেপে ধরলাম হাতল। তারপর ফালতু জিনিসটা রেখে দিলাম ড্রয়ারে।

ঘরের এককোণে ইন্সট্রুমেন্ট কেবিনেট: ওখানে রয়েছে সার বাঁধা স্টেইনলেস স্টিল ফরসেপ, স্ক্যালপেল, হাইপডারমিক সুচ, কাঁচি, ডিসইনফেকট্যান্ট, অ্যান্টিসেপটিক ইত্যাদি। ছোট্ট ফ্রিজে পেলাম সেরাম, ভ্যাকসিন আর অ্যান্টিবায়োটিক।

ক্যাথির দিকে ফিরলাম কিছু একটা বলার জন্য। ধক্ করে উঠল বুক, হৃৎপিণ্ড বাড়ি খেতে লাগল পাঁজরে। দুই বিদ্যুৎগতি পদক্ষেপে ওর চেয়ারের সামনে চলে এলাম আমি, কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিলাম জোরে। চোখ মেলল ক্যাথি।

'ওহ্, রায়হান–আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' আঁতকে উঠল ও।

ডেস্কের বামদিকের নীচের ড্রয়ারে বেনজেড্রাইন ট্যাবলেট পেয়ে গেলাম। ওয়াশরুমে গিয়ে নিয়ে এলাম এক গ্লাস জল। ক্যাথিকে একটা ট্যাবলেট দিলাম। ছোট বোতলটার দিকে একবার তাকিয়ে ওটা পকেটে রেখে দিলাম। খেলাম না ট্যাবলেট। আরও কিছুক্ষণ জেগে থাকতে পারব আমি ট্যাবলেট না-খেয়েই।

আমি ডেস্কে বসলাম, গ্লাসটপে কনুই, গালের নীচে মুঠো-করা হাত। ক্যাথি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। লক্ষ রাখছে যাতে ঘুমিয়ে না পড়ি।

সময় বয়ে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে খসখসে শব্দটা হতে লাগল দরজার পেছনে। দুজনেই শুনতে পেলাম। তবে কেউই তাকালাম না ওদিকে। আমি নিজের জায়গায় বসে রইলাম। দানব পডগুলোকে নিয়ে ভাবছি।

একটু পর ধীরে ধীরে মুখ তুললাম। ডেস্কের ওপাশে, লেদার চেয়ারে ক্যাথি বসে আছে চুপচাপ। সতর্ক চোখ আমার দিকে। ট্যাবলেট খাওয়ার কারণে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে চোখ।

'তুমি কী ভাবছ, রায়হান?'

'জানি না। সম্ভবত কিছুই না। ভাবছিলাম হারামজাদা পডগুলোকে কীভাবে ধ্বংস করা যায়। তবে পারব কি না জানি না। একটা ধ্বংস করলে ওরা দশটা পড নিয়ে আসবে। ওরা আমাদেরকে এখান থেকে কোথাও নিয়ে যাবে।'

'তবে ওদের কাছে এ মুহূর্তে দরজার বাইরের পডদুটো ছাড়া আর কোনও পড আছে বলে মনে হয় না,' বলল ক্যাথি। 'আমার ধারণা বাকি পডগুলো ওরা ইতিমধ্যে ব্যবহার করে ফেলেছে। হয়তো ওই দুটোই–' দরজার দিকে ইঙ্গিত করল ও–'জো গ্রিমাল্ডির ট্রাকে দেখা

শেষদুটো পড।'

'পড আরও জন্মাচ্ছে,' হতাশ ভঙ্গিতে হাতের তালুতে ঘুসি মারলাম। 'আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ওরা আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বেরুবার সময় আমরা পালাব।'

ক্যাথি বলল, 'তুমি ওদেরকে ঘায়েল করে পালাতে পারবে? নিককে যেভাবে–'

মাথা নাড়লাম আমি। 'আমাদেরকে বাস্তব নিয়ে ভাবতে হবে, কেট। এটা সিনেমা নয়। আমি সিনেমার নায়কও নই। না, আমি চারজনের সঙ্গে পেরে উঠব না। এমনকী একজনকেও হয়তো ঘায়েল করা সম্ভব হবে না। জনির সঙ্গেই পেরে উঠব কি না সন্দেহ আছে। আর চেট মিকার তো আমাকে খালি হাতেই দু'টুকরো করে ফেলার শক্তি রাখে। তবে প্রফেসর এবং বেঁটে লোকটাকে হয়তো কব্জা করা যাবে,' ভাবলাম আমি। তারপর সিরিয়াস গলায় বললাম, 'আমি জানি না এখান থেকে বের হওয়ার সম্ভাবনা আদৌ আছে কি না।'

রিসেপশন রুমের দরজা ইঙ্গিতে দেখালাম। 'এ মুহূর্তে, বাডলং-এর কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, ওই জিনিসগুলো ওখানে প্রস্তুত হচ্ছে। আমাদের রক্ত মাংস, টিস্যু, মজ্জা সবকিছু শুষে নিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা ঘুমিয়ে পড়লেই আমাদের শরীর হয়ে উঠবে নিরাপত্তাহীন। ওরা তখন আমাদেরকে গ্রাস করবে। তবে–।' ক্যাথির দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করলাম। 'একটা উপায় আছে। পডদুটোকে ফাঁকি দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। ধরো একটা বিকল্প তৈরি করলাম আমরাঃ ফ্রেড ও তার গার্লফ্রেণ্ড।'

ভুরু কোঁচকাল ক্যাথি। বুঝতে পারেনি আমার কথা। আমি আমার ডেস্কের পেছনের ওয়াল ক্লজিটের দিকে হাত বাড়ালাম। খুলে ফেললাম দরজা। 'কঙ্কাল।' ক্লজিটে দাঁড়িয়ে আছে কঙ্কালদুটো দাঁত বের করে। এদেরকে এখানেই রাখি আমি। এরপর দ্রুত এবং উত্তেজিত হয়ে উঠল আমার কথা বলার ভঙ্গি। 'এগুলোর হাড়ের কাঠামো রয়েছে, এরা মানুষ এবং এরা সম্পূর্ণ! আর বাডলং-এর কথা অনুযায়ী ওদের শরীরে এখনও

পরমাণু রয়েছে। ফোর্স লাইনের একই ধরনের প্যাটার্ন। ওখানে আছে ওরা–ঘুমাচ্ছে। আমাদের বদলে এদের শরীর কপি করতে দেব।'

আমি ক্লজিট থেকে নামিয়ে আনলাম কঙ্কালদুটোকে। প্রথমটা পুরুষ, ওটাকে বন্ধ রিসেপশন-রুমের দরজার সামনে নিয়ে গেলাম। শুইয়ে দিলাম মেঝেতে। উপুড় করা রইল যাতে বিকট হাসির মুখটা দেখতে না হয়। এরপর মহিলা কঙ্কালটাকে শুইয়ে দিলাম তার সঙ্গীর পাশে।

কঙ্কালদুটোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। তারপর দেয়ালের ইন্সট্রুমেন্ট কেবিনেটের দিকে ঘুরলাম। সাবধানে খুললাম কাচের দরজা, বের করে নিলাম ২০ সিসির একটি সিরিঞ্জ। ক্যাথির শিরায় সিরিঞ্জ ফুটিয়ে ২০ সিসি রক্ত নিলাম। তারপর রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার আগেই মহিলা কঙ্কালটার কণ্ঠা এবং পাঁজরের হাড়ে ছিটিয়ে দিলাম রক্ত। আমি নিজের বাহুতে সিরিঞ্জ ফুটিয়ে আরও ২০ সিসি রক্ত নিলাম। বাকি কঙ্কালটার গায়ে রক্ত ছিটানোর জন্য ঝুঁকলাম।

'রায়হান, না, না।'

মুখ তুলে দেখি মাথা নাড়ছে ক্যাথি, বিস্ফারিত চোখ, চেহারা বিবর্ণ। তবে থামলাম না আমি। ছিটিয়ে দিলাম রক্ত।

'রায়হান, প্লিজ; আমি আর সহ্য করতে পারছি না; ওরা এমন ভাবে তাকিয়ে আছে। প্লিজ, আর না!'

সিধে হলাম আমি, ঘুরলাম ওর দিকে। 'ঠিক আছে'–মাথা ঝাঁকালাম। 'জানি না এতে কাজ হবে কি না।'

আমি আরেকটা কাজ করলাম, ক্যাথিকে না-জানিয়েই। ডেস্ক থেকে কাঁচি নিয়ে ওর অজান্তে ওর একগোছা চুল কেটে নিলাম। তারপর আমার নিজের চুল কাটলাম। চুলগুলো ছড়িয়ে দিলাম মেঝেতে শুয়ে থাকা কঙ্কাল দুটোর গায়ে। এখন আমাদের প্রতীক্ষার প্রহর গোনা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই।

আমরা বসলাম। ক্যাথি তার চামড়ার চেয়ারে, আমি ডেস্কে। তারপর কথা বলতে শুরু করল ক্যাথি। ধীরে ধীরে, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে, মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে। একটা বুদ্ধি

এসেছে ওর মাথায়। সেটার কথাই বলছে।

আমি ওর কথা শুনে গেলাম। থামল ক্যাথি। আমার জবাবের অপেক্ষা করছে। আমি হেসে মাথা ঝাঁকালাম, চেহারায় হতাশ ভাব ফুটতে দিলাম না। 'কেট, এতে-এতে হয়তো কাজ হতেও পারে। তবু মনে হয় না এতগুলো লোকের সঙ্গে একা পেরে উঠব। নিজেকে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকতে দেখছি। আমার গায়ের ওপর ওরা দুই-তিনজন।'

ক্যাথি বলল, 'তুমি এখন সিনেমার মত ভাবছ। বেশিরভাগ মানুষ মাঝে মাঝে এরকম চিন্তা করে। রায়হান, কিছু কিছু কাজ আছে মানুষকে কখনোই করতে হয় না। তারা কল্পনার চোখে দেখে অমুক তমুকের সঙ্গে মারামারি করছে। তুমিও তেমনটি এখন দেখছ-দুই-তিনজনের সঙ্গে মারামারি করছ। রায়হান, তোমার এই কল্পনায় আমার জায়গা কোথায়? তুমি দেখতে পাচ্ছ আমি দেয়ালের গায়ে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ভয়ে থরথর করে কাঁপছি।'

ও ঠিকই বলেছে। আমি আসলে তেমনটিই ভাবছিলাম।

মাথা দোলাল ক্যাথি। 'ওরাও তাই ভাববে; এ-ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণ একটা মেয়ের ভূমিকা এমনটিই হবে। আমিও ঠিক তাই করব-যতক্ষণ পর্যন্ত না জানব ওরা আমাকে লক্ষ করছে। তারপর তুমি যা করবে আমি তাই করতে পারব। পারব না কেন?'

আমার ভয় লাগছে। ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না মোটেই। এটা বাস্তব। এটা এখন জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে জুৎসই কোনও পরিকল্পনা করার সময় এখন নেই।'

'রায়হান, এসো!' ফিসফিস করল ক্যাথি। আমার শার্টের আস্তিন ধরে টানছে।

আমার অফিসের দরজায় টুকটুক শব্দ হলো। জন ফিসফিসিয়ে ডাকল, 'রায়হান?' একটু বিরতি। 'রায়হান...?'

'দুঃখিত, জনি,' জোরে বললাম আমি। 'এখনও জেগে আছি আমরা। ঘুম আসছে না। জানোই তো যতক্ষণ সম্ভব জেগে থাকার চেষ্টা করব। তবে বেশিক্ষণ বোধহয় জেগে থাকতে পারব না।'

জবাব দিল না সে। আমি হেঁটে ওয়াল কেবিনেটের সামনে গেলাম। অ্যাডহেসিভ টেপের বড় একটা রোল বের করলাম। ইন্সট্রুমেন্ট কেবিনেট থেকে যা যা দরকার নিয়ে নিলাম। তারপর কাজ শুরু করে দিলাম।

কাজ শেষ হতে বেশি সময় লাগল না। মিনিট চারেক। আমি শার্টের আস্তিনের ভাঁজ খুলছি, ক্যাথি তার পোশাকের বোতাম লাগাচ্ছে, ইশারা করল–। 'রায়হান, দেখো।'

ঘুরে তাকালাম। সরু হয়ে এল চোখ দৃশ্যটা দেখে। মেঝেতে পড়ে থাকা হলদে সাদা রঙের হাড়ের কাঠামো দুটোকে একটু অন্যরকম লাগছে। জানি না কীভাবে, তবে কোনোই সন্দেহ নেই পরিবর্তন ঘটেছে ওগুলোর মধ্যে।

হাড়গুলো আর নিরেট এবং শক্ত মনে হচ্ছে না। হঠাৎ দেখলাম একটা কঙ্কালের গায়ে ধূসর কী একটা জড়িয়ে গেল। ধূসর জিনিসটা আকারে ক্রমে বড় হতে লাগল, ঢেকে ফেলছে হলদে-সাদা হাড়। এরপর কার্টুন ছবির মত দ্রুতগতিতে ঘটতে লাগল সবকিছু। দুটো কঙ্কালের গা অবিশ্বাস্য গতিতে ধূসর একটা পদার্থ ঢেকে ফেলল। ঢাকা পড়ল পাঁজরের হাড়। এরপর স্রেফ ধূসর থকথকে একটা জিনিস পড়ে থাকতে দেখলাম মেঝেতে। আর কিচ্ছু না।

হাঁ করে ওদিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি, তারপর বুক দিয়ে যেন সমস্ত বাতাস বেরিয়ে এল আমার, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলাম, 'জনি!'

আমার অফিসের হলওয়ের দরজা সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল। দ্রুত চলে এল ওরা–চেহারা অস্বাভাবিক শীতল। পকেট থেকে চাবি বের করল জন, রিসেপশন রুমের দরজা খুলছে। কপাট খুলল ও, শক্ত কিছুর সঙ্গে বাড়ি লাগল। ধাক্কা দিল জন। আরেকটু খুলল কপাট, তারপর আটকে গেল কিছুর সঙ্গে। তারপর অর্ধেক-বন্ধ দরজা দিয়ে দ্রুত ভেতরে ঢুকল।

বাদামি কার্পেটে শুয়ে আছে দুটো কঙ্কাল। লালচে রঙ কাঁধে, হাড় ফুঁড়ে লোম বেরিয়ে আছে। বিকট ভঙ্গিতে হাসছে। যেন মস্ত মশকরা

করা হয়েছে ওদের সঙ্গে। কঙ্কালদুটোর পাশে এবং পেছনে প্রকাণ্ড পডদুটোর ভগ্নাংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

জন বারবার ডানে-বামে মাথা নাড়ল, ঠোঁট কামড়াচ্ছে। ভাবছে। বাডলং বললেন, 'অদ্ভুত ব্যাপার তো–খুবই অদ্ভুত ব্যাপার।'

'ঠিক আছে, রায়হান,' আমার দিকে তাকাল জন বিস্মিত দৃষ্টিতে। 'তোমাদেরকে এখন সেলে ঢোকানো ছাড়া আর উপায় রইল না।'

আমি শুধু মাথা ঝাঁকালাম। সবাই হলওয়ের দিকে এগোলাম। হলওয়ে থেকে ধাতব ফায়ার ডোরের সামনে চলে এলাম। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম।

উনিশ

আমাদের সামনে চেট মিকার আর বেঁটেখাটো মানুষটা। ক্যাথি আর আমি মাঝখানে, আমাদের ঠিক পেছনে জন এবং বাডলং। ল্যাণ্ডিং-এ পা রাখলাম, অর্ধ-বৃত্ত করে নামছি আমরা। বাঁটকুলের সিঁড়ির রেইলিং-এ হাত, চেট মিকার চলে এল তার পাশে। আমি হঠাৎ এক কদম সামনে বাড়লাম, ঠিক ওদের পেছনে চলে এলাম, কনুইয়ের ধাক্কায় ক্যাথিকে সরিয়ে দিলাম একপাশে। দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম এতক্ষণ। এবার বিদ্যুৎগতিতে পকেট থেকে বের করে আনলাম হাত। আমার হাতের মুঠোয় ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, ওদের দুজনের পাছায় গেঁথে দিলাম সুচ, শরীরে ঢুকিয়ে দিলাম ২ সিসি পরিমাণ মরফিন।

যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে পাঁই করে ঘুরল ওরা। আর তখন আমার পিঠের ওপর আছড়ে পড়ল জন এবং বাডলং। আমি দড়াম করে পড়ে গেলাম ইস্পাতের মেঝেতে। হাতের সুচ নিয়ে ওদেরকে যত্রতত্র আঘাত করে চললাম, সেইসঙ্গে শুয়ে থাকা অবস্থায় চলল লাথি। তবে চারজনের বিরুদ্ধে আমি একা বেশিক্ষণ পেরে উঠলাম না। এক লাথি খেয়ে আমার হাত থেকে একটা সিরিঞ্জ উড়ে গেল। আরেকটা সিরিঞ্জ

জুতোর চাপে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেল। ওরা আমার একটা হাত আর একটা পা চেপে ধরল। আমি মুক্ত হাতটা দিয়ে সমানে ঘুসি চালিয়ে যেতে লাগলাম। ক্যাথিকে দেখলাম, ওরাও দেখল—সাদা কংক্রিটের দেয়ালের কোণে সেঁধিয়েছে, পুরুষদের বেমক্কা লাথি বা ঘুসি যাতে খেতে না হয় সে চেষ্টা করছে। ভয়ে কাঁপছে ক্যাথি। বিস্ফারিত চোখ। দু'হাতে ঢেকে রেখেছে মুখ। আমি মেঝেতে শুয়ে ধস্তাধস্তি করছি, দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আমাদের ঘোঁতঘোঁত ফোঁসফোঁস নিশ্বাস, ক্যাথির আঙুল—এখনও মুখের ওপর হাত, বিস্ফারিত চোখ—বিদ্যুৎগতিতে খুলে ফেলল জামার বোতাম। অ্যাডহেসিভ দিয়ে আটকানো দুটো সিরিঞ্জ চোখের পলকে চলে এল ওর হাতে, সাঁৎ করে সামনে বাড়ল, বাডলং এবং জন ঝুঁকেছে আমার হাত মুচড়ে ধরার জন্য, ওদের নিতম্বে সুঁইজোড়া ঢুকিয়ে দিল ক্যাথি। কাতরে উঠল ওরা। ফিরল ক্যাথির দিকে। ক্যাথি সিরিঞ্জ জোড়া ততক্ষণে পকেটে ভরে ফেলেছে। তাই ওরা বুঝতে পারল না আঘাতটা কোত্থেকে এসেছে। তবে ক্যাথি কিছু একটা করেছে বুঝতে পারল ওরা। কটমট করে তাকাল ক্যাথির দিকে। ওকে কিছু বলতে যাবে, আমি ভাঁজ করে ফেললাম হাঁটু, সিধে হতে যাব, দেখে ফেলল জন এবং বাডলং। ক্যাথিকে ছেড়ে আমার ওপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ আমরা ধস্তাধস্তি করেছি বলতে পারব না। হঠাৎ চেটে মিকার হাঁটু ভেঙে দড়াম করে পড়ে গেল সিঁড়িতে। গড়াতে গড়াতে পড়ে গেল সিঁড়ির নীচে। এরপর বেঁটে মানুষটার শরীরের সমস্ত শক্তি যেন হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। সে-ও হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল, বাড়ি খেল দেয়ালে, ওখানে বসে রইল বোকার মত। চোখ পিটপিট করছে। নড়াচড়ার শক্তি নেই।

বাডলং আমার দিকে তাকালেন, কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছেন, তিনিও হাঁটু ভাঙা 'দ' হয়ে পড়ে থাকলেন ইস্পাতের মেঝেতে। বিড়বিড় করে কী বললেন, শুনতে পেলাম না। জন দু'হাত দিয়ে ইস্পাতের সরু রেইলিং ধরে রেখেছিল, তার মাথাটা ঝুঁকে এল মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের ওপর। আস্তে আস্তে বসে পড়ল সে মেঝেতে, সেজদা করার

ভঙ্গিতে পিঠ ভেঙে বসে রইল।

আমরা ছুটলাম। তবে বেশি জোরে নয়। পিচ্ছিল মেঝেতে পিছলা খেয়ে হাত-পা ভাঙার সম্ভাবনা আছে। ভবনের ধাতব ব্যাকডোরে জোরে ধাক্কা দিলাম। খুলল না। তালা মারা।

ভবন খালি। নিস্তব্ধ। এখন ফিরে গিয়ে লবি থেকে বেরুতে হবে। লবি পার হলেই থ্রকমর্টন স্ট্রিট। ক্যাথিকে বললাম, 'তুমি চোখে ফাঁকা দৃষ্টি ফুটিয়ে রাখবে। চোখ থাকবে বড় বড়। তবে আবার অতিরিক্ত অভিনয় করতে যেয়ো না।' দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম। নেমে এলাম থ্রকমর্টন স্ট্রিটে, মৃত মিলভ্যালির জনমানুষের ভিড়ে ঢুকে পড়লাম।

পাঁচ কদম না এগোতেই আমার বয়সী এক লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একসঙ্গে হাইস্কুলে পড়েছি। আমি চেহারায় উদাস একটা ভাব ফুটিয়ে রাখলাম। লোকটার দিকে তাকিয়ে মৃদু মাথা ঝাঁকালাম, যেন চেনা-চেনা লাগছে কিন্তু ঠিক চিনতে পারছি না। সেও একইভাবে মাথা ঝাঁকাল। ক্যাথির হাত আমার বগলের নীচে। টের পেলাম কাঁপছে। এক মোটাসোটা, বেঁটে মহিলাকে পাশ কাটালাম। হাতে শপিং ব্যাগ। আমাদের দিকে তাকাল না সে। কয়েক হাত সামনে, পার্ক করা একটা গাড়ির সামনের সিটে বসা ইউনিফর্ম পরা এক পুলিশ বেরিয়ে এল। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। এর নাম স্যাম পিঙ্ক।

আমি ওকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করলাম না কিংবা কোনোরকম ইতস্তত ভঙ্গিও করলাম না। সোজা তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। 'হ্যালো, স্যাম,' ম্রিয়মাণ গলায় বললাম আমি। 'এখন আমরা তোমাদের দলে। অবশ্য ব্যাপারটা তেমন খারাপ লাগছে না।' মাথা ঝাঁকাল সে, তবে কুঁচকে আছে ভুরু, গাড়ির রেডিওর দিকে তাকাল একবার। 'আমাদেরকে তো খবর দেওয়ার কথা ছিল,' বলল সে। 'কোয়েলসের থানায় ফোন করার কথা। তারপর আমাদের ফোন করবে।'

'জানি আমি,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম। 'ও ফোন করেছিল, তবে লাইন ব্যস্ত পেয়েছে; এখন আবার ফোন করছে।' আমি আমাদের পেছনে অফিস বিল্ডিঙের দিকে ঘুরে ইঙ্গিত করলাম।

স্যামের মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধির ঘাটতি আছে। আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমার কথাগুলো নিয়ে ভাবছে। আমি ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে থাকলাম ওর দিকে। বিরতিকে আলোচনার পরিসমাপ্তি ধরে নিয়ে বললাম, 'দেখা হবে, স্যাম।' ক্যাথির হাত শক্ত করে ধরে হাঁটা দিলাম।

পেছন ফিরে তাকালাম না একবারও। জোরে কিংবা আস্তে হাঁটার চেষ্টাও করলাম না। রাস্তার বাঁকে চলে এলাম, মোড় নিলাম ডানে। ঘোরার সময় দেখলাম স্যাম পিঙ্ক অফিস ভবনের দিকে যাচ্ছে। তারপর দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

এবার দৌড় দিলাম আমরা। দু'পাশে ছোট ছোট ঘরাবাড়ি, মাঝখানে রাস্তা। ছোটার সময় এক বুড়ির সঙ্গে অল্পের জন্য ধাক্কা লাগল না। চিনি আমি বুড়িকে, মিসেস ওয়ার্থ। বুড়ি ট্রাফিক পুলিশের ভঙ্গিতে একহাত উঁচু করে থামতে বলল আমাদেরকে। অভ্যাসের বশে থেমে গেলাম দু'জনে। বুড়িকে ইচ্ছে করলে এক ঘুসিতে মাটিতে ফেলে দিতে পারতাম। কিন্তু ছোটখাটো, বৃদ্ধ মানুষটিকে আঘাত করতে সায় দিল না মন। তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম একপাশে। বুড়ি ওতেই প্রায় ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল রাস্তায়।

আমরা একটা নুড়িপাথর বিছানো রাস্তায় চলে এলাম। এটা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের মাঝ দিয়ে চলে গেছে। বড়বড় ঝোপঝাড় আর গাছপালার কারণে রাস্তা থেকে আমাদেরকে দেখতে পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই।

ছুটতে গিয়ে ক্যাথি একপাটি জুতো হারিয়েছে। নুড়ি পাথরের রাস্তায় শুকনো ডালপালা, ধারালো পাথর, শিকড়বাকড়ে লেগে আমাদের পা কেটে গেল। কিন্তু আমরা চলায় বিরতি দিলাম না।

আমাদের পালাবার সুযোগ নেই। আমি এ শহরের প্রতিটি রাস্তাঘাট, বন-বাদাড়, পাহাড়-পর্বত চিনি। ওরাও চেনে। পালাবার রাস্তা একটাই—হাইওয়ে ১০১। কিন্তু ও-পর্যন্ত আদৌ পৌঁছুতে পারব কিনা জানি না। কারণ আমাদের পালাবার খবর ইতিমধ্যে জানান দেওয়া হয়ে গেছে। শুনতে পেলাম শহরের ফায়ার সিগনাল বাজতে শুরু করেছে।

মিলভ্যালিতে সাইরেন ব্যবহার করা হয় না, কান ফাটানো এয়ারব্লাস্ট সিগনাল ব্যবহার করা হয়। জাহাজের ফগহর্নের মত আওয়াজ। একটু পরপর পিলে চমকে দিয়ে বাজতে শুরু করল সিগনাল। আমাদের কান ফেটে যেতে চাইল। আমরা অন্ধের মত, অসহায়ের মত ছুটতে লাগলাম।

আমি জানি লোকে গাড়ি নিয়ে আমাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। ঘরবাড়ি ছেড়ে অনেকেই বেরিয়ে পড়েছে আমাদেরকে ধরার জন্য। পাহাড়ের আনাচে-কানাচে খুঁজছে তারা আমাদেরকে।

পাহাড়ের মাথার ডানদিকে ঝপ করে নেমে গেছে ঢাল, ওদিকে বিরাট একটা মাঠ। মাঠে কোমর-সমান আগাছা, ঝোপঝাড়। ওই ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লে পাহড়চুড়োয় খুঁজতে আসা লোকজন আমাদেরকে দেখতে পাবে না। তবে মাঠে একটানা হাঁটতে গেলে শিকারীর কবলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট।

ক্যাথির হাত ধরে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি। শেষে ঠিক করলাম যা থাকে কপালে মাঠেই ঢুকে পড়ব। ক্যাথিকে বললাম কথাটা। তারপর ঢাল বেয়ে নেমে পড়লাম মাঠে।

বিশ

মাঠে শুয়ে আছি আমরা–স্থির। আমরা পেছনে কোনও চিহ্ন রেখে আসিনি তবে ওরা যে আমাদের খোঁজে নেমে পড়েছে তার প্রমাণ পেয়েছি কিছুক্ষণ আগে একটা কণ্ঠ শুনে। কণ্ঠ শুনে মনে হয়েছে আমার পরিচিত একজন, আল। তার সঙ্গে আরও একজন ছিল। ঝোপের মধ্যে কিছুক্ষণ খচমচ আওয়াজ শুনলাম। তারপর শব্দটা মিলিয়ে গেল দূরে।

আমরা পাথর হয়ে শুয়ে আছি মাটিতে। নড়াচড়া একদম বন্ধ। মাঝে মাঝে মানুষের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিঃ মাঠের এদিকে, আবার দূরে। আমরা যে মাঠে শুয়ে আছি, টের পেলাম দু'জন লোক আসছে

এদিকেই। ক্রমে উচ্চকিত হয়ে উঠল তাদের কণ্ঠ, তারপর আমাদের প্রায় কাছ ঘেঁষে চলে গেল, ত্রিশ হাতও হবে না দূরত্ব। ভয়ে এমন আধমরা হয়ে গেছি, ওরা কী বলছিল সেদিকে মনোযোগ দিতে পারিনি। বহুবার বেশ দূর থেকে ভেসে এল গাড়ির হর্ন আর সিগনালের লম্বা কান ফাটানো আওয়াজ।

অনেকক্ষণ শুয়ে থাকলাম আমরা। মাটি থেকে ঠাণ্ডা ভাব বেরুচ্ছে, শীতে জমিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে। বুঝতে পারছি শেষ হয়ে আসছে দিনের পালা।

ক্যাথি আর আমি অন্ধকার পুরোপুরি ঘনিয়ে না-আসা পর্যন্ত শুয়ে থাকলাম মাটিতে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাড় পর্যন্ত জমে গেছে, যাতে শব্দ না হয় সেজন্য দাঁতে দাঁত চেপে আছি। ব্যথা হয়ে গেছে চোয়াল। অবশেষে প্রচণ্ড আড়ষ্ট শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, পায়ের ওপর ওজন চাপাতে পারছি না, থরথর করে কাঁপছি। অন্ধকারে অবশ্য খানিকটা সুবিধা হয়েছে। আট-দশ হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। অন্ধকারে আমাদেরকে কেউ দেখতে পাবে না, গা ঢাকা দিয়ে চলতে পারব। কুয়াশার চাদর ঢেকে দিচ্ছে আকাশ এবং মাঠ। তবে মাথার ওপর ফকফকে আলো বিলোচ্ছে চাঁদ। ফাঁকা মাঠে হাঁটতে গেলেই দেখে ফেলবে কেউ। আমি জানি ওরা আবার আসবে। প্রতিটি নারী, পুরুষ এবং কিশোর সংগঠিত হয়ে আমাদের খোঁজ করছে। ওরা জানে আমরা হাইওয়ে ১০১-এর দিকে যাব। সেজন্য ওরা নিশ্চয় প্রস্তুত হয়ে আছে।

এ মাঠ থেকে বেরুনো যাবে না বেশ বুঝতে পারছি। তবে হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না। বাঁচার সামান্যতম সুযোগও কাজে লাগাতে হবে।

আমরা অন্ধকার মাঠে হাঁটা শুরু করলাম। ক্যাথি আমার একটা হাত জড়িয়ে আছে। একঘণ্টায় মাইলখানেক রাস্তা পার হলাম। আশার একটা ভ্রম তৈরি হলো আমার মধ্যে। মনের পর্দায় মানচিত্রের মত যেন দেখতে পেলাম সামনে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে। দেখলাম আমরা হাইওয়েতে পৌঁছে গেছি, হাত তুলে থামিয়েছি গাড়ি, উঠে পড়েছি গাড়িতে।

আমরা চলতে লাগলাম। আরও আধঘণ্টায় আধমাইল পার হলাম। এদিকে আর একটা মাত্র পাহাড়। ঢাল বেয়ে নামতে লাগলাম। ঢাল মিশেছে চওড়া খালি একটা জমিনের সঙ্গে। কিছুক্ষণ পর কুয়াশার ফাঁক দিয়ে মুখ বের করল চাঁদ। ছোট্ট উপত্যকার নীচে একটা বেড়া পড়ল। খানিকটা বামে অন্ধকার একটা কাঠামো–ঘোড়ার আস্তাবল। উপত্যকার সঙ্গে একটা মাঠ দেখতে পাচ্ছি। মাঠে সারি সারি সব্জি। বাঁধাকপি কিংবা কুমড়ো জাতীয়। ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে যদ্দূর জানি এ এলাকায় এগুলো জন্মে না। আবছা চাঁদের আলোয় গোলাকার লাগল ওগুলোকে, গায়ে গাঢ় ফুটকি। তারপর বুঝে ফেললাম ওগুলো কী। আমার পাশে দাঁড়ানো ক্যাথি জোরে শ্বাস টানল। মাঠে শুয়ে আছে নতুন পড, অসংখ্য। ঝুড়ির মত বড়। ক্রমে বড় হচ্ছে আকারে।

দৃশ্যটা ভীত করে তুলল আমাকে, ওগুলোর পাশ দিয়ে বা মাঝখান দিয়ে যেতে হবে ভাবতেই ঘৃণায় রিরি করে উঠল শরীর। চলার সময় ওগুলোর সঙ্গে ধাক্কা লাগবে গায়ে ভেবে বিতৃষ্ণায় ভরে গেল মন। কিন্তু যেতে তো হবেই। বসে থাকলাম কুয়াশা কখন আবার ঢেকে দেবে চাঁদের মুখ সে আশায়।

অবশেষে কুয়াশার চাদরের আড়ালে ঢাকা পড়ল চাঁদ। ম্লান, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট হয়ে এল আলো। আমি প্রচণ্ড, প্রচণ্ড ক্লান্ত। মাটির দিকে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছি। পডগুলো যে-মাঠে শুয়ে আছে ওটা খুব একটা চওড়া বা বিস্তৃত নয়। বড়জোর একশো গজ হবে চওড়ায়। তারপর এক একর জায়গা নিয়ে আগাছার বিস্তৃতি, বাইরে থেকে আড়াল করে রেখেছে পড।

হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমরা কী ঘটবে। অনুমান করতে পারলাম এতদূর সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে আসা কীভাবে সম্ভব হলো। কেন কারও সঙ্গে মুখোমুখি হতে হলো না আমাদেরকে। ওরা ইচ্ছে করেই আমাদেরকে অন্ধকারে খুঁজে বেরিয়ে শক্তির অপচয় করতে চায়নি। কারণ ওরা জানত আমরা এখানে আসব এবং ফাঁদে পড়ব।

তবু নিজেকে প্রবোধ দিলাম এই ভেবেঃ বাঁচার কোনও না কোনও সুযোগ নিশ্চয় পাব। সবচেয়ে সুরক্ষিত কারাগার থেকেও কয়েদি

পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। যুদ্ধবন্দিরা লাখ লাখ মানুষের ভিড়ে মিশে শত শত মাইল রাস্তা পাড়ি দেয়। আর এসব মানুষের সকলেই তাদের শত্রু। অনেক সময় ভাগ্য সহায়তা করে।

তবে আমাদেরকে ভাগ্য সহায়তা করবে কি না জানি না। চাঁদের মুখ থেকে কুয়াশার পর্দা সরে গেল। আবার দেখা গেল পডগুলো। সারি সারি। শয়তানের মত দেখতে পডগুলো শুয়ে আছে আমাদের পায়ের নীচে। প্রচণ্ড রাগ হলো ওগুলোর ওপর। কুয়াশার বিরাট এক মেঘ চাঁদ আড়াল করতেই সিধে হলাম আমরা। নিঃশব্দে পা বাড়ালাম পাহাড়ের দিকে। পডগুলোকে কীভাবে ধ্বংস করা যায় ভাবছি। মাঠের এককোণে ক্ষুদ্র একটা ছাউনি। আমরা দ্রুত এগোলাম ওদিকে।

ছাউনির পাশে একটা মিনি ট্রাকটর। পডের সারি আর গর্তগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। ছাউনির খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেলাম ভিতরে বড় বড় ছটা ড্রাম। দেয়ালের গায়ে, মেঝের ওপর সার বেঁধে দাঁড় করানো। গ্যাসোলিনের ড্রাম। ওগুলো দেখে উত্তেজনা বোধ করলাম আমি। শিরায় শিরায় যেন বিচ্ছুরিত হতে লাগল শক্তি। ছটা ড্রামের গ্যাসোলিনে খুব বেশি কাজ হবে না জানি। কারণ পডের সংখ্যা শতশত। তবু সুযোগটা কাজে লাগানো দরকার। ক্যাথির হাতে দুটো বেঞ্জেড্রাইন ট্যাবলেট গুঁজে দিলাম, আমি গিলে নিলাম একজোড়া। এরপর বড় ড্রামগুলো গড়িয়ে দিলাম মেঝেতে। ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে এলাম মাঠের গর্তের কাছে। ছাউনির মধ্যে রেঞ্চ পেয়ে গেলাম একটা। ওটা দিয়ে ড্রামের ছিপি খুলতে লাগলাম। ছিপি খুলতেই কলকল শব্দে ড্রামের মুখ থেকে বেরুতে লাগল গ্যাসোলিন। গর্তে পড়তে লাগল।

এক এক করে বাকি পাঁচটা ড্রাম নিয়ে এলাম মাঠের ধারে। প্রথম ড্রামটা ইতিমধ্যে খালি হয়ে গেছে। বাকি ড্রামগুলোও খালি করলাম মাঠে। গর্ত দিয়ে গড়িয়ে গ্যাসোলিনের স্রোত ঢুকে পড়েছে দানব পডগুলোর মধ্যে। আমি খোলা গর্তের পাশে বসে রইলাম ততক্ষণ। দশ মিনিটের মধ্যে খালি হয়ে গেল সবগুলো ড্রাম। গর্তের ওপর ঝুঁকলাম। গ্যাসোলিনের তীব্র ঝাঁঝ বাড়ি মারল চোখে। একটা দিয়াশলাই জ্বালালাম। ছুঁড়ে দিলাম গ্যাসোলিন-ভরা গর্তে। ছ্যাঁত করে নিভে গেল

ওটা। আর একটা জ্বালালাম। এবার জ্বলে উঠল আগুন। প্রথমে আধ ডলার আকারের বৃত্ত নিয়ে জ্বলতে লাগল। তারপর একটা পিরিচের আকৃতি নিল। ধোঁয়া বেরুচ্ছে। নীলচে আগুনের মাঝ দিয়ে লাল শিখা লকলকে জিভ বের করতে লাগল। গর্তের মধ্যে ছুটতে লাগল শিখা, দৌড় শুরু করল।

তাপ যত বেড়ে চলল আগুনের শব্দও তত বৃদ্ধি পেল। কালো ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠছে। চোখ দিয়ে অনুসরণ করছি অগ্নিরেখা, দেখছি সমান্তরাল লাইন ধরে শিখা জ্বালিয়ে চলেছে আগুন। ছোবল মারল পডগুলোর গায়ে। প্রথম পডটা বিস্ফোরিত হলো সাদা আলো নিয়ে, ধোঁয়াও সাদা; তারপর দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় এবং চতুর্থটার বিস্ফোরণ ঘটল একসঙ্গে। তারপর ঘড়ির কাঁটা ধরে বিস্ফোরিত হতে লাগল ওগুলো। এমন সময় অসংখ্য মানুষের কণ্ঠ শুনতে পেলাম। এগিয়ে আসছে এদিকেই। ওদের সম্মিলিত চিৎকার সমুদ্র গর্জনের মত শোনাল।

প্রথমে ভেবেছিলাম আমরা বুঝি জিতে গেছি। কিন্তু ছয় ড্রাম গ্যাসোলিন প্রকাণ্ড মাঠের কতটুকুই বা জায়গা দখল করতে পারে। ফুরিয়ে গেল গ্যাসোলিন। মাথা-সমান উঁচু আগুনের তেজ কমে এল। নিভে গেল একে একে। দেখলাম শতশত মানুষ এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

ওরা আমাদের সঙ্গে কোনোরকম খারাপ ব্যবহার করল না। কারও চেহারায় রাগ বা আবেগের চিহ্ন নেই। জুয়েলারি ব্যবসায়ী স্ট্যান মোরলি আলগাভাবে আমার একটা হাত ধরল। বেন কেচেল দাঁড়াল ক্যাথির পাশে যাতে ও পালিয়ে যেতে না পারে। অন্যরা চারদিক থেকে ঘিরে ধরল আমাদেরকে। চেয়ে রইল কৌতূহলশূন্য দৃষ্টিতে।

আমরা যে-পাহাড় থেকে নেমে এসেছিলাম, সেদিকে আবার পা বাড়াতে হলো। কেউ আমাদের শরীর স্পর্শ করল না। প্রায় কথা বলছে না কেউ। কারও মধ্যে কোনোরকম উত্তেজনা নেই। আমি ক্যাথির কোমর একহাতে জড়িয়ে ধরে হাঁটছি। মাটির দিকে চোখ। কিছুই ভাবছি না। কোনও অনুভূতিও কাজ করছে না।

তখন–আশপাশে শতশত মানুষ হঠাৎ বিড়বিড় করে উঠল। মুখ তুলে চাইলাম আমি। আমাকে মুখ তুলে চাইতে দেখে থেমে গেল বিড়বিড়ানি। ওরা সবাই পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে।

ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেলাম আকাশ ভরে গেছে অসংখ্য বিন্দুতে। কালো, গোলাকার, ভুতুড়ে চেহারার প্রকাণ্ড ফুটকির মত কী যেন ধীরে ধীরে নেমে আসছে আকাশের বুক থেকে। চাঁদের মুখ থেকে সরে গেল কুয়াশা, উজ্জ্বল হয়ে গেল আকাশ। দেখলাম মাঠে যে পডগুলো আগুনের ছোবল থেকে রক্ষা পেয়েছে, সেগুলো নড়ে উঠল। শূন্যে উঠতে শুরু করল। তারপর একসঙ্গে সবকটা সারি বেঁধে উঠে পড়ল শূন্যে। কেউ কারও সঙ্গে ধাক্কা খেল না, ক্রমে উঠতে লাগল উপরের দিকে। আকাশের উঁচুতে, আরও উঁচুতে উঠে গেল ওগুলো, তারপর হারিয়ে গেল দৃষ্টির বাইরে।

একুশ

রাতের আকাশে অবিশ্বাস্য দৃশ্যটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি আমরা। জানি অনেক কিছু এক মিনিটে ব্যাখ্যা করা যায়, আবার কিছু কিছু জিনিস সারা জীবনেও ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

সন্দেহ নেই দানব পডগুলো তাদের চোখে শত্রুভাবাপন্ন এ গ্রহ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। উল্লাসের একটা স্রোত বয়ে গেল শরীরে। কারণ জানি আমি আর ক্যাথিই ওদেরকে যেতে বাধ্য করেছি।

এ অবিশ্বাস্য ভিনগ্রহের জীবন কি চিন্তা করতে পারে? ওরা কি বুঝতে পেরেছে এ গ্রহের মানুষ ওদেরকে কখনও গ্রহণ করবে না? আমি আর ক্যাথি আত্মসমর্পণ করতে চাইনি, ওদেরকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছি। তাই হয়তো ওরা চূড়ান্ত উপসংহারে পৌঁছেছে–আমরা

ওদেরকে চাই না। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আবার মহাশূন্যে যাত্রা শুরু করেছে দানব বীজগুটি, পেছনে ফেলে রেখে যাচ্ছে নিষ্ঠুর এক গ্রহ। হয়তো উদ্দেশ্যহীনভাবে চলেছে কোথাও, চিরদিনের জন্যে।

মনে নেই কতক্ষণ তাকিয়েছিলাম আকাশের দিকে। ছোট ফুটকিগুলো বিন্দুতে পরিণত হলো। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ব্যথা হয়ে গেল চোখ। হাত দিয়ে ডলে নিলাম চোখ। তাকালাম আবার। আর দেখতে পেলাম না ওগুলোকে।

আমি ক্যাথিকে টেনে নিলাম কাছে। আমাদের চারপাশে বিড়বিড় শব্দ হচ্ছে, তবে আগের মত জোরাল নয়। দেখলাম ওরা আমাদেরকে রেখে চলে যাচ্ছে। ধ্বংস হওয়া শহরে ফিরে যাচ্ছে সবাই। তাদের চেহারা ভাবলেশহীন, চোখে ভোঁতা দৃষ্টি। কয়েকজন পাশ কাটানোর সময় আমাদের দিকে ফিরে চাইল। বেশিরভাগই তাকাল না। আমি আর ক্যাথি পাহাড়ের দিকে পা বাড়ালাম। ওদের পাশ কাটিয়ে চললাম। আমাদের পরনের পোশাক নোংরা, কাদায় মাখামাখি। ঘাস আর আগাছার মাঝ দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছি। শেষ মানুষটাকে পাশ কাটিয়ে নেমে পড়লাম রাস্তায়।

রাতটা কাটালাম শরিফ দম্পতির সঙ্গে। ওরা বাড়িতেই ছিল। ঘুমিয়ে না-পড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। এখন আর ঘুমালে অসুবিধা নেই। ফিওনা চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়ল। শরিফ ভাই বড় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা ফ্রেশ হয়ে এলাম। কিছুক্ষণ টুকটাক কথা বললাম। তারপর শুয়ে পড়লাম বিছানায়। তলিয়ে গেলাম ঘুমের রাজ্যে।

এ ঘটনা কোনও পত্রিকার পাতায় ছাপা হলো না। আপনারা মিলভ্যালিতে এলে দেখতে পাবেন একটু অগোছাল ধরনের শহর। কেউ হয়তো সেধে কথা বলতে চাইবে না আপনার সঙ্গে। আপনি কথা বলতে গেলে মুখ ঘুরিয়ে নেবে। অনেক বাড়ি দেখবেন খালি। **'বিক্রি হবে'** সাইনবোর্ড ঝুলছে। এখানে অন্যান্য শহরের চেয়ে মৃত্যুর হার

বেশি। মৃত্যুর কারণও অনেক সময় জানা যায় না। কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় গাছপালা, গরুবাছুর কোনও কারণ ছাড়াই মরে যায়।

মিলভ্যালিতে দেখার কিছু নেই। তবে খালি বাড়িগুলো এখানে দ্রুত ভরে উঠছে নতুন মানুষের আগমনে। বেশিরভাগই বয়সে তরুণ। এক তরুণ দম্পতি এসেছে আমাদের প্রতিবেশী হিসেবে। আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে হয়তো মিলভ্যালিকে অন্য দশটা সাধারণ শহর থেকে আলাদা করা যাবে না। পাঁচ বছরের মধ্যে হয়তো কোনও পার্থক্যই বোঝা যাবে না। অতীতে এখানে যা ঘটেছে তা হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে। তবে আমি বিশ্বাস করি অবিশ্বাস্য অনেক ঘটনাই, এসব ঘটনার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা না থাকলেও সেগুলো ঘটেছে এবং সেগুলো সত্যি।

***